এ বি এম এ খালেক মজুমদার

শিকল পরা দিনগুলো

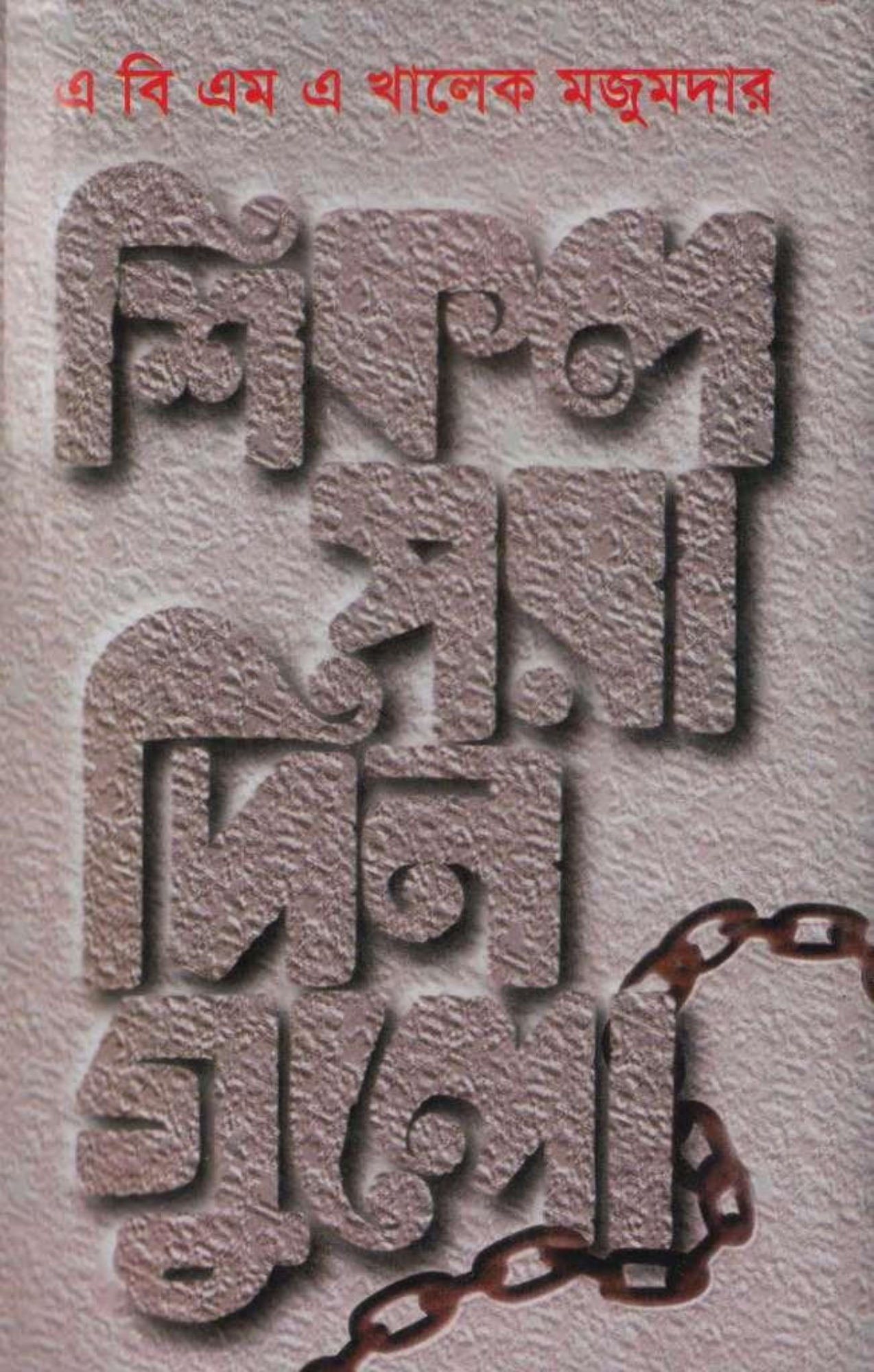

শিকলপরা দিনগুলো

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৫২

৩য় প্রকাশ (আধুঃ ১ম)
রবিউস সানি ১৪২৬
জ্যৈষ্ঠ ১৪১২
মে ২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHIKAL PARA DENGULO by A. B. M. A. Khalaque Majumdar. Published by Adhunik Prokashani, 25 shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। দুটো কথা
২। গ্রেফতার
৩। গ্রেফতারের পটভূমি
৪। কারায় প্রথম আগমন
৫। পুলিশ কস্টোজিতে প্রথম বার
৬। কারাগারে দ্বিতীয় বার
৭। দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের ইন্টেরোগেশন
৮। রাশিয়ার সাংবাদিকদের এন্টেরোগেশন
৯। স্থানান্তরীত করণ
১০। ঈদুল আজহা।
১১। ডান্ডাবেড়ীর নির্যাতন।
১২। ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ এর হৃদয় বিদারক ঘটনা।
১৩। তাজুদ্দীন সাহেবের সাথে কথোপ কথন।
১৪। পুলিশ কন্টাজিতে দ্বিতীয় বার
১৫। বিচার প্রহসন
১৬। বিশেষ ট্রাইবুনালের রায়
১৭। এমেনেষ্টি ইন্টারন্যশানাল
১৮। কয়েদী জীবন
১৯। কিছু স্মরনীয় ঘটনা
২০। ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আমার ও সরকারের আপীল।
২১। একদিনের ঘটনা
২২। জেল খানার প্রশাসন
২৩। মরনচাদের দই ও রমগোল্লা
২৪। সাধারণ ক্ষমা
২৫। একটি চিঠি নিয়ে জনমহল
২৬। পঞ্চায়েত প্রথা
২৭। কর্মের প্রতি অনুরাগ স্বভাবজাত
২৮। সাইয়েদ নেসার নোমানী
২৯। জেলে নিহত চার নেতা
৩০। সাংগঠনিক তৎপরতা
৩১। শফিউল আলম প্রধান সঙ্গীরা
৩২। হাইকোর্টের শুনানী ও রায়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দু'টো কথা

"শিকল পরা দিনগুলো আমার গ্রেফতার ও কারার দুসহ জীবনের ছোট একটা কাহিনী। লিখতে হয়েছে বইটি সশ্রম কারাদন্ডের দন্ড ভোগার ফাঁকে ফাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেনারেল কিচেনের (জেলখানার ভাষায় 'চৌকা') দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের তপ্ত পরিবেশে। ৭ বছরের স্বশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা অনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদন্ডের রায় ঘোষণার পরের দিন সকালে জেলার নির্মলেন্দু রায় সকল সুপারিশ উপেক্ষা করে আমার কাজ পাশ করলো জেনারেল কিচেনে। জেলের সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমের জায়গা ওটা। কাজের ভয়াবহতা দেখে তখন ভাবতেও পারিনি আমি কিছু লিখবো। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ সেখানে একটা স্থান বানিয়ে দিলেন আমার জন্য। সকলেরই যেন সুদৃষ্টি পড়লো আমার উপর। মর্যাদার চোখে দেখতে লাগলো জেলকর্তৃপক্ষ আমাকে। আমি তখন মোটামোটি প্রতিষ্ঠিত–এ সময়ে আবার আমাদের সাথে এসে যোগ হলেন ভাই কামারুজ্জমান, মোহাদ তাহের, এ.টি.এম. আজহারুল ইসলাম, সাইফুল আলম খান মিলন, জহুরুল হক ডাক্তার আবদুস সালাম, মোহাম্মদ ইউসুফ ও হাফেজ সোলায়মান। তাদের বিশেষ করে ভাই মোহাম্মদ তাহেরের অনুপ্রেরনায়ই 'শিকল পরা দিনগুলো' লেখার সূত্রপাত ঘটে। আস্তে আস্তে শুরু করলাম লেখা। শেষও হলো ওখানেই। পাঠিয়ে দেয়া হলো জেলের বাইরে ছাপাবার জন্য। কিন্তু ছাপা সম্ভব হলো না। অবশেষে '৮৫–র অক্টোবরে অনেক সাধনার পর বইখানা বের হলো।

বইটি আমার নিজ দায়িত্বে লিখা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য ছাপার সময়ে কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন আনতে হয়েছে। এ জন্য হয়তো লেখার পূর্বাপর সঙ্গতিতে ছেদ পড়তে পারে। এ ছাড়া আরো কোন ত্রুটি–বিচ্যুতি সঙ্গী সাথীদের নজরে পড়লে আমাকে জানানোর অনুরোধ করছি। ২য় বার ছাপাবার সময় বাদ পড়া কিছু সংযোজন করার চেষ্টা করেছি।

'শিকল পরা দিনগুলো' পড়ে যদি ইসলামী আন্দোলনের কোন ভাই তাঁর লক্ষ্য পথের পাথেয় খুঁজে পান–তাহলে আমার শ্রম স্বার্থক বলে মনে করবো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদ-ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

গ্রেফতার

শীতের সকালে নাস্তার পর আমরা দু'ভায়রা সোফায় বসে চা খাচ্ছিলাম। ঠিক এ সময় আমর নবজীবনের ঘন্টা বেজে উঠলো। হেনা এসে খবর দিলো–"তালুইজি, কয়েকটি ছেলে আপনাকে ডাকছে।" ভায়রাটি উঠে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন– "আপনাকে এরেষ্ট করতে এসেছে।" মানসিক দিক দিয়ে পূর্ব প্রস্তুতি ছিলো বলে স্বাভাবিক ভাবেই–"ঠিক আছে। বলে মাথা উঠিয়ে দেখি ভেতরের রুমেই আমি কয়েকটি সশস্ত্র ছেলে দ্বারা ঘেরা।

তাদের একজন আমাকে লক্ষ্য করে বললো, "উঠুন" বিনা বাক্য ব্যয়েই বললাম– "ঠিক আছে।" লুঙ্গিটা ছেড়ে প্যান্টটা পরে মন্ত্র–মুগ্ধের ন্যায় তাদের অনুসরণ করলাম। এছাড়া তো আর কোন উপায় ছিলনা। সামনে পিছে পাহারারত অবস্থায় অস্ত্র সজ্জিত গাড়ীতে উঠে রওনা হলুম এক অজানা পথে। তখন কে জানতো এ পথে ছিলো এত সুধা– এত মধু, এত গন্ধ, এত প্রশান্তি। বললে মিথ্যে হবে–"ভীত হয়নি।" কিন্তু আগে বুঝতে পারলে এতটা ভীত সংকিত হতামনা। জানিনা বাসার আর কেউ টের পেয়েছিলো কিনা পেয়ে থাকলেও পরবর্তী পদক্ষেপ তাদের কি হয়েছিলো? আর ওরাও বা নতুন শিকারের সন্ধান পেলো কি করে? এ রহস্য আজও আমার কাছে অজানা। জানলেও আজ আর আমার মনে কোন ক্ষোভের সঞ্চার হবেনা। অপ্রত্যাশিত ও অনভিপ্রেত ভাবে অপরূপ সাজে সজ্জিত রথের সারথীরা রাজ সিংহাসনে সমাসীন করার জন্যে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো। তাদের সে ডাক প্রত্যাখ্যান করলে কি–ই না ক্ষতি করে বসতাম! তখনো অনিশ্চিত ছিলো সে রথের যাত্রাপথ।

পথ বয়ে চললো গাড়ী তীব্র গতিতে, আমার সাথী–আমার বন্ধু তারা ছিলো চারজন, মন্থর গতিতে চলতে থাকলো তাদের বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন। 'হা, হু, না' এর যেটা প্রয়োজন সেটা দিয়ে, আবার কোন সময় মাথা হেলিয়ে সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে যেতে লাগলাম তাদের যত সব অবান্তর প্রশ্নের।

–"নাহার কে?"

জিজ্ঞেস করলো এক বন্ধু। উত্তর দেবার আগেই–"প্রেমও করে আবার! ব্যঙ্গ করলো আর একজন। বলা বাহুল্য নাহার আমার সহ ধার্মিনী। অতীত দিনের তাকে লিখা আমার, আমাকে লিখা তার প্রায় সব চিঠি গুলিই ছিল ট্রাংকে। আমাদের উভয়ের চিঠিগুলিই ছিলো যতসামান্য সাহিত্য রসে সিক্তিত। ভাবের আদান প্রদান, মতবিনিময়ের অন্তমধুর সংলাপ থাকতো চিঠিগুলোতে। আমাদের চিঠিগুলোতে মান অভিমানের কথাগুলোও মাঝে মধ্যে প্রকাশ পেতো।

তাই ভাসা ভাসা জ্ঞানের অবৈধ প্রেমের, সস্তা প্রেমিকরা আমদের চিঠিগুলোর কদর্থ ছাড়া সদর্থ করতে পারেনি। আবিষ্কার করতে পারেনি তারা চিঠিগুলো হতে আমাদের পূত–পবিত্র দাম্পত্য সম্পর্কের কথা।

www.pathagar.com

খানাতল্লাশী করে আমার অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস গুলোর মধ্যে ঐ চিঠিগুলোও আগেই পেয়ে গিয়েছিলো তারা। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে আমার এম, এ, পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বের লিখিত নোটগুলো ও ১৯৬৪ ইংরেজী সন থেকে ১৯৬৯ ইংরেজী সন পর্যন্ত মোট ছয় বছরের আমার ব্যক্তিগত ডায়রীসহ এ গুলোকেই তারা আমার 'আলবদর কমান্ডার' হবার দলিল বলে দেশবিদেশব্যাপী প্রচারণা চালিয়েছিলো। এমনকি আদালত কক্ষেও সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সত্য বলার শপথ নিয়ে এ মিথ্যে কথাগুলো বলে গিয়েছিলো তারা। এ কথাগুলোর জেরা প্রসঙ্গে বিজ্ঞ সাক্ষীদের যুক্তিপূর্ণ উক্তির কথা পরে উল্লেখ করবো।

গাড়ীতে ওসব প্রশ্নের এক ফাঁকে আরোহী চার বন্ধুর একজন অতি আলতো ভাবে খুলে নিলো আমার হাত ঘড়িটি–ভাগ দেবার ভয়ে অন্য তিন জনের চোখ এড়িয়ে। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রেমে গদগদ বন্ধুদের এ হলো চরিত্রের পরিচয়।

গাড়ী এসে থামলো নিমতলীর চৌরাস্তার মোড়ে–আমার বাসার নিকটে। ফ্রন্ট সিট হতে নেমে দলের সর্দারটি আমার কাছে এসে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলো–"আপনার রিভলবারটি কোথায়?" তখনই বুঝলাম তাঁরা আমার সম্পর্কে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। এ প্রশ্নটি তারই ফল।

রিভলবারটি আমার লাইসেন্স করা। কিনে এনেছিলাম পঞ্চাশটি বুলেটসহ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাস কয়েক আগে। একটি বুলেটমাত্র খরচ হয়েছিলো টেষ্টিং এ। বাকী উনপঞ্চাশটি বুলেটসহ বাসায়ই ছিলো ওটা। কেনার পর যেখানে রেখেছিলাম ওখানেই ছিলো পড়ে। বলে দিলাম নির্দিষ্ট স্থানের কথা। নিয়ে এলো ওরা রিভলবারটি।

এটি আমারই পাড়া। যেখানে বাস করেছি বেশ কয়েক বছর। অপরিচয় থেকে পরিচয়, পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, ঘনিষ্ঠতা থেকে বন্ধুত্বে উপনীত হয়েছি যেখানে–এটি সে জায়গা। কত বড়জনের কাছে পেয়েছি স্নেহ ও ছোটদের কাছে পেয়েছি শ্রদ্ধার অর্ঘ। বিপদের দিনে আজ আর নেই এর কোন মূল্য। কেউ আজ চিনেনা–কেউ আজ জানে না। কেউ আমার কাছে ঘেষেনা। দীর্ঘদিনের চেনা পরিচিত এ পরিবেশে যেন আমি আজ কোন বিদেশে বিভুঁইয়ে। একনজর দেখেই উল্টো পায়ে সবাই পিছে সরে পড়ে। যেন কাছে এলেই বিপদের সম্ভাবনা।

এ পর্বের শেষে নীত হলাম এক অপরিচিত বাড়ীতে। এটিই হলো আমার বাদীর বাড়ী। এবার পটের পরিবর্তন ঘটলো আমূলভাবে। শুরু হলো অত্যাচারের পালা। ঘর ভর্তি মানুষ। প্রশ্নের পর প্রশ্নের বান নিক্ষেপ হতে লাগলো আমার দিকে। এমন সব উদ্ভট প্রশ্ন যার আমি কিছুই জানিনা–কোনটার সাথেই নেই আমার কোন সম্পর্ক। তাদের কেউ জিজ্ঞেস করছে, "বলো, শহিদকে কি করেছো। কোথায় রাখা হয়েছে তাকে। তোমার সাথে ছিলো আর কারা?"–"কিছুই জানিনা" বলা ছাড়া আমার আর কি বলার ছিলো? যাকে জীবনেও কোনদিন দেখিনি, যার অপহরণ সম্পর্কে কিছুই জানিনা, তাদের ওসব প্রশ্নের উত্তরে এর বেশী আমি আর কি বলতে পারি? মনে হলো, আমার কথায় তাদের বিশ্বাস হলো না এক তিলও। কাজেই কথা বের করার জন্য তাদের যা করা দরকার তারা তাই শুরু করলো।

www.pathagar.com

এর মাঝেও শহীদুল্লাহ কায়সারের পত্নী সাইফুন্নাহার-পরে পান্না কায়সার নানা প্রশ্ন করে চলেছিলো আমাকে। একটি রাজনৈতিক দলের সাথে আমার সম্পর্কের কথাটুকু বার বার বলা ছাড়া আর কিছুই তো ছিলনা আমার বলার।

শহীদুল্লাহ কায়সারের তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকীতে ১৯৭৩ সনে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত ছবিতে প্রথম বারের মতো জীবনে তাকে দেখলাম। অথচ তখন তার অপহরণ মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে আমার কারাজীবনের চলছে তৃতীয় বছর। কাজেই এটা আবার আমারও তৃতীয় নব জন্ম বার্ষিকী। তার অপহনের সন্দেহ থেকেই আমার এই নতুন জীবনের অধ্যায় শুরু হলো। আমি না হয় একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে সম্পূর্ণ রহস্য জনক ভাবে এ ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হলাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের জন্মের মাসেকের মধ্যেই শহীদুল্লাহ কায়সারের সহোদর জহির রায়হানের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কারা? তখন তো আমি কিংবা আমার মত ভাগ্যহতরা ময়দানে ছিলো না? জানিনা কবে এ নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের আসল রহস্য প্রকাশিত হয়ে আমার মত নির্দোষ ভাগ্যবিড়ম্বিত ব্যক্তিদের বেদনা বিধুর জীবনের অবসান ঘটবে।

এবার বেঁধে ফেলা হলো চোখ। বের করে এনে আবার আমাকে উঠানো হলো গাড়ীতে। পুরান ঢাকার জনবহুল এলাকা বয়ে ধীর গতিতে গাড়ী চলছে দক্ষিণ দিকে-স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। চকের দক্ষিণে ছোট কাটরার একটি টর্চারিং ক্যাম্পে আনা হলো আমাকে। কিছুক্ষণ ধরে চললো অত্যাচারের আর এক নতুন পালা এখানেও।

হঠাৎ কেন জানি আবার চোখ বেঁধে উঠানো হলো গাড়ীতে। গাড়ী ফিরে এলো চকবাজারে। চক-চৌরাস্তায় বোধহয় ছিলো খুব ভীড়। গাড়ী চলছেনা এক ইঞ্চিও। সামনে অগ্রসর হবার জন্যে তারা হাঁপিয়ে উঠেছে। আচমকা একটি বাক্য ভেসে এলো আমার কানে। "Who is he?" আওয়াজে কোন ভিনদেশী লোক বলেই মনে হলো তাকে। উত্তরও হলো সাথে সাথে "He is an Al Badar Commander" চোখ বাঁধা অবস্থায়ই প্রতিবাদ জানালাম "No, I am not an Al Badar Commander" সিটের স্প্রিং করে উঠলো পাশে একজন লোক বসলো অনুমান করলাম। একটু পরেই চোখের পর্দা সরে গেলো। দেখলাম গাঢ় সবুজ রঙের ইউনিফরম পরা একব্যক্তি আমার পাশে বসা। সে প্রশ্ন করলো "Were you Al Badar Commander?" উত্তর করলাম "No. I was Office Secretary, Jamate Islami, Daccca City" গাড়ীতে বসা অন্যান্যদের উদ্দেশ্য করে এবার সে প্রশ্ন করলো, "How could you say that he is an Al Badar Commander?" Is there any documents?" সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর করলো তারা "Yes, we are going for Procuring documents from a secret place." "তোম উতরো, পহলে তোমকো সার্চ করেঁ" এবার তারা হতভম্ভ হয়ে পড়লো। ভয়ে ভয়ে নেমেই তাদের পাশের সর্দারটি এক পাশে হাতের আড়াল করে আমার বাসা থেকে আনা রিভলবারটি পকেট থেকে বের করে তার এক সাথীর কাছে পাস করে দিলো। সার্চ করে আর কিছু পাওয়া গেলোনা। এবার আর এক প্রশ্ন-" Have you got driving liecence?" To whome this car belongs?" তারা হিস সিম খেয়ে

www.pathagar.com

উঠেছে। কম্পিত স্বরেই জবাব দিলো- " I have driving licence but this is my uncle's car. We set out very hurriedly, So the licence could not be brought up with us. As we were very busy from the beginning of the day to arrest this culprit." বিপন্ন অবস্থায়ও হাসলাম। মিত্র দেশীয় এই একটি মাত্র সামরিক ব্যক্তিটির কাছে তাদের অসহায়তা দেখে।

"কেদার যাওগে?" উত্তর হলো-"ছিদ্দিকে বাজার যাবো"-চলো। যে ছেলেটির হাতে রিভলবারটি দেয়া হয়েছিলো সে পালিয়েছে। আর্মির লোকটি সহ বাকী তিনজন আমাকে নিয়ে চললো বাবুবাজার, কাজী আলাউদ্দিন রোড হয়ে ছিদ্দিক বাজারের দিকে। নতুন লোকটিকে সাথে পেয়ে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়েছিলাম আমি। মনে হলো ও যেন ওদের কথা বিশ্বাস করতে পারছেনা।

ছিদ্দিকবাজার এসে তৎকালীন শহর জামায়াত অফিস কাউসার হাউজের সামনে এসে গাড়ী থামিয়ে তাদের দু'জন উঠে চলে গেলো ভিতরের দিকে। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলো ওরা। ষ্টার্ট হলো গাড়ী। মতি মসজিদের পাশ দিয়ে পুরান রেল ষ্টেশনের রোড ধরে ফুল বাড়িয়া দক্ষিন পাশের এফ. এইচ. এম. হল হয়ে কার্জন হলের পূর্ব পাশে এলে গাড়ী থামাতে বললো সামরিক ব্যক্তিটি। গাড়ী থামলেই নেমে পড়লো সে এবার যেন আশ্রয়হীন হয়ে পড়লাম। যাবার বেলা বলে গেলো-"Don't beat him. Hand over him to the Proper authority"-Yes, yes বলে গাড়ী ষ্টার্ট দিলো তারা। মনে হলো যেন তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এবার গাড়ী প্রবেশ করলো সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংএ। প্রদর্শনী করানো হলো এখানে আমাকে। আবার ফিরে ছুটলো গাড়ী ওপথ ধরে হোট কাটরার দিকে। প্রাণ ভরে সেবন করলাম পরিচিত ঢাকা নগরীর মুক্ত হাওয়া। হয়ত এ শহরের মুক্ত বায়ু সেবন করার সুযোগ পাবনা আর।

ফিরে এলাম সে টর্চারিং ক্যাম্পে। হিংস্র চেহারার কিছু নতুন মুখ চোখে পড়লো এখানে। পশ্চিম মুখী একরুম বিশিষ্ট একটি দালানে এই ক্যাম্পটি। উত্তরে দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণ পাশে অর্ধেকের বেশী জায়গা জুড়ে রয়েছে তাদের বসার ও হাতিয়ার রাখার ব্যবস্থা। আর উত্তর দিকের বাকী অংশটা মানুষকে অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন করে মারার কসাইখানা। রকমারী অস্ত্র-শস্ত্র। নানা রকম হাতিয়ার স্তুপ হয়ে আছে একপাশে। ধারালো দা, ঝকঝকে ছোরা, সাদা তকতকে বেয়নেট, সোজা ও মসৃন সুন্দরী কাঠের লাঠি। এছাড়া চামড়া বাঁধানো ছড়ি। তেলতেলে হলুদ ও বেগুনী রঙের ইলেট্রিসিটির তার, লোহার রড, গোলাপ ফুলের কাঁটা, লবণ মরিচ মায় অনেক কিছু।

একটি বেঞ্চে বসতে দেওয়া হলো আমাকে। একটু পরেই আমার কাছে এগিয়ে এলো দলের সর্দার নাসির। হাতে ইলেট্রিক তার। তার সাথে এলা আরো দু'জন। শুরু হলো প্রশ্নবান। সব প্রশ্নই শহীদুল্লাহ কায়সার ও আলবদর সম্পর্কীয়। এ সম্বন্ধে তো জানা নেই কিছুই। কাজেই- "না, জানিনা, বলতে পারিনা" বলা ছাড়া আমার কাছে ছিলোনা আর কোন উত্তর। বিশ্বাস তাদের কিছুই হলোনা। অস্পষ্ট করে কি বলে সরে গেলো সর্দারটি।

www.pathagar.com

এবার বিকট আকৃতির জল্লাদ প্রকৃতির জুলফিধারী দু'টি লোক এগিয়ে এলো আমার দিকে। তাদের লম্বা গোঁফ, মাথায় বেনী বাঁধার মতো লম্বা চুল, রক্তজবার মত চোখ দেখলেই মন ভয়ে আঁতকে উঠে। পেশীবহুল হাত উঠিয়ে থাবা ধরা হিংস্র বাঘের মত দু'হাত ধরে আমাকে উঠিয়ে নিলো তারা। হাওয়াই সার্টটা খুলে ফেলে দিলো নীচে। গেঞ্জিটাও এক হেচকা টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলো দূরে। ঝাপটা মেরে চিৎ করে ফেলে দিলো উত্তর ভাগে রাখা একটি টেবিলের উপর। পূর্ব দিকে মাথা পশ্চিম দিকে পা। এবার আরও দু'জন এসে মিলিত হলো এদের সাথে। পা দু'টি নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে ফিতা দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো টেবিলের পায়ার সাথে। এভাবে মাথাটিকেও নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে শক্ত করে অপর দু' পায়ার সাথে বাঁধলো আমার হাত দুটি। এবার দু'দিকে দু'জন করে দাঁড়িয়ে গেলো। হাতে রড ও লাঠি নিয়ে শুরু হলো পৈশাচিক নির্যাতন।

নির্যাতনের প্রস্তুতি দেখেই আঁচ করে ফেলেছিলাম পরিণতির কথা। কারোর সাহায্যের আশাও তিরোহিত হলো মন থেকে। শাহাদাতই হবে আজকের শেষ পরিণতি। মনে উঠলো এ সময় হযরত ইমাম আহম্মদ বিনতে বিন হাম্বলের কথা, হাসানুল বান্না ও সাইয়েদ কুতুবের মতো ঈনি আন্দোলনের অগ্র সেনানীদের কথা। অন্যায়-অত্যাচারের সামনে তাদের আপোষহীন ও বীরত্বপূর্ণ আচরণের কথা। সাহসে ভরে উঠলো মন। মৃত্যু চিন্তাও ক্ষণিকের মধ্যেই হয়ে উঠলো তুচ্ছ। সংগ্রাম আমাদের একই। পরিণতিও এক ও অভিন্ন। আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরিয়ে নিলাম মন। ছেড়ে দিলাম দুনিয়ার তুচ্ছ মায়া। ডাকতে লাগলাম নিবিষ্ট মনে শুধু তাঁকেই। বলতে লাগলাম-হে খোদা। অপরাধ যদি করেই থাকি তোমারই কাছে করেছি-তুমি ক্ষমা করো। মৃত্যুই যদি দাও,। এই-ই শ্রেষ্ঠ মৃত্যু। মরদে মোমেন ঝাঞ্চা করে নেয় এই মৃত্যুকে। আর যদি বাঁচিয়ে রাখো তা তোমারই অপার রহমত। কোন অপরাধ নেই আমাদের। তোমার আদর্শের জন্যে কাজ করেছি। তোমার আদর্শকে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে যারা ব্রতী তাদের দলে নাম দিয়েছি। এ-ই যদি হয় অপরাধ তাহলে তুমিই উত্তম ফায়সালাকারী। তুমিই আহকামুল হাকেমীন। রোজ হাশরে কুল মাখলুকাতের সামনে তোমার ফয়সালা তাদের শুনিয়ে দিও। এদের কাছে করুণা চাইনা। করুণা চাই, চাই রহমত শুধু তোমারই কাছে। জালেমের কাছে ভদ্র ব্যবহারের আশা করি না। তুমি আমাকে একজন মুমীনের মৃত্যু দান করো। মুসলমানদেরকে জালেমদের ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখো। যেমনি বাঁচিয়ে রেখেছিলে তুমি বহু মুসলিম জাতিকে।

শপাং করে দক্ষিণ দিক হতে নাভীর উপর এসে পড়লো চাবুকের প্রথম আঘাত। সাথে সাথেই ভীষণ জোরে উত্তর দিক হতে পড়লো আর একটি। সারা দেহ ঝিমঝিম করে উঠলো। প্রতিটি শিরা উপশিরা বয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লো বিষময় ব্যথা। একচুল নড়বার ছিলোনা কোন উপায়। মাথাটা ঝুলে রয়েছে নীচের দিকে। সারা দেহের ব্যথা বিদ্যুতের গতিতে এসে জমা হচ্ছে মাথায়। অবধারিত মৃত্যুর জন্য ষোল আনাই প্রস্তুত হয়ে গেলাম। আঘাতের পর আঘাত আসছে বৃষ্টির মতো। চীৎকার দিয়ে পড়তে লাগলাম কলেমা তাইয়েবা-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কলেমায়ে শাহাদাদ আশহাদু আল

www.pathagar.com

লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদুআন্না মোহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ। পুনঃ পুনঃ ডাকতে লাগলাম আল্লাহ্‌কে। আঘাতের বিরাম নেই। দক্ষিণ দিকের আঘাতগুলো আমার পেট ও বাম দিকের সব হাড়গুলোকে যেন চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিচ্ছে গায়ের চামড়া যেন ছিঁড়ে টুকরা টুকরা হয়ে চারিদিকে ছিটকে পড়ছে। চোখ দু'টো ফেটে যেন রক্ত বেরুবে। লা ইলাহার চীৎকার ধ্বনী বন্ধ করার জন্য নেকড়া গুঁজে দিলো মুখে। খানিক পরেই খুলে ফেললো তা। কিন্তু মুখ দিয়ে চীৎকার ধ্বনি আর বেরুচ্ছিলো না তখন। লালা ও কফ পড়তে লাগলো গলা গড বেয়ে। চলতে থাকে নির্যাতনের এমনি ধারা। ক্লান্ত হয়ে পড়ার কারণে অবশ্য জল্লাদ বদল হতো কিছুক্ষণ পর পর। হাতিয়ারেরও পরিবর্তন হতো মাঝে মাঝে। নির্যাতনের নতুন নতুন ধরণ ও প্রকৃতি প্রয়োগ করা হতো নতুন নতুন ভাবে। কখনো কখনো ছোট ছোট ছেলে দিয়ে গোলাফ ডালের কাঁটার আঁচড় টানা হতো বুকে। তাদের আবার কেউ কেউ লবন মরিচ লাগাত ক্ষত বিক্ষত দেহে। কেউবা আবার নানা জায়গায় চেপে ধরতো জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন। কেউ বেয়নেটে ধার উঠাতো আমার গলায়। কিন্তু খোদার অপরিসীম রহমতে আমি তখন সব ব্যথার নাগালের বাইরে। রড, তারের আঘাত, লবণ ছিটানোর ভীষণ পোড়ন, মরিচের অব্যক্ত জ্বালা, আগুনের দাহন, কাঁটার আঁচড়ের নির্মম ব্যথা কিছুরই কোন ক্রিয়া হচ্ছে না এ দেহে। মনের মনিকোঠায় খোদার রহমতের নাম দেদীপ্যমান। মুখে নেই কোন শব্দ। শরীর স্পন্দনহীন অসাড় মৃত দেহের মতো। কিছুক্ষণ পরপরই ক্ষীণ জ্ঞান ফিরে আসে। রড, লাঠি ও তারের কত শত আঘাত এ বুকে আর বাম পাঁজরে আছে তা শুধু খোদাই জানেন। ভাবলে আজও শিউরে উঠি–এ পাঁজর, এ বুক কিভাবে তার রহমতে অটুট রইলো। দানবীয় এ অত্যাচার চলাকালে আবছা আবছা মনে পড়ে কয়জন সাংবাদিকও তশরিফ এনেছিলেন টর্চারিং সেন্টারে। হাত পায়ের বাঁধন ছেড়ে দিয়ে ক্ষণিকের তরে বসিয়ে ফ্লাস বাল্‌ব জ্বালিয়ে একটি করে স্লেপও নিয়ে নিয়েছিলো তারা। যাবার কালে মন্তব্য করে গেলো–"এদের নার্ভ খুব শক্ত। সিভিয়ার টর্চার না করলে সহজে কোন কথা বেরুবে না।"

যা ই তারা বলুক যা ই তারা করুক কিছুতেই কিছু হয়নি। নির্দোষ শরীরে আঘাত হানলে দোষ বেরুবে কোত্থেকে? তাদের সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো চরমভাবে। নির্যাতন চলাকালে একটি কথারও দেইনি কোন উত্তর। জবান বন্ধ। একেবারেই বন্ধ। দুনিয়ায় আর বেঁচে থাকতে চাইনে । শাহাদাত প্রাপ্ত ভাইদের সাথে মিলিত হবার উগ্র বাসনাই জাগ্রত ছিলো মনে। তাদের নির্যাতনকে উপেক্ষা করার প্রত্যয় জমে উঠলো হৃদয়ে। তাই বুড়ীগঙ্গায় বেয়নেট চার্জ করে ফেলে দেবার কথা শুনেও ঘাবড়িয়ে যাইনি এতটুকু।

এরই মধ্যে কক্ষটিকে তালাবদ্ধ করে কখন যে তারা চলে গেলো টের পাইনি। জ্ঞান ফিরে এলে সারাটি কক্ষ অন্ধকার বলে মনে হলো। নেই কোন সাড়া শব্দ। নেই কোন কলরব কোথাও। অনুমান বেলা চারটার দিকে তালা খোলার খটখট শব্দ কানে এলো। পরপর দু'জন লোক প্রবেশ করলো বলে মনে হলো। আমার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিলো একজন। শরীরের সমস্ত শক্তি রহিত। হাতগুলি যেন হয়ে আছে গোশ্‌ত শূন্য। সব শিরা উপশিরা যেন থেতলে রয়েছে। রক্ত চলাচল যেন নেই। সুতরাং স্পন্দনহীন শরীরের বাঁধন

www.pathagar.com

খোলার পর কোন পরিবর্তন এলো না। যেমনটি ছিলাম, যেভাবে ছিলাম তেমনটিই পড়ে র'লাম, মুখ বাঁধা বস্তার মত। শরীরের কোন অংশেই ছিলো না কোন অনুভূতি। মাথায় ধাক্কা দিয়ে টেবিলে বসিয়ে দিলো আমাকে একজন। বুক ও পাঁজরের হাড়গুলি যেন কড়মড় করে উঠলো। রক্ত জমাট শরীরের প্রতি তাকালাম একবার। মনটা স্বর্গীয় জ্যোতিতে যেনো স্থির স্বাভাবিক। বসেই রলাম স্পন্দনহীন অবস্থায়।

এবার একটি ছোট বাক্য কানে এলো,-"শালা ন্যাকামী করছো না? নামো।" কিন্তু আমিতা তখন দুচোখ বিশিষ্ট জাপানী পুতুল। এরপর আর এক ধাক্কায় ফেলে দিলো নীচে নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের মতো। সাথের লোকটি ছিলো একজন পুলিশের লোক। তিনি বলে উঠলেন- "রাখুন রাখুন, শরীরে তো তার অস্থিমজ্জা কিছুই নেই"। এবার সে ব্যক্তি একটু ইতস্তত করে পাশে পড়ে থাকা আমার শার্টটা পরিয়ে দিয়ে বললো- "যাও শালা, তোমার ভাগ্য ভালো। নিজেরা নিজেরা আর কামড়া কামড়ি করলাম না।"

গ্রেফতারের পটভূমি

আজ উনিশ'শ তিয়াত্তরের ২২শে ডিসেম্বর।

একাত্তরের ২২শে ডিসেম্বর আমার বন্দী জীবনের শুরু। নতুন জীবনের জন্মদিন। এ জীবনের জন্য বার্ষিকীগুলো আমাকে পাষাণকারার অন্তরালেই উদযাপন করতে হচ্ছে। গত বছর এদিনে আন্দোলনের এক বন্ধুকে এ জন্মের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখে নূতন জন্ম বার্ষিকীর উদ্বোধন করেছিলাম। বন্ধুটি এর কোন সাড়া দেয়নি। দিলে হয়ত চিঠির ছায়া ধরে এতদিনে জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশের আলেখ্য তৈরী হয়ে যেতো। পুরা একটি বছর লৌহকাঁরায় অতিবাহিত করার পর আবারও এখানে পালন করতে হলো আমার তৃতীয় নব জন্মদিন। অবশ্য ১৯৭৩ এর ৩০শে নভেম্বরের 'অনুকম্পা' ঘোষণার পর এখানে থাকতে হবে তা ভাবিনি। কিন্তু ১৪ই ডিসেম্বর সকল ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে যখন অনুকম্পা ঘোষনা পর কোন কোন ধারার স্থগিত আদেশ - Stay order এলো তখন আমাদের মত কতিপয় হতভাগ্য মানুষ জিন্দানখানা হতে আর মুক্ত হতে পারলোনা।

এবার দুই বন্ধু ও সহধার্মিনীকে লিখিত তিনখানা চিঠির মাধ্যমে তৃতীয় কারা জন্ম বার্ষিকীর উদ্বোধন করলাম। আজকের দিনে ছোট করে হলেও নূতন জন্মের ইতিহাস স্মৃতি পটে ভাস্বর রাখার জন্য দু'কলম লিখবো বলে স্থির করেছি।

নতুন জন্মের পটভূমি লিখা না থাকলে আজ থেকে বহু বছর পার হবার পর দূর ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্যে এই উপখ্যানটা বুঝা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমার নব জন্মের পূর্ব সম্পর্কের কিছু আভাষ দিয়ে রাখা ঠিক মনে করছি।

আমাদের ভাগ্যে যখন একাত্তরের বিপর্যয় নেমে এলো তখন একা থাকি ঢাকায়। দেশে বিরাজিত নাজুক অবস্থার প্রেক্ষিতে দুই শ্রদ্ধেয় নেতার পরামর্শে এবং সম্ভাব্য পরিণতির আশংকায় কিছু জরুরী উপদেশ দিয়ে একাত্তরের ১০ই ডিসেম্বর স্ত্রী ও সন্তানদেরকে খালু

www.pathagar.com

শ্বশুরের সাথে বাড়ীর দিকে পাঠালাম। আমার নজরে নিরাপত্তার প্রশ্নে গ্রামের চেয়ে শহরই ছিলো উত্তম জায়গা। সাথে সাথে প্রয়োজনে চলা ফিরার জন্যেও ফ্রি হওয়া গেলো–এ ছিলো শ্রদ্ধেয়দের আন্তরিক পরামর্শ। তাই নারায়ণগঞ্জের মাছুয়া পট্টি পার করে মুন্সিগঞ্জমুখী পায়ে চলা পথে তাদেরকে ছেড়ে আসর সময় আমার স্ত্রীর কান্না বিজড়িত কণ্ঠস্বর–"তুমি আমাদের সাথে চলো।" বাচ্চাদের আবদারী সুর–"আব্বু তুমি আমাদের সাথে আসো"–উপেক্ষা করে ব্যথিত ও শংকিত মনে ঢাকা–ই ফিরে আসি আমি।

এ দিনটি ছিলো শুক্রবার। সিটি জামায়াত অফিস কাওসার হাউজে গিয়ে কাটালাম দিনের অবশিষ্টাংশ। সকলেরই অবস্থা উদ্বেগাকুল। প্রতিটি আগত মুহূর্তই বিপন্ন বলে মনে হতে লাগলো সকলের কাছে। এভাবে সময় যত অতিবাহিত হতে লাগলো অবস্থারও তত দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো। বিপদ যেনো খুব আসন্ন। নানাদিক থেকে গুজব শোনা যেতে লাগলো। কিন্তু তখনো আমাদের মনে ইতিহাসের চকমপ্রদ ও বীরত্বব্যঞ্জক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দুর্দমনীয় সাহসের সঞ্চার করে যেতো। –"ইতিহাসে যে জাতির আত্মসমর্পনের নজীর নেই। তাদের পরাজয় বরণ ইতিহাসে বিরল ঘটনা"। "খালিদ, তারিক, মুসা, কাসিম বর্তমান মুসলিম বীর সেনানীদেরও উৎসাহ উদ্দীপনার মূল উৎস।"–এরাই মুসলমানদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস। এ সবই ছিলো ঐ সময় আমাদের আলোচনার বিষয়। এ যুদ্ধ ছিলো আধিপত্য বাদী ভারতের সাথে মুসলমানদের।

কিন্তু হায়" সব ধারণার মূল ছিন্ন করে সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে যখন ১৬ই ডিসেম্বর তাদের আত্মগ্লানির ঘোষণা শোনা গেলো তখন সকলেই বিস্ময় বিমূঢ়। সেদিনই ভোরে সিটি আমীর প্রফেসার গোলাম সরওয়ার আমাকে ত্বরা করে ডেকে পাঠালেন সিটি জামায়াত অফিসে। বাসা থেকে তড়িঘড়ি করে ছুটে এলাম। তখনো আমি সব খবর জানিনা। ওখানে গিয়ে বৃত্তান্ত শুনে হতাশায় ছেয়ে গেলো মন। শিউরে উঠলো প্রতিটি লোমকূপ। তখনই বুঝলাম আমার শ্বশুর সাহেবের শেষ চিঠির তাৎপর্য। কয়েকদিন আগেই ঢাকা ছেড়ে কুমিল্লা চলে যাবার জন্যে তিনি কুমিল্লা থেকে আমাকে লোক মারফত এক জরুরী চিঠি পাঠিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য পরে জেনেছি, কুমিল্লায় কয়েকদিন আগেই আত্মসমার্পনের আভাষ পাওয়া গেছে। সিটি অফিস কাওসার হাউজে তখন দু'একজন জুনিয়র নেতা উপস্থিত ছিলেন। কারো মুখে নেই কোন রা শব্দ। সবাই হতবাক। প্রয়োজনীয় কিছু উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন নেতা–শেষ বিদায়। বলে গেলেন আমাকে শেষ কথা–"আপনি বাসায়ই থাকুন। আপনার তো কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। মাঠে তো আপনার কোন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিলোনা।"

চলে গেলেন নেতা। বসে রইলাম অবাক বিস্ময়ে কতক্ষণ আমি। কি করে আজ বিদায় নেবো বহুদিনের এ পরিচিত অফিস কক্ষ থেকে। কতদিনের স্মৃতি বিজড়িত এ অফিস। স্নেহ–বিজড়িত নেত্রে চারিদিকে তাকালাম একবার। কত স্মৃতিচিহ্ন ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। ওরা যেন কাতর কণ্ঠে বলছে–"আমাদের ছেড়ে চলে যেওনা তোমরা। ছিন্ন করে নিওনা তোমরা আমাদের মমতা ভরা সম্পর্ক। কতই না নিখাদ সম্পর্ক গড়ে তুলে ছিলাম তোমাদের সাথে। কার হাতে আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলছো তোমরা আজ অনিশ্চিত পথের

www.pathagar.com

সন্ধানে। কি তোমাদের ভবিষ্যত, কি-ই--বা আমাদের। সবাই তো সব জিনিসের কদর জানেনা। তাইতো তোমাদের কোলে স্থান পেয়েছিলুম আমরা। তারাতো আমাদের ব্যবহার জানবে না-কোলে তুলে নিবেনা তারা আমাদেরকে তোমাদের মতো।"

ঠিকই তো তাদের বলা। আলমারীর পর আলমারী ভর্তি উপমহাদেশের চিন্তানায়ক ও মণিষীদের সুচিন্তিত লেখা। নিখিল বিশ্বের মুসলিম জাতির পথ নির্দেশ। ইসলামী আন্দোলনের বীর সেনানীদের মন মগজের বিপ্লবী চেতনার খোরাক। 'তাফহীমের' সারির কি অপূর্ব রূপ শোভা পাচ্ছে ওতে। "একটি জীবন-একটি ইতিহাস" এর নতুন নীলাভ মডেলের বই গুলির কি অপরূপ সজ্জা। তাকের পর তাক সাজানো। পাঠামোদিদের কি অমূল্য সম্পদ ওগুলো। আরো কত বই। কি বুঝবে এদের মর্ম বিবেকহীন মানুষেরা। হয়তো কীটগুলোই এখন বইগুলোর সদ্ব্যবহার করবে পড়ে নয়, কেটে।

এবার উঠলাম। গেলাম আমার চেয়ারে পেছনের আলমারীটার কাছে। তাকালাম মমতাময়ী জিনিষগুলোর দিকে স্নেহাপ্লুত নেত্রে একবার। সর্ব পেছনের রুমটায় সাইক্লোস্টাইল মেশিনটা ও টাইপ রাইটারটা যেন শির কুটে আর্তনাদ করেছে আসন্ন বিরহ জ্বালায়। ষ্ট্যান্ড ফ্যানটা যেন কাতরিয়ে বলছে "আমাদেরও নিয়ে চলো।" চারকোণ বিশিষ্ট টাইমপিচটা যেন টিক টিক করে বলছে "আমার কি অপরাধ।" সব মমতা ছিন্ন করে শুধু টাইমপিচটাই হাতে নিয়ে দশটার দিকে বেরুলাম অফিস কক্ষ ছেড়ে শেষ বিদায় নিয়ে এই শেষ দেখা। গোলাপ বাগানে কর্মমুখর শিল্পির এ-ই শেষ পদচিহ্ন। যাতায়াতের নিত্যনৈমিত্তিক পথ ছেড়ে নতুন পথ ধরে হতাশাগ্রস্থ মনে ফিরে এলাম বাসায়। এখনো স্থির নিশ্চিত হতে পারছিলাম না আমাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে। তবে লক্ষণ ভালো ঠেকলো না। উহ্! আহ্! এর দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে দিয়েই কেটে গেলো কাল রক্তিম দিনটা।

দিনের শেষে নেমে এলো রাতের অন্ধকার। আমাদের ভাগ্যাকাশ থেকে বিদায় নিলো সৌভাগ্যের শুকতারা। কয়েকদিন ধরে চলে আসা নিষ্প্রদীপ মহড়ার রুটিন বাতিল হলো। জ্বলে উঠলো শহরে বিজলী বাতি। কিন্তু তখনো চলছিলো অবিরাম গুলির শব্দ। কোন পক্ষের গুলি তা তখনো বুঝে উঠা ছিলো কঠিন।

রাত বেড়ে চলার সাথে সাথে শহরের কল কোলাহলও বেড়ে গেলো। রাস্তায় রাস্তায় উচ্চস্বরের কথা শোনা যেতে লাগলো পথচারীদের। নানা জনের নানা কথা। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মন্তব্য। এবার আর অস্পষ্ট রইলোনা কিছুই। বিজয়ানন্দের বাঁশী বাজতে থাকলো চারদিকে। মিত্র বাহিনীতে ভরে গেছে রাস্তাঘাট। আগামী কালই নাকি রেসকোর্স ময়দানে স্বাক্ষরিত হবে জাতির ভাগ্যাকাশের নতুন-সনদ। গুলি-গোলার শব্দ তীব্র হতে তীব্রতর হতে লাগলো। রাতের আঁধার বেড়ে যাবার সাথে সাথে কোলাহল বন্ধ হলেও ওই বিকট শব্দের কোন বিরাম নেই। কর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো এই পাষাণ ও অসহ্য শব্দে। প্রতিটি শব্দই যেন বুকে এসে বিঁধছে।

কার্ফিউর দরুন বাজার সাজারের অনিশ্চয়তা জন্য বেকারী থেকে কিছু বিস্কুট আগেভাগেই এনে রেখেছিলাম। একই কারণে একত্রে কিছু বেশী গোশতও পাক করা ছিলো

www.pathagar.com

বাসায়। কিন্তু কিছুই খেতে ইচ্ছে হলোনা। খেলামও না কিছুই। নিস্প্রদীপ মহড়ার দৌরাত্ম নিশেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিজলী বাতির সুইচ টিপতে পারলাম না বাসায়। নিমেষ কালো অন্ধাকরেই জায়নামাজে দাঁড়ালাম, নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের দরবারে "এশার নামাজ" আদায় করতে। কতক্ষণ কাটিয়েছি সে অবস্থায় তা আঁচ করতে পারিনি। শুধু মনে আছে এক পশলা দীর্ঘায়িত অশ্রুবৃষ্টির কথা। অঝোরে শুধু কাঁদলাম আল্লাহর দরবারে। তাঁর কুদরতের কাছে। তাঁর রহস্যের কাছে জানালাম মুর্খদের আত্মসমর্পনের কথা। করলাম ফরিয়াদ কুরআনের আলোকে আমার ভাষায়ঃ-"হে খোদা! হে মহামহিম! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে উদ্ভুত ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করে দাও। তোমা হতে অধিক উত্তম ফয়সালাকারী এ দুনিয়ায় আর কেউ নেই। হে প্রভু! আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দান করো। তুমি আমাদেরকে মুসলমানের মৃত্যু দান করো। হে পরওয়ারদেগার! আমাদের উপর ধৈর্যের ধারা বর্ষণ করো। সংকট সংকুলে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করার তৌফিক দান করো। খোদাদ্রোহীদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান করো। প্রভু!-আমাদের মালিক। আমরা একজন আহবানকারীর সত্য মধুর আহবান শুনতে পেয়েছি। তিনি আমাদেরকে ঈমান আনার জন্য মধুর কণ্ঠে ডাকছেন-তিনি বলছেন-তোমরা তোমাদের পালন কর্তার উপর ঈমান আনো, এতএব আমরা তাঁর ডাকেই সৃষ্টিকর্তার উপর ঈমান এনেছি। হে আমাদের খোদা! তুমি আমাদের বিনীত নিবেদন গ্রহণ করো তুমিই একমাত্র শ্রবণকারী। তুমিই সবজান্তা। হে মহামহিম খোদা! আমাদেরকে অনুগত মুসলিম বান্দা হিসেবে গড়ে তুলো। আর আমাদের বংশধর থেকে এমন এক মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করো যারা হবে তোমারই পথে আত্মসমর্পণকরী । আমাদেরকে তোমার ইবাদত বন্দেগী ও আত্মত্যাগের সব নিয়ম-নীতি শিখিয়ে দাও। তুমি আমাদের তওবা কবুল করো তুমিই তওবা গ্রহণকারী এবং দয়ালু।"

যোনাজাত শেষে ক্লান্ত দেহ অবসন্নাদগ্রস্থ মন নিয়েই জায়নামাজে শুয়ে লেপটা গায়ে টেনে নিলাম। নিত্যকার কোলাহল মুখর ঘরে এ নিঝুম নীরবতায় সন্তানদের অভাব খানিক অনুভূত হলো। দেশের বর্তমান অবস্থায় আমাদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে? এদের সাথে আর ইহ-জগতে দেখা হবে কিনা জানিনা। তাতো শুধু তিনিই জানেন যার হাতে আমাদের ভবিষ্যৎ। ভাবান্তর হতে লাগলো একের পর এক। ঘুম হলো না। ঘুমাতেচেষ্টাও করলাম না। মাঝে মাঝে জানালার ছিদ্রপথে বাইরে বিজলী বাতি আছে কিনা চোখ খুলে দেখি। গোলাগুলির অনবরত ভীষণ শব্দ রাতের নীরবতার সাথে সাথ আরো প্রকট হয়ে উঠছে। এ যেন এক গোলাগুলির শহর। এ বিপর্যয়ের সময় বাসা থেকে সরে থাকাই ঠিক বলে মনে করলাম। কারণ, জোয়ারের প্রথম উচ্ছাসই ভয়াবহ হয়ে থোকে বেশী। এ অন্ধ উচ্ছাসের করাল গ্রাস থেকে বেচেঁ থাকার জন্যই রাত পোহাবার সাথে সাথেই বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ার প্রস্তুতি চালালাম। কোথায় যাবো কোথায় উঠবো তখনো ভেবে চিন্তে ঠিক করে নিতে পারিনি। বেরিয়ে পড়তে হবে ওটাই পিজ পিজ করছে মাথায়।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া দরকার। কিন্তু তা সত্বেও পারা গেলোনা অত সহজে। রুমটার সব জিনিষগুলোর দিকে তাকালাম এক নজর। সংসার জীবনের প্রতি মোহ যেনো

www.pathagar.com

এই প্রথম বারের মতো ধরা পড়লো আমার কাছে। সীমিত আয়ের একজন শান্ত সহজ সরল মহিলার হাতে গড়া একটি সংসার। প্রাচুর্যের আতিশয্য না থাকলেও খুব একটা অভাব অনটন ছিলোনা সংসারে। জোড়া তালিরও প্রয়োজন হতো না কখনো। নারী সুলভ হাতে সাজানো গোছানো জিনিষ পত্রগুলোতে যেন আমার কিঞ্চিত মোহ ধরলো। এর আগে ওর উপস্থিতিতে এমনটি অনুভব করেছি বলে তো মনে হয় না। আমার উপার্জিত অর্থে সংগ্রহ হয়ে থাকলেও ওগুলো ছিলো তারই আপন। আজ, বুঝলাম ওগুলো শুধু তারই আপন নয় আমারও। ওগুলোতে শুধু তারই মোহ নয়–আছে আমারও। আমার সংসার ও দাম্পত্য জীবনে ঐ সময়টাই ছিলো সবচেয়ে বেশী সুখের। তখন কে জানতো হিংস্র দানবের নিষ্ঠুর থাবা ঝড়ের বেগে আসছে আমর মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে। ভাসিয়ে দিতে আসছে উত্তাল–তরঙ্গ সুখের গড়া আমার সোনার সংসার।

যেটি যেখানে যেমনটি ছিলো তেমনটি রেখেই একটি প্যান্ট, একটি হাওয়াই শার্ট, একটি জ্যাকেট পরে বেরিয়ে পড়লাম। তখন সরগরম হয়ে উঠেছে রাস্তা ঘাট, অলিগলি সব শুধু মানুষ আর মানুষ। কারো মুখে হাসি কারো মুখে বিষাদ।

নাজিমুদ্দীন রোডে এসে এক কাফেলার স্রোতে মিশে এলাম রেসকোর্স ময়দানে। তখনো গন্তব্য অনিশ্চিত। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির দরুন ঠিকানা চ্যুত হয়ে রয়েছে অনেকেই। তাই আত্মীয়দের কে কোথায় আছে কিছুই জানা নেই। অনিশ্চিত কোথাও উঠে তাদেরকে না পেলে সেটা হবে আরো পেরেশানীর কারণ। সাত পাঁচ ভেবে অগত্যা ওখানেই উঠতে গেলাম যা আমার আখ্যায়িত নতুন জন্মের প্রসূতি ঘর। মালিবাগে আমার এক ভায়রার বাসায়।

এখানে উঠারও একটা কারণ ছিলো। এদেরে এখানে পাবার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিনই এ ভায়রার একটি মেয়ের বিয়ে হয় আমার উদ্যোগে আমারই এ বন্ধুর সাথে। এ বিয়েকে উপলক্ষ করেই ওদের সাথে একটা ঘনিষ্ঠতাও গড়ে উঠে। এ দুটি কারণে ঐ জায়গাটাকেই নির্বাচন করে নেই মনে মনে। দুঃসময়ে বন্ধুটাকেও হয়তো পেয়ে যেতে পারি ওখানে। এও ছিলো মনের একটা দুর্বার আকর্ষণ। আত্মীয় হিসাবে আমার জামাই হলেও সম্পর্ক ছিলো বন্ধুর।

দিনটি ছিলো ১৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার। সাদরেই যেন সমাদৃত হলাম বায়রার বাসায় সকলের কাছে। সকাল বেলা ছিলো বলে চা নাস্তায় আপ্যায়িত হলাম তাড়াতাড়ি। আর এটার আমার দরকারও ছিলো। ভায়রাটি ছাড়া আর যে মানুষটির প্রভাব ওই বাড়ীতে ছিলো বেশী সে মুক্তি যুদ্ধের সমর্থক একজন যুবক আমার জেঠাতো শালা ফারুক। তার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ছিলাম আমি। ভাগ্য ভালো, ইতিমধ্যেই এসে পড়লো সে। এখানে থাকা ঠিক হবে কিনা এখনই আঁচ করা যাবে। তখন একটি কামরায় কপাট বন্ধ অবস্থায় আছি। গৃহকর্তী–জেঠাইসের চাপা স্বরের গুণগুণ কথার শব্দ ভেসে আসলো কানে। সন্তর্পনেই দরজার ফাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলাম তাদের কথা কাটাকাটির প্রতি। কিছুক্ষণ পর নমনীয়ভাব প্রকাশ করলো যুবকটি। সাথে সাথেই হাসি মুখে সেল হাতে প্রবেশ করলো আমার রুমে। কাধে

www.pathagar.com

ঝুলছে রাইফেল। নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে আশ্বস্ত হলাম অনেকটা। খুঁজতে হবেনা অন্য আশ্রয়। ধরতে হবেনা ভিন্ন পথ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ওদের উল্লাসে সায় দিতে চাচ্ছিলনা মন। আশ্রয় দিয়ে থাকলেও আশ্রয় গ্রহিতার মন বুঝে কাজ করার মত উদারতা ছিলো কোথায়? দুর্ভাগ্য যে দুলা মিঞা বন্ধুটাকেও পাওয়া যায়নি ওখানে। তাঁকে পেলে হয়তো কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচা সম্ভব হতো।

বিকেল বেলা। প্রদমিত বেদনা প্রকাশ না হবার জন্যে কারণে অকারণে আমার চারিপাশের ক্ষুদ্র সমাজ রক্ষা করে চলি। অন্তঃপুরীর শান্ত পরিবেশের চা-চক্রে বসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু'একটা নিস্প্রভ হাসি যোগাই শুষ্ক ঠোঁটের বদ্ধ কোনে। অনেকের মাঝে থেকেও যেন কারুর মাঝে নেই। নিঃসঙ্গ একাকী জীবন। যা দিয়ে তরা আনন্দ করছে তাতে তখন আমার কোন অংশ নেই। কি দিয়ে বুঝাবো কিভাবে দেখিয়ে দেবো তাদের এ অন্তঃসারশূণ্য ক্ষণ-ভঙ্গুর আনন্দের কথা!

ইত্যাকার ভাবনায় আমি বিভোর। ঠিক এ সময়েই বন্ধু জামাতাটির আগমন। আকুল সমুদ্রে ভাসমান এক টুকরো তৃণের সন্ধান পেলাম আমি। পেলাম বিষাদে খানিক হর্ষ। তার সাথে ছিলো তার ছোট ভাই হেনাও। আমরা এ তিনজনই একমনা। একই পথের পথিক। গড়ে উঠলো এখানে আমাদেরই একটা পৃথক সমাজ। সদ্য বিবাহিত এ যুবকটির মনেও নেই কোন আনন্দ। সাথীহারা ব্যথার দুঃখে যেন তারাক্রান্ত সারা দেহ-মন সকলেরই। আমাদের আর্তনাদ একই সুরের। একই প্রস্রবন থেকে উৎসারিত।

'আদর্শ' মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আদর্শের জোরেই বহু ভিন্নমনা মানুষকে বাঁধা যায় একডোরে। আদর্শনিষ্ঠ মানুষই পথভ্রষ্ট হয়না সহজে। আদর্শের মিল যেখানে নেই মনের মিলেরও সেখানে অভাব। এ অভাবই বার বার লক্ষ্য করেছি আমরা আশ্রয়দাতাদের ও আমাদের মধ্যে। আদর্শ সব স্বার্থ সম্পর্কের উর্ধ্বে। এখানেই পেয়েছি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। অবশ্য আমরা এ পরিবারটিকে স্বল্প সময়ের মধ্যেই যুক্তিতর্ক ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের স্বমতে আনতে সমর্থ হয়েছিলাম।

আমার আশ্রয়দাতার বাড়ীতে আরো একজন যুবকের সাথেও আমার সাক্ষাত ঘটে। এ যুবকটিও একজন ইনসাইড মুক্তি যোদ্ধা। মাঝে মাঝে এখানে আসা যাওয়া করতো। আমার এ বাড়ীতে উঠার প্রথম দিনে কটাক্ষ করে একটুকরো শ্লেষ উক্তিও করেছিল ঐ যুবকটি। নীরবতাই ছিলো তখন আমার উত্তর। আমার নব জন্ম রহস্য এখনো অনুদঘাটিত। এ রহস্য উদঘাটনে এ যুবকের প্রসঙ্গটিও হয়তো কোন সূত্রের সৃষ্টি করে দিতে পারে। তাই তার প্রসঙ্গটিও এখানে উল্লেখ করা গেলো।

পরের দিন ১৮ই ডিসেম্বর শনিবার। এ বাড়ীতে আমর আশ্রিত জীবনের দ্বিতীয় দিন। নিরাপত্তার ছায়া নিয়েই যেন তরুণ রবি উদিত হলো পূর্বাকাশে। অনেকটা নিরাপদ বলেই মনে করতে লাগলাম নিজেকে। অন্য কোন আশ্রয়ের চিন্তা দূরই হয়ে গেলো মন থেকে। দিনের শেষে পড়ন্ত বেলায় আর এক আত্মীয় কাদের মজুমদারের আগমন হলো এ বাড়ীতে। স্বাধীন ভূমির নতুন দিনে আনন্দের প্রতীক হিসেবে যেন কার্টিসি ভিজিট দিতে এসেছেন

www.pathagar.com

তিনি। এখানে আমার অবস্থানের কথা জানা ছিলোনা তার। সংবাদ পেয়েই আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করে খুজে বের করলেন আমাকে। উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞেস করলেন আমার কুশলবার্তা। প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ দিলেন আমাকে। এক জায়গায় একাধারে না থাকার কথাটাও ছিলো পরামর্শ গুলোর অন্তর্ভূক্ত। এমন কি আগামীকালই আমাকে তিনি নিজে এসে নিয়ে যাবেন এখান থেকে-নিজ হইতে দিয়ে গেলেন এমন পাকাপাকি কথা। তার এমন উদার ও আন্তরিক প্রস্তাবকে অবিশ্বাস করারও কোন উপায় ছিলোনা। আমার সহধর্মিনীর তরফ থেকে ঘনিষ্ট আত্মীয় হবার পূর্বেও তার সাথে ছিলো আমার বন্ধুত্ব। এ জায়গায় আমার অবস্থানকালীন সময়ে অবশ্য তার দেখা আর পাইনি। তবে হাঁ এর অনেকদিন পরে একজন আসামী হিসেবে আমার ভাগ্য নির্দ্ধারণের নির্দিষ্ট দিনে জনাকীর্ণ আদালত কক্ষে তার সাথে আমার পুনর্বার দেখা হয়েছিলো অপ্রত্যাশিতভাবে। তাদের সবার প্রতি আমার বইলো অকৃপণ ধন্যবাদ।

এ ভাবেই বয়ে চললো দিন। বিয়ে বাড়ীর ঘনঘটা শেষ হয়ে থাকলেও খুশীর আমেজ তখনো বড় একটা কেটে যায়নি। তখনো এটাকে বলা যায় উপ-বিয়ে বাড়ী। পেয়িং গেষ্টের মত হলেও খুশীতে অংশ আমার কম ছিলো না। অবশ্য এসব মনকে ভুলিয়ে রাখার নিমিত্তেই। একটু একাকী হলেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো মন। ভোরের বেলায় খবরের কাগজে নজর পড়লেই আঁতকে উঠতাম। কত নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে তারা এ সময় এ কাগজগুলোকে। সরল প্রাণ জনসাধারণের মন থেকে আমাদের ইমেজকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে উঠেছে তারা।

জীবনের বিনিময়ে বুকের তাজা রক্তের লোহিত প্রবাহ বইয়ে দিয়ে হলেও নিস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্যে, বিশ্ব উম্মতে মুসলিমার হেফাজতের জন্যে, বিশাল সমুদ্রের ভয়াল তরঙ্গের মরণ ছোবল থেকে জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে অনেক সাধ্য সাধনার মাধ্যমে যে সুপ্রতিষ্ঠিত বৃক্ষটিকে আমরা দৃঢ় মূলে দাঁড় করিয়েছিলাম, তা উপড়িয়ে ফেলার জন্য কাগজের পৃষ্ঠায় তাদের কি জঘন্য পাঁয়তারা। নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রই বুঝতে পারতো তাদের এহেন হীন জিঘাংসার আসল রূপ। সাময়িকভাবে তাদের এ ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে তারা সফলতা লাভ করে থাকলেও দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারবে না এই অপচেষ্টার ফল। জনতার বিবেকের কঠোর আঘাতে মিথ্যার এ কারসাজি, কল্পনার এ রঙ্গীন ফানুস ধ্বসে পড়বেই একদিন।

কখনো কখনো তথ্যমূলক আলোচনা, আবার কখনো লুডোখেলা, অন্তপুরীর ছোট মাঠে সকাল বিকেলের ব্যাডামিন্টন খেলাই ছিলো আমদের এক মনা তিন ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজের রুটিন। সকালে শীতের হিমেল আমেজের রেশ শেষ হবার আগেই ব্রেকফাষ্ট। দুপুর পর্যন্ত খেলা। এরপর গোসল করে নামাজ পানাহার। তারপর সামান্য বিশ্রাম। পরে পরেই আবার খেলা ও বৈকালিক নাস্তা। এভাবেই কাটতে লাগলো দিন দ্রুত গতিতে। একাজগুলো অবশ্য এমিউজমেন্ট হিসাবে নয়-বরং ঘুম পাড়ানী মাসীপিসীর মতো মনকে ভুলিয়ে রাখার জন্যই। এভাবেই এক সুখ নিশির অবসানের পর সূচীত হলো আমার জীবনের নব অধ্যায়।

www.pathagar.com

১৯শ একাত্তরের ২২শে ডিসেম্বরই আমার ঐতিহাসিক নবজন্মের দিন। মূল জন্ম তেতাল্লিশের ২৮শে ফেব্রুয়ারী হলেও এ দিনটি আমার জীবনে সূচনা করেছে এক নতুন লগ্ন। খ্যাতনামা না হলেও এবার আমার অখ্যাত ও কুখ্যাতপন্যাই আমাকে বিখ্যাত করে ছেড়েছে।

একেই বলে শাপে বর। এ না হলে হয়ত দু'কলম লেখার সুযোগ হতোনা আমার কোনদিন।

কারায় প্রথম আগমন

বন্ধুদের পরিকল্পিত সলিল সমাধি আমার ভাগ্যে আর ঘটলোনা। বস্তুতঃ এ ছিলো বিধাতার ইচ্ছা। দিনের শেষে পুলিশের লোকটির প্রহরায় নিয়ে আসা হলো আমায় উঁচু পাচিল ঘেরা কারান্তরালে। আসার পথে গাড়ীর মধ্যে আমার সৌভাগ্যের কথা শুনলাম পুলিশ বন্ধুটির মুখেও। কিন্তু জানিনা কাদের কৃপায় এমনটি হলো। পরম সৌভাগ্যেরর হাত থেকে মাহরুম করে আমাকে এ পথে ঠেলে দিলো কারা। যাঞ্চা করে কোনটাই বরণ করে নেবার এখতিয়ার আমার ছিলো না। বুঝলাম দুনিয়ার ঘোলা পানির ঘোল খাওয়াতে তারা এখনো রেখে দিলো আমাকে। কারো কথাই তখন মনে জাগেনি। মনে উঠেছিলো শুধু সৌভাগ্যের কথা। সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, আদর্শের জন্যে এমন কোন ত্যাগ, কোন নিষ্ঠা, অনুপ্রেরণাযোগ্য কোন কাজ, কোন পদচিহ্ন রাখতে পারিনি–যা আমাকে আমার অসংখ্য পাপরাশির হাত থেকে উদ্ধার করে এ সোপানে এনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে; যে সোপানে এনে দিয়েছিলো এ সৌভাগ্যময় মৃত্যু সম্ভাবনা। কিন্তু হায়! পরিশেষে তা আর হলো না।

মনুষ্যবাচক প্রাণীর মধ্যে জেলরক্ষী ছাড়া ওই রাতে কারান্তরালে বোধ হয় আর কোন প্রাণী ছিলোনা। ভেতরের গেট দিয়ে প্রবেশ করে ঝুঁকে ঝুঁকে পিপড়ার গতিতে চললাম যেন এক রাজপথ ধরে। শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারছি না। উপুড় হয়ে যেন পড়ে যাই পাকা রাস্তায়। রক্তাক্ত দেহের সাথে জামা লেগে গিয়ে চটচট্ করে উঠছে। একটু টান পড়লেই যেন গোশতসহ খামচে উঠে আসে। তবুও কারার ভিতরের দৃশ্য মনের অবস্থার কিছু পরিবর্তন সূচিত হলো। হালকা হালকা অনুভূত হলো নিজকে। কে বলতো একে পাষাণ কারা। যদি উঁচু পাঁচিল ঘেরা অক্টোপাশের একপ্রান্তে সদা বন্ধ একটি লৌহ কপাটের দুর্ভেদ্য বাধা না থাকতো। পুলিশ কাষ্টোডির পনের দিনে এক রজনী কাটানো এ লৌহ প্রাচীরের অন্তরালের রাজপুরীতে ফিরে আসার জন্যে উতলা হয়ে উঠিছিলাম। মনে হয়েছিলো বছরের পর বছর কাটাতেও অসুবিধা হবেনা এ স্বপ্নের রাজপুরীতে। জায়গায় জায়গায় কি সুন্দর ফুল বাগিচা, থোকায় থোকায় ফুটে রয়েছে ফুল। পুলিশের নিরস কথোপকোথন, অভদ্র ব্যবহারে নিছক কল্পনা, যুক্তিবিহীন সংলাপের চেয়ে ওখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করাও কতো ভাল লাগতো।

গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেই সামনে পড়ে ত্রিমুখী রাস্তা। সবগুলির পাশ দিয়েই চলে গেছে কৃষ্ণচূড়ার সারি। সাদা লাল গোলাপ। বিচিত্র রঙের ডালিয়া। নানা রঙের চন্দ্র মল্লিকা, রজনী গন্ধা, হাস্নাহেনা, পদ্মরাজের সাজানো সারির সুন্দর বাগান। লম্বা হয়ে চলে

www.pathagar.com

গেছে তিন দিকেই। এগুলোর মাঝে মাঝে আবার কোথাও রয়েছে কলাফুল, মোরগফুল, রক্তজবা, সূর্যমুখী, মেশকো মটরফুল ও নীল সাদা সুন্দর কচমচ। আবার পাতা বাহারেরও বিচিত্র রংসজ্জা আছে মাঝে মাঝে। মেহগনির সমান দূরত্বের সাজানো সারি, কামিনী ফুলের মোহিনী রূপ বিকশিত হয়ে বেশ সুশোভিত করে রেখেছে এ ক্ষুধিত পাষাণ পুরীকে। বেলী আর চাম্পা বকুল আর মুকুলের ও অভাব নেই এখানে। ভাবি তবু কেন মানুষ তৃপ্তি পায়না, শান্তি পায়না, সুখ পায়না এখানে। সব কিছু থেকেও যেন কিছুই নেই। সব কিছু পেয়েও যেন কিছুই পায়না, আখ্যায়িত করে একে পাষাণ করায়। টিকতে চায়না কেউ এখানে ক্ষণিকের তরেও। এ যেন এক পাষাণপুরী। বুভুক্ষা রাক্ষসীর দেশ। হা করে চেয়ে আছে এর শিকারের দিকে। মানব গোষ্ঠিই এর উদরভর্তির পুষ্ট খোরাক। বিকর্ষণ ছাড়া এখানে আকর্ষণের কিছুই কি নেই? কে দেবে, কিভাবে দেবে এর সঠিক জবাব?

মালগাড়ীর বগী থেকে মাল নামিয়ে যেমন এক জায়গায় ফেলে রাখা হয় আমাকেও এনে তেমনি ফেলে রাখা হলো এক জায়গায়-প্রশস্ত এক বারান্দায়। বড় একটি টেবিল সামনে করে বসে আছে দুজন কারারক্ষী। নেই আর কোন লোকজন কোথাও। নীরব নিঝুম যেন এক রাক্ষসপুরী। দৈত্য দানবের দেশে রহস্য ঘেরা সব। একটি দেয়ালে ঠেস দিয়ে কুঁজো হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। ক্ষতবিক্ষত দেহের যন্ত্রনা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। কোন রকমে দেয়াল ঘেঁষে শুইয়ে পড়লাম। কোন ফাঁক দিয়ে তখন চোখে পড়লো অস্ত রবির কিরণ রশ্মি। ছ্যাত করে উঠলো মন-খেয়াল হলো নামাজের কথা। সাত সকালে চা পর্বের বৈঠক থেকে চলে আসার পর এই প্রথম বার কোন করণীয় কর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য গেলো। কিন্তু উঠতে তো পারছিনা। শরীরে যে কিছুই নেই। দেয়াল ধরে উঠতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেয়ালও মসৃণ। হাত তো এর গায়ে কোথাও ঠেকছে না ধরে উঠার জন্যে। নড়াচড়া করতে গিয়ে ব্যথায় কাতরিয়ে উঠলাম। একজন রক্ষী শব্দ করলো-

"কি হে! কি হলো?"

কাতর দৃষ্টিতে তাকালাম তার দিকে। বললাম একটু নামাজ পড়বো। উঠিয়ে দিলো সে এসে হাত ধরে আমাকে। শুকনো ওজু বানিয়ে নিলাম। অশ্রু বন্যার মাধ্যমেই শেষ করলাম আসরের নামাজ। বেলা ঘরে যাবার কিঞ্চিৎ আগে। তখনই মনে হলো জোহরের নামাজের কথা। ও নামাজ আজ আর আমার উপর ফরজ থাকবে তাতো ভাবিনি।

অস্ত রবির শেষ কিরণ মিলে গেলো। অন্ধকারের কালোছায়া ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসতে লাগলো চারিদিক থেকে। মনে কোন উদ্বেগ নেই। নেই কোন উৎকণ্ঠা। নামাজ, নামাজে চোখের দুকুল বয়ে উঠা কান্নার জোয়ার মনে কি এক স্বর্গীয় অনুভূতি ঢেলে দিলো। কান্নায় কি যে শান্তি তাতো এরূপ অনুভব করতে পারিনি আর কোনদিন। নিজের কোন দুঃখ দুর্দশার জন্যে ছিলনা এ কান্না।

"এ উঠো"-চোখ খুলে তাকালাম।

"এই নেও"-বলে আমার দিকে দুটি কম্বল, একটি থালা ও একটি বাটি বাড়িয়ে ধরলো একজন কারারক্ষী। সে সময় একটি হাত উঠাতে নামাতে লাগে যেখানে আমার কয়েক

www.pathagar.com

মিনিট সেখানে কি করে একসাথে ধরবো আমি এতগুলি জিনিস! কাতর দৃষ্টিতে ফেল্ ফেল্ করে বলে দিলাম–"ওগুলু আমি উঠাতে পারবো না বাপধন! বুঝতে পারলো মনে হয় বাছাধন আমার কাতর উক্তি। নিজেই ওগুলো নিয়ে উঠিয়ে দিলো আমাকে। নিয়ে চললো আমাকে হাত ধরে আর এক ছোট দেয়াল ঘেরা জেলের ভিতর। এটা সেল এরিয়া। এ সময়েই একটু প্রস্রাবের প্রয়োজন অনুভব হলো। এটিও আমার আজকার সকালের চা পর্বের পর প্রথম "কলঅব নেচার।" কল কখন হয়েছে খেয়াল নেই। কিন্তু অনুভূতি এখন হলো। লোকটাকে সহানুভূতিশীল পেয়ে বললাম, আমার প্রয়োজনটির কথা। বিরক্তি প্রকাশ না করে একটু এগিয়ে গিয়ে সে দেখিয়ে দিলো আমাকে একটি বড় ঘরের দিকে যেন ছোট্ট একটি গুদাম ঘর। তখন বুঝতেই পারছিলাম না এখানে কি নিশি যাপনের জন্যই দেয়া হলো আমাকে না আর কি? বেশী সুযোগ নিতে গিয়ে পাছে আবার কোন ধমক খাই ভয়ে আর কোন বাক্য ব্যয় না করে নুয়ে নুয়ে মন্থর গতিতে ইতস্তত আগালাম সম্মুখের দিকে। একি। ও গুদাম ঘরের মধ্যে আবার ছোট ছোট খোঁপ। ভয়ই লাগলো।

"কি হলো, যাওনা ভিতরে" তাড়াতাড়ি আস পেশাব করে।

ভুল ভাঙ্গলো ভিতরেরর ব্যবস্থাপনা দেখেই। বুঝতে পারলাম এটা পায়খানা পেশাবের ঘর। পেশাব হলো কিছু। কিন্তু যেন পানি নয়–কতগুলো পানি মিশ্রিত রক্ত। ভাবলাম আমার শরীরের সব রক্ত বুঝি পানি হয়ে গেছে। কিন্তু আমার সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞেস করলো না ও কারা রক্ষীটি।

এবার প্রবেশ করলাম সেল এরিয়ার দিকে। আঁকা বাঁকা পথ। চারিদিকে ফুলের বাগান। রকমারী ফুল। দৃশ্য কত সুন্দর। জেল বলেই শুধু। নতুবা এর তুলনা বিরল। এগিয়ে চললাম তাকে অনুসরণ করে। পশ্চিমমুখী পথ বয়ে যেতে যেতে বামদিকে একটি ঘরের দরজায় আরও দুজন রক্ষীকে দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেলো।

"ভাত আছেরে"–জিজ্ঞেস করলো ওদেরে এ রক্ষীটি। উত্তরে অপেক্ষা না করেই আমাকে সহ ওখানে গিয়ে দাঁড়ালো। থালাটি আমার হাতে দিয়ে ওদেরে বললো, "দে এক কাটা ভাত। কিছু ডাল ও দে।"

এক কাটা ভাত আমার হাতের থালায় দেয়ার সাথে সাথেই আমার অবশ হাত তার সামলাতে পারলো না। থালা কাত হয়ে ভাতগুলো সব পড়ে গেলো নীচে নালায়। আবার দিতে চাইলেও আমি নেবার আগ্রহ প্রকাশ করলামনা। থালায় যা আটকিয়ে ছিল তাই খাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাও খেতে পারলাম না।

রক্ষীটি আরো কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে গেলো আমাকে। একটি উঁচু পিঞ্জিরার দিকে ইশারা করে বললো–

"উঠো–উপরে উঠো।"

www.pathagar.com

সিড়ি বেয়ে ধীরগতিতে উঠলাম উপরে। ঢুকলাম পিঞ্জিরার মত একটি কক্ষে। এখানেই থাকতে হবে। জানিয়ে দিলো রক্ষীটি তালা বন্ধ করতে করতে। দু'টি কম্বল, একটি থালা ও একটি বাটিই হলো আমার এ নিঝুম অন্তঃপুরীর নিশি যাপনের সম্বল।

অচীন দেশের এক নতুন মুসাফির। ভীনদেশের এক অভিনব মুসাফিরখানায় প্রবেশ করলাম। উত্তর দক্ষিণে লম্বা পিঞ্জিরাটি। দৈর্ঘে অনুমান সাত থেকে আট ফুট। প্রস্থে চার থেকে পাঁচ ফুট। এমন একটি অপরিচিত পিঞ্জিরায় নিশি যাপন করতে হবে শুনে আতকে উঠলো মন। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। একটু মোড় দিলেই যেন ক্ষত দেহে আঘাত লাগবে দু'পাশে দেয়ালের গায়ে। কর্দমাক্ত কোন জায়গায় লাঠি দিয়ে আঘাত হানতে হানতে মাটিতে যে তরঙ্গায়ীত অবস্থার সৃষ্টি, হয়। আমার বুকের নীচ থেকে নাভীর নীচ পর্যন্ত বাম পাঁজর সহ শরীরটারও অবস্থা ছিলো তদ্রূপ।

প্রস্রাবের অবস্থাটা, তো আগেই টের পেয়েছিলাম তাই লোহার মোটা মোটা শলাকা বিশিষ্ট দরজা বন্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম–

"প্রস্রাব পায়খানার ব্যবস্থা কি?"

"ওখানেই করতে হবে"–বলে একটি গোল চাকতির দিকে ইশারা করে চলে গেলো রক্ষীটি।

একটি কম্বল বিছিয়ে একটি উড়িয়ে নিলাম গায়ে। থালাটি মাথার নীচে দিয়ে শুইতে চেষ্টা করলাম। বসলে উঠা মুশকিল। উঠলে শোয়াও হতো কষ্টকর। এ-ই ছিলো তখন অবস্থা আমার। উপায় অন্তহীন হওয়াতে হয়তো তবু নিজের সব কাজ যেভাবেই হউক নিজকেই করতে হচ্ছে। নতুবা এমন অবস্থায় অনেক লোকের সাহায্যে শুধু নড়াচড়াই করতে হতো। অন্যান্য কাজতো বাদই।

এ সময়েই মাগরিবের নামাজের কথা মনে পড়লো। কোন রকমে আবার তায়াম্মুম করে নিলাম। এ নামাজটি আদায় করে নির্যাতন ক্যাম্পে হারানো জোহরের নামাজ আদায় করলাম। এশার নামাজের আগে শোবনা ভেবে কুঁজো হয়ে বসে বসে খোদার সকাশে মনের কাকুতি নিবেদন করলাম–

–"খোদা! বেঁচে থাকবো কিনা তুমিই জানো, তবে মৃত্যুর জন্যে আমি প্রস্তুত। এ মৃত্যুকে আমার জীবনের সকল পুণ্যের চেয়েও উত্তম জ্ঞানে আলিঙ্গন করবো। সকল ধন, সকল তপস্যা দিয়েও যা অর্জন রতে পারতাম না তা কত ভাগ্যবলেই এত সহজে অর্জন করেছি। বাঁচার কামনা করে এ অমূল্যধন হারাতে চাইনে। পুঁজি ছাড়া এমন লাভ কত ভাগ্যের কথা। আর যদি বাঁচিয়ে রাখো কোন কাজের জন্যেই বাঁচিয়ে রাখো। শুধু বেঁচে থাকার জন্যে বেঁচে থাকতে চাইনে। এ দেশে যদি দ্বীনের খাতিরে আমাদের প্রয়োজন আছে মনে করো তবেই বাঁচিয়ে রাখো। আমাদের কদম জমিয়ে দাও। আর যদি জালেমদের রাজত্বই প্রতিষ্ঠিত করা তোমার চূড়ান্ত ফয়সালা হয়, তাহলে বাঁচিয়ে রেখে ওদের নির্যাতনের শিকার বানিয়ে তোমার লাভ কি? এ মৃত্যুই তার চেয়ে বহুগুণে শ্রেয়।

www.pathagar.com

"হে রাহমানুর রাহিম! জানি তুমি মজলুমের দোয়া কুবল করো। আমি কি আজ মাজলুম নই? যদি মাজলুম হয়ে থাকি আমার দোয়া কবুল করো। দ্বীনের অগ্রসেনানী আমার শ্রদ্ধেয় প্রাণতুল্য নেতৃবৃন্দের তুমি হেফাজত করো। দ্বীনের বীর সেনানী, তোমার পথের জাননেছার, মুসলিম ইতিহাসের উজ্জল নক্ষত্র, বিশ্ব-মুসলিমের গৌরব, আমাদের গর্ব, সব কর্মী ভাইকে জালেমের অত্যাচারী হস্তের নিষ্ঠুর ছোবল থেকে সরিয়ে রাখো। স্বার্থের পূজারী, বস্তুতান্ত্রিক দুনিয়ায় ভাবাবেগ ভাসমান জগতে এদের ত্যাগের কোন নজীর নেই। বেশ-ভূষা, সুখ-সজ্জা, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, বস্তুতান্ত্রিক জগতের জীবনোন্নয়নের শিকার মোহ, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততীদের মায়া কাটিয়ে তোমার রাহে শেষ রক্ত বিন্দু ঢেলে দিয়ে তোমার দ্বীনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় এরাতো কুত্রাপিও ইতস্ততঃত করেনি। সকলকে তোমার নেগাহবানীতে নিয়ে নাও।

"হে রাব্বুল আলামীন। আর এদের যে সব উজ্জল-ভবিষ্যত, সম্ভাবনাময় জীবন, তোমার দ্বীনের জন্যে বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত করেছে এদেশের সবুজ মাঠ ঘাট, রাজপথ,যাদের পবিত্র শোনিতে লোহিত হয়েে এদশের খাল-বিল, নদীজল। যারা অকুণ্ঠচিত্তে এ জগতের মায়া বিসর্জন দিয়ে বেছে নিয়েছ শাহাদাতের কঠিন পথ। তাদের এ রক্তরঞ্জিত প্রচেষ্টা তুমি গ্রহণ করো। এদের আত্মত্যাগের মহিমা এ দুনিয়ায় বিরল। তোমার পথে শাহাদতের জন্যে এদের রক্ত করে উঠতো টগ্‌বগ্। এদের শোনিতে বইতো শাহাদতের প্রাণ-বন্যা। মনে উঠতো আত্মত্যাগের ঢেউ। তাদের তোমার কছে স্থান দাও। তোমার নৈকট্য লাভের জন্যই তো তারা হয়ে উঠেছিলো দামাল-মাতাল-পাগলপারা। শাহাদতের জাম তারা প্রাণভরে পান করেছে। তুমি এখন তোমার কাছে তাদেরে বসিয়ে শরাবান তহরা পান করাও। তোমার শত্রুদের সাথে-খোদাদ্রোহীদের সাথে পাঞ্জা লড়তে লড়তে তারা খুব ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তোমার অপরূপ বাগিচার নির্মল সরোবরে তাদের রক্তে-রঞ্জিত দেহ গোসল দিয়ে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দাও। সংখ্যা-সল্পতার পরওয়া তো তারা করেনি।

হে মালিক যে জনক-জননীর কোল শূন্য হয়েছে-সন্তান হারা হয়েছে যে মাতাপিতা, স্বামীহারা হয়েছে যে কুল বধূরা, যে বোনরা ভাই হারিয়েছে, আত্মীয়-স্বজন হারিয়েছে তাদের সকলকে এ বিপদে ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দাও। এক মহান কারণের কথা তাদের মনে জাগিয়ে দিয়ে আপনজনদের বিরহ-ব্যথা উপশম করে দাও। ঈমানের মজবুতি বাড়িয়ে দাও। সহায় সম্বলহীন পরিবার পরিজনদের রুজি রুটির ব্যবস্থা করে দাও।"

"হে আহকামুল হাকেমিন! তোমার চেয়ে নিরপেক্ষ হাকিম এ দুনিয়ায় আর কেউ নেই। জ্ঞানী নেই, গুনি নেই, সুক্ষ্ম নেই, বিচক্ষণও নেই। দেশের এ বিপর্যয়ে অনেকেই ভুল করবে। এ ভুল থেকে মানুষদেরকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো। ওদের সমূহ বিজয়ে কারো মনে যেন ওদের ন্যায়পরায়ণতা ও সঠিকতার ভ্রান্ত ধারনার সৃষ্টি না করে। কারবালার প্রান্তরে ইয়াজিদের সাথে দু'জাহানের নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়নের

www.pathagar.com

মনি হযরত হোসাইনের পরাজয়, মক্কা মোয়াজ্জামায় ও মদিনা মোনাওয়ারায় ইউসুফ বিন হাজ্জাজের সাথে হযরত আবু বকরের (রাঃ) নাতী হযরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের পরাজয় যেমন প্রমাণ করেনা বিপক্ষীয়দের ন্যায় ও আদর্শ পরায়ণতার কথা। তেমনি আমাদের পরাজয়ও যেন আমাদের কারো মনে এমন সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি না হয়, বরং পারস্যের সাথে রোমের পরাজয় যেমন তাদের ভাবী বিজয়ের শুভ সংবাদের অগ্রিম বানী তেমনি তুমি আমাদের এ পরাজয়কে আমাদের সকল প্রকার দোষত্রুটি সংশোধনের সুযোগ হিসেবে আগামী দিনের বিজয়ের বানীরূপে পরিগণিত করো। তোমার রহমতের অসীম ভান্ডার থেকে এক ফোটা রহমত বর্ষণ করো আমাদের উপর। তাদের ধোকাবাজী, ছলচাতুরী কুটিলতা ও সরলপ্রাণ জনসাধারণকে মিথ্যার জাল দিয়ে প্রতারিত করার ফন্দি ও ইন্দ্রজালের বিষক্রিয়া তুমি উঠিয়ে নাও। মানুষকে সকল রহস্য বুঝবার শক্তি দাও। হে ফরিয়াদ শ্রবণকারী! তুমি আমাদের ফরিয়াদ কবুল করো। আমীন।"

মোনাজাত শেষে শুইয়ে পড়লাম। গায়ের সাথে রক্তাক্ত জামা আটকিয়ে যায়-তাতে ব্যথা পাই আবার খুললেও কম্বলের কাঁটার খোঁচা গায়ে বিঁধে। তবু শুইয়ে আছি। মাথাটাকে একটু উঁচু করার জন্যে মাঝে মাঝে একটি হাত মাথার নীচে দেই। তাও আবার বেশীক্ষণ রাখা যায় না। উত্তর শিয়রে আমি, দক্ষিণ দিকে লোহার মোটা মোটা শলাকার দরজা। হঠাৎ চাবি নাড়ার খট্‌খট্ শব্দ শুনতে পাই। শব্দ এলো কানে

"এ্য, উঠো।"

অজানা আশংকায় আতকিয়ে উঠলাম। তারা দু'জন। একজন দরজায় দাঁড়িয়ে আর একজন ভেতরে এলো। "উঠো উঠো" বলে গর্জিয়ে উঠলো। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উঠলাম। চললাম তাদের অনুসরণ করে। সামনের একটা ছোট্ট সেলে বন্ধ করলো এবার। এতরাতে নাড়াচাড়া করার কারণ কিছুই জানিনা। জানবার বাসনাও জাগলো না। এখানেও একবার প্রশ্রাব হলো। আবছা আলোতে মনে হলো আগের মতই প্রশ্রাব। কাতরাতে কাতরাতেই কারার প্রথম দুঃখ নিশির অবসান ঘটলো।

পুলিশ কাষ্টোডিতে প্রথমবার

২৩শে ডিসেম্বর। নব জন্মে আমার বয়স দু'দিন। আমার নামে তথা ইসলামী আন্দোলনের বীর সেনানীদের নামে জঘন্য মিথ্যা ও অপ-প্রচারনার প্রথম দিন। মৃত্যুর অবধারিত মুহূর্তের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাহ্য দৃষ্টির লাঞ্ছনা ও দুর্গম পথে রওনা হলো এদিনের যাত্রা। কাকে নিয়ে কেমন করে শুরু করলো তারা এ রহস্যময় খেলা।

দুনিয়ার সার্থের জন্যে, অর্থের জন্যে, যশখ্যাতির জন্যে ছিলোনা আমাদের রাজনীতি। ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই আমরা এ ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। খোদাদ্রোহীতার বিষক্রিয়া হতে মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্যেই ছিলো আমাদের রাজনীতি। এ ময়দানে আমাদের সততা ও নিষ্ঠার পরীক্ষাও একাধিকবার হয়েছে। আরো

www.pathagar.com

পরীক্ষার জন্যও আমরা তৈরী আছি। কি নির্জলা মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে আমাদের নামে প্রচার করছে তারা।

ভোরে ফজরের নামাজ আদায় করলাম শায়িত অবস্থায়। ইশারা করে। সেল খুলে দেয়া হলো। বেরুতে পারলাম না। সারা শরীরে বিষময়ব্যথা। সময় কতক্ষণ তাও জানিনা। এরই মধ্যে একজন কারারক্ষী আমার হাতে একটি রুটি দিয়ে বললো।

–"খেয়ে শু'য়ে থাক–নইলে কাজ করতে নিয়ে যাবে।"

তার কথার অর্থ পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারলামনা–আবার কি কাজ! আমি তো নড়তেও পারিনা। কিন্তু এ রক্ষীটিকেও সহানুভূতিশীল বলে মনে হলো। আমার দুরাবস্থার কথা বোধ হয় আমার অজান্তেই আঁচ করতে পেরেছে সে। রুটিটা খেতে পারলামনা। পাশে পড়ে রইলো ওটা।

একটু পরেই সিভিল পোশাকে একজন লোক পাশে দাড়িয়ে আমাকে খুব তাড়া করে ডাকছে। চোখ খুললে তার মধ্যে খুব ত্রস্ততা দেখতে পেলাম। জিজ্ঞাসুনেত্রে তার প্রতি তাকালাম। তার হাতে একটি কাগজ।

"উঠুন। তাড়াতাড়ি উঠুন।" বললো লোকটি। পরে বুঝেছি, লোকটি কোর্টে বা পুলিশ কাষ্টোডিতে ডেকে নিয়ে যাবার একজন সিপাহী। পরে বুঝেছি, লোকটি কোর্টে বা পুলিশ কাষ্টোজিতে ডেকে নিয়ে যাবার একজন সিপাহী।

বললেই তো আর উঠা যায় না। দু'হাত পেছনে ঠেস দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা উঠিয়ে হাতে পিছন ভর রেখেই বসলাম। পা দু'টি সটান লম্বা। আমার পাহারায় নিযুক্ত সিপাহীর হাতে একটি স্লিপ দিয়ে হাত ধরে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে রওনা হলো। পথে পথে দু'একটা কথাও বললো আমার সাথে। আমার সম্যক পরিচয় পেয়ে বললো–"আপনারা ভালই ছিলেন। তবে এবার কাজটি ঠিক করেননি।" বলতে বলতে আমাকে উপস্থিত করলো কালকের সেই প্রশস্ত বারান্দার টেবিলটির কাছে।

টেবিলটির একপাশে লম্বা দাড়িওয়ালা চশমাধারী একজন লোক চেয়ারে উপবিষ্ট। সামনে ষ্টেথিস্‌কোপ–তার পরিচয়ের প্রতীক। মনে করলাম আমার চিকিৎসার জন্যে ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। তাঁর প্রকৃতিগত বড় বড় চোখ দিয়ে টেনে টেনে আমার দিকে তাকালেন একবার। একটি বড় রেজিষ্টারে কি লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে–

–"নাম?"

"পিতার নাম?"

"গ্রাম?"

"স্ত্রীর নাম?"

"বয়স?"

সাথে সাথে সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলাম আমি। এরপর জামাটি উল্টিয়ে দেখলেন আমার ক্ষতবিক্ষত শরীরটি। আগেকার দিনের রেশন কার্ডের মত একটি শক্ত

www.pathagar.com

কাগজ দিলেন তিনি ওই লোকটির হাতে। এ'টি হলো হিষ্টরী টিকেট। এখানকার নাগরিকদের নাম ধাম, ঠিকানা, কেস নং ধারা ঔষধপত্র, নালিশ, বিচার আচার মায় সবকিছুর রেকর্ড থাকে ওতে। আমার দিকে আর একবার তাকিয়ে বললেন–

–"আপনাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ওখানে বলবেন, এখানে আপনার কোন চিকিৎসা হয়নি।"

টিকেটটিতে তখন কি লেখা হয়েছিলো তা ওই দিন দেখার সুযোগ হয়নি–দেখার মত মনও ছিলোনা। পনের দিন পর আবার অর্ধমৃত অবস্থায় জেলগেটে যখন ফিরে আসলাম, এখান থেকে ওই টিকেটটি সাথে দিয়ে আমাকে পাঠানো হলো ভিতরে। তখনই দেখতে পেলাম ওতে, ওইদিন থেকে পনের দিন আগের জেল–হাসপাতাল ডাক্তারের মেডিকেল রির্পোট। ডাক্তার লিখেছিলেন ওতে–Multifle injuries in his whole of body. He is badly in need of medical treatment.

কার কাছে দিয়েছিলো এ রিপোর্ট, কেন দিয়েছিলো, কি এ্যাকসন হলো এর কোন অর্থ আজও বোধগম্য হয়নি। অথচ কাষ্টোডিতে নিয়ে যাবার দিন থেকেই শুরু হলো সরকারী অনুমোদনে নতুন নির্যাতনের দীর্ঘ পালা।

এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ওই লোকটি আমার হাত ধরে ধরে আবার চললো জেল অফিসের দিকে। পথ চলতে চলতে কাতর স্বরে জিজ্ঞেস করলাম তাকে–

–"কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে–"

কিছু না বলেই শুধু নিয়েই চলছে সে। একবার ভাবলাম, নাকি ছেড়ে দিতেই নিয়ে যায়। তখন কে জানতো মিথ্যার ব্যসাতি ছড়িয়ে আজকার সংবাদপত্র আমার কুখ্যাতি বুকে লয়ে দেশবাসীর কাছে, সারা দুনিয়ার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। আর তার খেসারত দেবার জন্যে আমি এখন রওয়ানা হয়েছি আর এক দুর্গম পথে–নতুন আর এক দেশে।

জেল অফিসে গিয়ে পৌছলাম।

"স্যার এই–" বলেই তৎকালীন ডেপুটি জেইলার শামসুর রহমানের সামনে আমাকে রেখে চলে গেলো লোকটি। সিভিল পোশাকে বসা ভদ্রবেশধারী দু'জন লোক তার সামনে। আমার দিকে তাকিয়েই আছে তারা। হাতে খবরের কাগজ। কিছু কথাবার্তার পর ডিপুটি জেলার আমাকে তাদের হাওলা করে বললেন–

"নেন আপনাদের মক্কেল"

রাইফেলধারী দু'জন সিপাহী, ষ্টেনগানধারী একজন হাবিলদার এসে আমাকে ঘিরে ফেললো। বোধ হয় দুরবস্থার কবলে পতিত বলে এ কুখ্যাত নায়ককে হ্যান্ডকাপ লাগানো তারা প্রয়োজন বোধ করেনি। তারাই ধরে ধরে আমাকে নিয়ে উঠালো একটি গাড়ীতে। পিছনের সিটে দু'জন অফিসারের মধ্যে আমি বসা ড্রাইভারের পাশে দু'জন সসস্ত্র সিপাহী। পিছে প্রহারারত একটি জীপ। রওয়ানা হলো তারা আমাকে নিয়ে।

www.pathagar.com

এস, বি অফিসে নিয়ে গেলো আমাকে। জেল ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী গাড়ী হতে নামার কালে একজন অফিসারকে বললাম-

"আমার চিকিৎসা করা হয়নি।"

"হাঁ। সব চিকিৎসা হবে। শর্ত একটি। সবকথা খুলে বলতে হবে। সত্য কথা বললে আমরা আপনাকে রাজসাক্ষী বানাবো।"

অবস্থার জটিলতা বুঝতে আর বাকী রইলোনা। সুযোগ দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ভাল ফাঁদ পাতছে তারা। খামুশ হয়ে গেলাম। দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে আরো দুর্দশা ভোগের ইঙ্গিত পাওয়া গেলো। সকল নির্যাতনকে বরণ করে নিবার জন্য মনে মনে তৈরী হয়ে গেলাম। মনোবল বেড়ে গেলো। হালকা হালকা অনুভব করতে লাগলাম নিজকে। বড় একটি রুমের এক পাশে হার্ডবোর্ডের পার্টিশন দেয়া ছোট একটি কক্ষে নেয়া হলো আমাকে। একটি চৌকিতে ডান কাত হয়ে শু'য়ে পড়লাম ওখানে।

কড়া পাহারার ব্যবস্থা। ছোট কক্ষটিতে দু'জন রাইফেলধারী পুলিশ পাহারায় মোতায়েন। আবার গোটা রুমটিকে ঘিরে সান্ত্রীদের দল পাহারায় যেন 'মাসুদ রানার' ধৃত ডিটেকটিভ নায়ক আমি। সব কুপোকাত করে কোন অভিনব কৌশলে আমার পালিয়ে যাবার ভয় আছে। আমাকে নাস্তা খাবাবার জন্যে একজন লোককে কয়েকবার বলতে শুনলাম। খাবনা বলে দিয়ে প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করলাম।

আমার আগমন সংবাদ বোধহয় মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এক নজর দেখার জন্য জমে উঠেছে মানুষের ভীষণ ভীড়। চিড়িয়াখানার যেন আমি এক আজব চীজ। লোক মানিয়ে রাখা হয়ে উঠেছে বড় কঠিন। জনতার প্রবল ইচ্ছার সামনে নতি স্বীকার করে অবশেষে কর্তৃপক্ষ রুমের দু'দিক থেকে তিনটি জানালা খুলে দিলো। প্রাণভরে দেখে নিলো জনতা আমাকে। হাতের কাছে ঢিল পেলে হয়তো 'মিনা'র পাথর মারার সুন্নত আদায় করে ফেলতো তারা। তবে নানারকম মন্তব্য করতে ছাড়েনি অনেকেই। এক এক জনের এক এক ধরনের মন্তব্য। এ সময়ে একজন লোক আমার কাছে এসে একটি "দৈনিক বাংলা" মেলে ধরে একটি ছবির দিকে আঙ্গুলী নির্দেশ করে বললো-

"এটি কে?"

দেখলাম ছবিটি আমার। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে আমাকে গ্রেফতার করার পর উঠানো ফটো ছিলনা এটি। বরং আমার বাসা থেকে আনা ফটোই ছিল এটা। হুভার ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্যে উঠানো সাদা পাঞ্জাবী পরা ফটোর একটি কপি ছিল আমার বাসায়ই। ওটিই এনে পেপারে পরিবেশন করেছে। আর তার এক কপি D. S. P ট্রাফিক অফিসে তালাশ করলে পাওয়া যেতে পারে। আমার গ্রেফতারের সময় আমার গায়ে ছিলো সাদা হাওয়াই সার্ট। দৈনিক ইত্তেফাকে অবশ্য আমার গ্রেফতারের পর উঠানো ফটোই পরিবেশন করেছিলো।

www.pathagar.com

পাশের রুমটিই ইন্টেরোগেশনের রুম। কাগজপত্র নাড়াচাড়ার খসখস আওয়াজ, নীচুস্বরের গুনগুণ শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি এখান থেকেই।

দিনের বারোটার দিকে ইন্টেরোগেশন রুমে আমার ডাক পড়লো। একজন সান্ত্রীর হাত ধরে পৌঁছলাম ওখানে। বসতে দে'য়া হলো আমাকে টেবিলের এক পাশে। আর তিনপাশ গিরে বসে রয়েছে ইন্টেরোগেশন টিম। এ টিমের নায়ক দু'জন ইন্সপেক্টর। একজন ইনস্পেক্টর আবুল কাশেস ও অপরজন কামালউদ্দিন আহমদ। তারা বেশ আয়তলোচনে কথাবার্তা শুরু করলো। যেনো এটা একটা স্বাভাবিক আলোচনা সভা। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিয়েই শুরু করলো আলোচনা। কিছু কিছু লোক দায়ে পড়েই রেজাকার হয়েছে। মুজাহিদ হয়েছে। "আলবদর' আশশামছ'ও অনুন্যপায় অবস্থায়ই হয়েছে। সরকার এসব লোকদেরকেই মাফ করে দেবেন। একজন অপরিচিত আগন্তুকের মতোই চুপ করে রইলাম আমি। কিছুক্ষণ পরই আমার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন হলো–

ইন্সপেক্টরঃ–"আচ্ছা আপনি কি সিদ্ধান্ত করেছেন–কি করবেন?"

আমিঃ–চুপ।

ইন্সঃ–আপনি ঠিক ঠিক সব কথাগুলি বলে দিলেই আমরা একটি ষ্টেটমেন্ট তৈরী করে আপনাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করবো। আপনার কোন ভয় নেই।

আমিঃ–চুপ।

ইন্সঃ–আপনাকে আমরা সৎ পরামর্শ দিচ্ছি। সব খবর বলে দিয়ে আমাদিগকে সব কথ্য সরবরাহ করে আপনি সেফসাইড চলে যান। খামাখা নিজের জীবনকে কেন বিপন্ন করে তুলবেন। রাজসাক্ষী বনে যান। সরকার আপনার পক্ষে থাকবে। দুনিয়ার গোয়েন্দাদের ইতিহাস জানেন না? পৃথিবীর কত বড় বড় রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে। গোয়েন্দা বিভাগ সাফল্যজনকভাবে কাজ করেছে। রাজসাক্ষী দিয়ে প্রকৃত দোষীকে খুজে বের করেছে। রাজসাক্ষীরা পেয়ে গেছে মুক্তি। অবশ্য রাজসাক্ষী না হলেও আমাদেরকে ফাঁকি দে'য়া যাবেনা। শুধু একটু পরিশ্রম করতে হবে। এ যা। আমরা সব খবর নেবোই। নেবার সব ক্লু আমাদের হাতেও রয়েছে। তবে তখন আপনার নিস্তারের সকল পথ হয়ে যাবে রুদ্ধ। আপনার জন্য আমাদের বড় দয়া হয়। আপনি তাই সব খুলে বলুন।

আমিঃ–চুপ। (তাদের অবাস্তব কথাগুলোর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ।)

ইন্সঃ–কি আপনি কথা বলছেন না কেনো? আপনি কি বিবাহিত?

আমিঃ–হাঁ।

ইন্সঃ–সন্তানাদি আছে?

আমিঃ–আছে।

ইন্সঃ–কয়টি?

আমিঃ–তিনটি।

www.pathagar.com

ইন্সঃ–ছেলে কয়টি মেয় কয়টি?

আমিঃ–সবই মেয়ে।

ইন্সঃ–আপনার বর্তমান বয়স কত?

আমিঃ–ত্রিশ।

ইন্সঃ–মিঃ খালেক, আমাদের পরামর্শ–এ বয়সে আপনি আপনার জীবনটাকে নষ্ট করে দেবেন না। এখনো অনেক ভবিষ্যত আছে আপনার। মেয়েগুলোর জন্যই আপনার বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে। সন্তানের মায়া কার না আছে? আপনারও আছে নিশ্চয়। আপনি সরকারের সহযোগিতা করুন। সরকার আপনার সহযোগিতা করবে। আপনাকে আরো কিছু সময় দেয়া হলো চিন্তা করুন, কি করবেন। এহে কে! আছো–এনাকে নিয়ে যাও।

সান্ত্রীর সাথে চলে গেলাম আমার নির্দিষ্ট কক্ষে। খুব হাঁপিয়ে উঠেছি। গিয়েই শু'য়ে পড়লাম। খাবার জন্যে একজন সিভিল পোশাকের লোক পীড়াপীড়ি করলো। কিন্তু খেতে ইচ্ছে হলো না। তায়াম্মুম করে শুইয়ে শুইয়ে জোহরের নামাজ আদায় করলাম। একেতো পুরা শীতের মৌসুম। আবার শরীরের ব্যথা বেদনার জ্বর। কিন্তু উপায় কি একটি সার্ট ছাড়া তো গায়ে আর কিছু নেই।

অনুমান বেলা তিনটার সময় আবার নেয়া হলো ইন্টেরোগেশন রুমে। টিমটি আগের মতই একদিক খালি রেখে বসে আছে। আমার পক্ষে বসে থাকা ছিলো বড় কষ্টকর। তব বসতেই হলো গিয়ে ওখানে। শুরু হলো প্রশ্নের পালা।

ইন্সঃ–আপনি এখন কেমন ফিল করছেন?

আমিঃ–ভাল।

ইন্সঃ–"মনস্থির করেছেন কি করবেন?"

আমিঃ–আপনারা কি জন্যে আমাকে গ্রেফতার করেছেন? আমার অপরাধ কি?

ইন্সঃ–তা জানেন না?

আমিঃ–না।

ইন্সঃ–আজকার সংবাদপত্র দেখেছেন?

আমিঃ–তা পাবো কোথায়?

ইন্সঃ–বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, আলবদর বাহিনী গঠন করে বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করার অপরাধে প্রমান্য দলিল–পত্রের ভিত্তিতে আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আপনি একজন আলবদর কমান্ডার।

আমিঃ–এ সব মিথ্যা কথা।

ইন্সঃ–মিথ্যে বললে তো হবে না। দলিলপত্রই বলবে সত্য কি মিথ্যা।

আচ্ছা–আপনার বাসা কোথায়?

www.pathagar.com

আমিঃ-আগামসি লেনে।

ইন্সঃ-গ্রেফতার করা হয়েছে আপনাকে কোন খান থেকে?

আমিঃ-মালিবাগ থেকে।

ইন্সঃ-ওটা কার বাসা?

আমিঃ-আমার এক আত্মীয়ের বাসা।

ইন্সঃ-কত নম্বর বাসা?

আমিঃ-নম্বর জানিনা।

ইন্সঃ-ওখানে গিয়েছিলেন কেনো?

আমিঃ-আত্মীয়ের বাসা তাই।

ইন্সঃ-আপনার ফ্যামিলি কোথায়?

আমিঃ-দেশের বাড়ীতে।

ইন্সঃ-কখন পাঠিয়েছিলেন?

আমিঃ-যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়।

ইন্সঃ-কোন তারিখে? তারিখ মনে আছে?

আমিঃ-হাঁ আছে-১০ই ডিসেম্বর।

ইন্সঃ-কেন পাঠিয়েছিলেন?

আমিঃ-যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিরাপত্তার জন্যে।

ইন্সঃ-মালিবাগও আপনি আশ্রয় নিয়েছিলেন নিরাপত্তার জন্যে?

আমিঃ-খালি বাসা তাই গিয়েছিলাম।

ইন্সঃ-কোন হদিস ছাড়াই কি তারা আপনাকে গ্রেফতর করেছে?

আমিঃ-অনুমানের উপর ভিত্তি করে।

ইন্সঃ-অনুমান নয়। সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করেই বহু অনুসন্ধানের পর গ্রেফতার করা হয়েছে। আপনাকে বাঁচতে চান তো সব খুলে বলে দেন। কি কি কাজ আপনারা করেছেন। এখনও সময় আছে।

আমিঃ-জামায়াতে ইসলামী, ঢাকা সিটির অফিস সেক্রেটারী ছিলাম আমি। একজন অফিস সেক্রেটারী হিসাবে আমার সকল কাজ অফিস কক্ষের মধ্যেই ছিলো সীমাবদ্ধ।

ইন্সঃ-কি কি কাজ ছিলো আপনার?

আমিঃ-আমার মুখ্য কাজ ছিলো অফিস মেইনটেইন করা। হিসাব পত্র রাখা। খরচ-পত্র দেখাশুনা করা। সময় মত কর্মি সভা ডাকা। সভার এন্তেজাম করা ইত্যাদি।

ইন্সঃ-আপনি কি লেখাপড়া করেছেন? কোথায় পড়েছেন? কোন সালে কি পাশ করেছেন?

www.pathagar.com

আমিঃ–কামেল পাশ করেছি মাদ্রাসা–ই–আলিয়া ঢাকা হতে ১৯৬০ইং সনে। ম্যাট্রিক পাশ করিছি দরবেশপাঞ্জ হাই স্কুল থেকে ১৯৬২ইং সনে। আই, এ, ও বি, এ পাশ করেছি যথাক্রমে ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ইং সনে জগন্নাথ কলেজ থেকে। ডিপ্লোমা ইন–লাইব্রেরী সাইন্স পাশ করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি হতে ১৯৬৯ইং সনে।

ইসঃ–জামায়াতে ইসলামীর অফিস সেক্রেটারী হলেন কখন?

আমিঃ–১৯৬৯ সনের অক্টোবর থেকে।

ইসঃ–বি, এ, পাশ করার পর এতদিন কি করলেন?

আমিঃ–চাকুরী করেছি। পাঠ্যজীবন থেকেই চাকুরী করে আসছি।

ইসঃ–কোথায় চাকুরী করেছেন?

আমিঃ–আই, এ, ও বি, এ পড়েছি নাইট কলেজে, সে সময় চাকুরী করেছি সেন্ট্রেল ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায়। বি, এ পাশ করার পর চাকুরী করেছি ডাইরেক্টোরেট অব টেকটিকেল এডুকেশনে। এরপর এসিষ্টান্ট লোকাল অডিটার হিসাবে এ, জি, ই, পি তে কাজ করেছি। এ সময়েই নাইটে ডাকা ইউনিভার্সিটিতে ডিপ্লোমা–ইন–লাইব্রেরী সাইন্স পাশ করেছি।

ইসঃ–ছাত্র জীবনে কোন দল করতেন?

আমিঃ–স্কুল–মাদ্রাসা জীবনে তো কোন দলের নামই শুনিনি। কলেজ জীবনে অবসরই পাইনি। দিনে অফিস রাতে কলেজ। এর মাঝে আবার টিউশনি করতাম। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে কোন দল করার সুযোগই ছিলোনা।

ইসঃ–সমর্থন করতেন কোন দলকে?

আমিঃ–ইসলামী ছাত্র সংঘকে।

ইসঃ–আলবদর বানিয়েছে কারা?

আমিঃ–তা বলতে পারিনা।

ইসঃ–জামায়াতে ইসলামী ছাত্র সংঘের ছেলেদের দ্বারা 'আলবদর' গঠন করেনি?

আমিঃ–আমি বলতে পারিনা।

ইসঃ–আপনি অফিস সেক্রেটারী। আর আপনি জানেন না। এটা কোন একটা কথা হলো!

আমিঃ–আলবদরের কথাটাই আমি স্বাধীনতার টিকটবর্তী সময় থেকে শুনে আছি। এদের সংগঠনের ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা। পার্টির পলিসি মেকিং এ আমার কোন অংশ ছিলোনা।

ইসঃ–আপনার কোন ধারণা হয়না?

আমিঃ–আর্মি দ্বারাই সংগঠিত হয়েছে বলেই আমার ধারণা।

www.pathagar.com

ইলঃ-আপনাদের পলিসি মেকিং কারা করতো?

আমিঃ-জমলিসে সুরা-পরামর্শ সভা।

ইলঃ-তাদের কারো ঠিকানা জানেন?

আমিঃ-ঠিকানা বলতে পারিনা। তবে দু'একজনের বাসা চিনি?

ইলঃ-চৌধুরী মঈনুদ্দীনকে চিনেন-না তাও চিনেনা?

আমিঃ-চিনি।

ইলঃ-কি করতো সে?

আমিঃ-দৈনিক পূর্বদেশে কাজ করতো।

ইলঃ-সে ছাত্র-সংঘ করতো না জামায়াত করতো?

আমিঃ-জামায়াত করতো?

ইলঃ-সে 'আলবদর' ছিলো?

আমিঃ-আমি জানিনা।

ইলঃ-আশরাফুজ্জমানকে চিনেন?

আমিঃ-না।

ইলঃ-একটি কথাও সত্য বলছেন না, খালেক সাহেব।

আমিঃ-মিথ্যা কথা আমরা বলিনা।

ইলঃ-আজ একটিও সত্য কথা বলেন নাই।

আমিঃ-চুপ।

ইলঃ-মেলিটারী কোন কোন অফিসার আপনার বাসায় আসা যাওয়া করতো?

আমিঃ-বাসাতো দূরের কথা আমাদের সিটি অফিসেও কোনদিন কোন মেলিটারী অফিসার আসেনি।

ইলঃ-আসতো না?

আমিঃ-না

ইলঃ-আপনার বাসায় বেশ কয়েকজন বড় বড় মেলিটারী অফিসারের নাম পাওয়া গেলো কি করে?

আমিঃ-এতেই আমার বাসায় সামরিক অফিসার আসার কথা প্রমাণিত হয়?

ইলঃ-অন্ততঃ যোগাযোগ ছিলো তা তো সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

আমিঃ-কোন অফিসার তো দূরের কথা একজন সাধারণ সামরিক ব্যক্তির সাথেও আমার কোন যোগাযোগ ছিলোনা।

ইন্সঃ-আপনি কি আর্মি হেডকোয়ার্টারে যাতায়াত করতেন না?

আমিঃ-মোটেই না।

ইন্সঃ-তবে কারা যেতো?

আমিঃ-আমাদের সিটি অফিসের সাথে আর্মির কোন যোগাযোগই ছিলো না।

ইন্সঃ-খন্দকার ইলিয়াসকে চিনেন?

আমিঃ-কোন খন্দকার ইলিয়াস?

ইন্সঃ-লেখক।

আমিঃ-না, চিনিনা।

ইন্সঃ-মেলিটারির সাথে আপনি তার বাসায় যান নাই, তাকে ধরতে?

আমিঃ-না অবশ্যই না। কোথায় তার বাড়ী তাও আমি জানিনা।

ইন্সঃ-ওই বাড়ীর লোকজনরা তো আপনার কথা বললো।

আমিঃ-অসব, হতেই পারেনা।

ইন্সঃ-আমরা দুঃখিত খালেক সাহেব! ভদ্রতার সাথে আপনি কোন কথা স্বীকার করবেন না।

আমিঃ-না জানলে অভদ্রতা করলেও বলবো কোত্থেকে?

"কামাল সাহেব, দেখতে যত সোজা কাজে তত সোজা নয়। সিভিয়ার টর্চার ছাড়া কোন কথা বলবে না"-বললো প্রধান নায়ক প্রবর ইন্সপেক্টর আবুল কাশেম তার সহকর্মী ইন্সপেক্টর কামাল উদ্দীন আহমদকে।

"ব্যবস্থা করুন, সাগ্রী ডাকুন।"

বুঝে গেলাম, জেল ডাক্তারের পরামর্শের বিপরীত কাজ হবে এখানে। শরীরের এ চরম দুরবস্থার উপর আর নির্যাতন চালালে বাঁচা দায়ই হয়ে পড়বে। মনে মনে কলেমা তাইয়্যেবা পড়ে পড়ে মৃত্যুর জন্যে তৈরী হয়ে গেলাম। হঠাৎ কোত্থেকে যেন এক স্বর্গীয় সাহসের সঞ্চার হয়ে গেলো মনে। বেপরওয়া হয়ে গেলাম। তাদের নির্যাতনের জন্যে যেন উতালা হয়ে উঠলাম।

ইন্সঃ-এখনো সময় আছে খালেক সাহেব। ঠিক ঠিক করে সব কথা বলুন।

আমিঃ-চুপ (ঘৃণা ভরে)

ইন্সঃ-আপনার কমান্ডে কতজন 'আলবদর' ছিলো?

www.pathagar.com

আমিঃ–তাহা মিথ্যা কথা। আমি আলবদরই ছিলাম না।

ইলঃ–আশ্চার্য! হাজার হাজার লোক আপনাকে আলবদর কমান্ডার বলে সেনাখত করেছে। দেখেছে। এর অসংখ্য প্রমাণ্যাদি রয়েছে। অনেক কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। অতএব এসব কথা এখনো গোপন করে রাখা আপনার ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হবে। এসব গোপন করে রেখে আমাদের হাত থেকে বাঁচা আপনার পক্ষে সম্ভব হবেনা।

আমিঃ–(মৃদু হাসি দিয়ে) দলিলপত্র পাওয়া গেলে আপনাদের অতসব কষ্ট করার কি প্রয়োজন? দলিলপত্রই কথা বলবে।–আসলে ওসব মিথ্যা কথা। আমার বাসায় আমার ব্যক্তিগত কাগজপত্র, বই–পুস্তক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ পরীক্ষার আমার হস্তলিখিত কিছু নোট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যেতে পারে না। যায়ও নাই।

ইলঃ–শহীদুল্লাহ কায়সারকে কোথায় নিয়ে রাখা হয়েছে। এখন কোথায় আছেন তিনি?

আমিঃ–আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। তাকে জীবনে কোনদিন দেখিওনি।

ইলঃ–মিথ্যে আর কাকে বলে।

আমিঃ–চুপ।

ইলঃ–শহিদ সাহেব জীবিত আছে?

আমিঃ–কিভাবে বলবো।

ইলঃ–ধারণা কি হয়?

আমিঃ–যে সম্বন্ধে কিছুই জানিনা, সে সম্বন্ধে কি ধারণা হবে?

ইলঃ–জানবেন, ধারণাও হবে। সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠেনা। যা উঠে তা দিয়ে কাজ হয় না। কাজের ঘি আঙ্গুল বাঁকা করেই উঠাতে হয়।

ইল কামাল–"সান্ত্রী! সান্ত্রীর প্রবেশ। দু'হাতে কড়া লাগাও"

সান্ত্রী এসে নিয়ে গেলো আমাকে একপাশে। দু'হাত পরিয়ে দিলো হাতকড়া। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'হাত দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াবার নির্দেশ করলো ইলপেক্টর কামালউদ্দিন। পা দু'টি দেয়াল থেকে হাত দেড়েক দূরে। এবার হাতের গিরা পায়ের গিরা ও কোমরে শুরু হলো হান্টারের বাড়ী। হান্টার পরিচালনা করছে স্বয়ং কামালউদ্দিন নিজে।

কালকের অমানুষিক অত্যাচারের পর আজ আবার এ নতুন অত্যাচার কি করে সহ্য করলাম তা ভাবলে আজও চোক বন্ধ হয়ে আসে। মেরেই ফেলবে।মরেই যাবো। কাজেই প্রশান্ত মনে শুধু আল্লাহকেই স্মরণ করতে লাগলাম। তাঁর স্মরণেই এত উৎপীড়নেও নিস্তেজ নিরুৎসাহ ও দুর্বল হয়ে পড়েনি। সে সময়ই মনে জাগতো অন্যায় তো আমরা কিছুই করিনি। করিনি আমরা কোন অপরাধ। আল্লাহর পথে ছিলোম। তাঁরই জন্যে কাজ করেছি। আমরা তো কারুর কোন ক্ষতি করিনি। অন্যায় করিনি। বরং অন্যায় রুখেছি। অপকার করিনি বরং উপকার করেছি। মানুষকে দুর্বিসহ অবস্থা থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছি। আর্মি

www.pathagar.com

তো আমরা ডেকে আনিনি। এনেছে তারা। আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে তারা আসেনি বরং এসেছে তাদের সাথে আলাপ করে। সামরিক বাহিনীকে তারাই এ দেশের সরলপ্রাণ নিরীহ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে নিরাপদ পোতাশ্রয় ভারতে। আমরাই বরং সামরিক বাহিনীর বন্দুকের নলকে উপেক্ষা করে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এসেছি। এ-ই যদি আমাদের অপরাধ হয় তাহলে এ নির্যাতনই আমাদের প্রাপ্য। নতুবা তাদের বিচার খোদার হাতে। জালেমের এ জুলুম অবনত মস্তকে সহ্য করেই যাবো। মানুষের ভুল ভাঙ্গবার পরই আমরা এর ফল পাবো। সে ভুল ভাঙ্গতে হয়তো বেশী দিন লাগবে না।

এভাবে অনুমান রাত ৮টা পর্যন্ত চললো জালেমের পৈশাচিক অত্যাচারের নির্মম পালা। কোন সময়ে পড়ে গিয়েছিলে ফ্লোরে তা মনে নেই। আমার নির্দিষ্ট কক্ষে ধরাধরি করে নিয়ে যাবার সময় টের পেলাম।

অতঃপর অনুমান রাত নয়টার দিকে শসস্ত্র পাহারায় নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে রমনা থানায়। যাবার কালে দয়া করে একখানা ছেঁড়া কম্বল দিয়ে দিলো আমাকে এ কম্বলখানা আমার জীবনের স্মরণীয় সাথী। সে নিদানকালে এ কম্বলখানার আন্তরিক আতিথেয়তা স্মৃতিপট থেকে মুছে দেবার নয়। এ যেন আমার দুর্গত জীবনে আপনজনের মত আমাকে সেবা শুশ্রূসা করেছে। আমাকে ভাল করে তুলেছে। আমার সাথে সাথে থানার সাথী আরো দু'একজন ভাইকেও ডানায় পুরে রেখেছিলো এ কম্বলকানা। মনে পড়ে সে প্রকোপ শীতের দিনে কম্বলখানা মাঝখান দিয়ে ফেটে যাবার পর ওটাকে দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আবার সেলাই করে নেই। রমনা থানার বরফের মত ঠান্ডা মেঝেতে বস্ত্রহীন অবস্থায় এ সাথীটিই উপরে লেপ নীচে বিছনার কাজ দিয়েছে।

রমনা থানায়ও বেশ প্রদর্শনীর মহড়া চললো। নানাজনের নানা মন্তব্যের সাথে সাথে এখানেও এ মরাদেহে জালেমদের হিংস্র থাবা আর বিষাক্ত নোখরের নিষ্ঠুর দংশন থেকে রেহাই পাওয়া যায়নি। অম্লান বদনে সব দেখে যাওয়া, সব সয়ে যাওয়া ছাড়া তো আর কোন উপায় ছিলোনা। থানা হাজতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই পড়ে গেলাম মেঝেতে। তখন ওখানে মুক্তি বাহিনীর ধৃত ছেলেদের সংখ্যাই ছিলো বেশী। ওদের পায়ের পিষ্টনে পিষে যেতে লাগলাম। কিন্তু কোন টুশব্দও নেই। মুখে কাতরাণীও ছিলো না একটুও। মৃত লাশের মত স্পন্দনহীন অসাড় দেহে শুধু পড়েই রইলাম। নামাজের কথা মনে হলেও আদায় করতে পারিনি। এইদিন আছর থেকে পরের দিন ফজর পর্যন্ত কোন নামাজ পড়তে পারি নি। একেতো নড়াচাড়া করতে পারি না-তদুপরি রুমটিতে তিল ধারনেরও স্থান ছিলোনা। এ অবস্থায়ই সরকারী অনুমোদনকৃত অত্যাচারের প্রথম দিন-ও রাতের অবসান ঘটলো।

পরের দিন-২৪শে ডিসেম্বর-অনুমান ৮টার দিকে ধরে ধরে আবার নিয়ে গেলো আমায় ইন্টেরোগেশনের জন্যে। চা-নাস্তা খাবার জন্যে আজও চেষ্টা করা হলো। খেলাম না কিছুই। খেতে ইচ্ছেই হলোনা। যাদের কাছে পাবো অমানুষিক নির্যাতন তাদের কাছ থেকে কোন দয়া পেতে মন সাড়া দিলো না।

www.pathagar.com

আজও চললো ওই একই ধরনের ইন্টেরোগেশন ও নির্যাতন দুইই। ইন্টেরোগেশনে নতুনত্ব কিছু না থাকলেও নির্যাতনে অভিনবত্ব ছিলো বেশ। সয়ে গেলাম সবই খোদার জন্যে। তাঁরই দিকে ছিলো ধ্যান-মন সম্পূর্ণরূপে।

এ দিনও রাতে নিয়ে এলো রমনা থানায়। আমার প্রিয় সাথী কম্বল আমার সাথেই আছে শেষ সম্বল হিসেবে। হাইকোর্টের নূরা পাগলা ও তার সাথীদের মতো পেঁচিয়ে রাখি গায়ের সাথে। যেন কোন তান্ত্রিক সাধক। অবশ্য তারা আমার মতো এত দুর্বল ছিলোনা। আজ পাবনার বেলাল, আনিস ও ছোট দুটো ভাইকে এখানে এসে পাই। দুজনই শীতে থর থর করে কাঁপছে। ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ইসলামী ভাবাপন্ন-এই তাদের অপরাধ। পূর্বে তাদের সাথে কোন পরিচয় না থাকলেও তারা কিভাবে আমাকে চিনে আস্তে আস্তে আমার দুপাশে দু'জন এসে কম্বলের নীচে ঢুকলো। নিজের চরম দুরবস্থার মধ্যেও তাদেরকে নিষেধ করতে পারলাম না বটে, তবে বলে দিলাম-"আমার শরীরের সাথে লেগোনা।" তখন আমার শরীর থেকে বেশ দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিলো। আনিস এসব ঝড়-ঝঞ্জার হাত থেকে বেঁচে জেলে এসে থাকলেও এ জেলেই তাকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। ভিন্ন অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করবো।

২৫শে ডিসেম্বর যথারীতি নেয়া হলো মালিবাগ ইন্টেরোগেশন সেন্টারে। আমার নির্দিষ্ট কক্ষে চৌকির উপর পড়ে রইলাম কম্বল পেঁচিয়ে। এদিন আর কোন ব্যথা নেই কোন বিশেষ জায়গায় সব একাকার। যেদিকে যে অবস্থায় থাকি-পড়েই থাকি। বাম পাঁজর আর ডান পাঁজর বলতে আজ আর কিছু নেই।

এমন সময় কানের কাছে ফিস ফিস শব্দ হলো। চোখ মেলে তাকালাম। একজন প্রহরাতঃ সান্ত্রী-হাতে রাইফেল একটু নুইয়ে আমাকে বলছে-"দোয়ায়ে ইউনুছ পড়ুন।" ইশারায় তাকে জানিয়ে দিলাম-"তাই পড়ছি। ওটাই তো আমার নিঃসঙ্গ দুস্থ জীবনের অবলম্বন।"

এ দিনকার একজন সিভিল পোষাক পরিহিত লোকের আন্তরিক অনুরোধের কথা আজও মনে জাগে। দু'টু ভাত খাবার জন্যে তার কি-ই-না আপ্রাণ চেষ্টা। এদের দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের জন্য যখন এদের কোন খাবার স্পর্শ করছিলাম না, তখন পরমাত্মীয়ের মতো তার কি-ই-না অনুরোধ। নিম্নস্বরে তার কথাগুলো আজও আমি শুনতে পাই। সে বলছে-"খালেক ভাই! কি খাবেন বলেন। আমি নিয়ে আসি। না খেয়ে মরে গিয়ে লাভ কি? যা হয় হবে। এখন কিছু খেয়ে জীবনটা রক্ষা করুণ। এমন ঘোর দুর্দিনে, সজ্জনহীন মৃত্যুর প্রহরগুলা এই নির্দয় পরিবেশে, শ্রদ্ধা ও অন্তর নিংড়ানো তার উচ্চারিত 'খালেক ভই' শব্দটি শুনে চোখের কোণে পানি জমে উঠলো। অশ্রুসজল নয়নে চোখ মেলে তার দিকে তাকালাম-পরম তৃপ্তির দৃষ্টি দিয়ে। দরদমাখা এমন মিষ্টি সম্বোধনটি কার?

চোখ নেড়ে মাথা কাত করে সম্মতি জানালাম-"নিয়ে এসো, তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার জন্য আর সম্ভব নয়। তোমার আব্দার অবহেলা করতে পারবো না।" খেলাম দু'টি ভাত-শুইয়ে শুইয়ে চামচ হাতে। জানিয়ে দিলাম পলক নেড়ে-"তোমার এ হৃদ্যতা

www.pathagar.com

ভুলার নয়। তোমার আন্তরিকতা মোছবার নয়।" কিন্তু তার পরিচয় অজ্ঞাতই রয়ে গেলো। জীবনে হয়তো তাকে খুঁজে পাবোনা কোনদিন।

আজও ইন্টেরোগেশনের নিয়মিত পালার জন্যে শংকিত মনে অপেক্ষা করছি। কিন্তু সে সময় আসছেনা, নীত হচ্ছেনা সে কসাইখানায়। মাঝে মাঝে জুতার কড়মড় শব্দ আমার দিকে ভেসে আসতে শুনতে পাই। কিছু সময় নীরব থাকার পর আবার সে শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবারও শব্দ শুনি। এসব শব্দ শুনে সে সব দিনে মাঝে মাঝে মনে হতো বুঝি আপনজনের কেউ আমার খোঁজে আসছেন শব্দ মিলে যাবার পর চোখ খুলে সান্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতাম কে আসছিল? সে বলতো–"সাহেব।" অর্থাৎ মাঝে মাঝে ইন্টেরোগেশনের নায়কেরা আমাকে দেখে যেতো নিশ্চুপে।

বিকালের দিকে ডাক পড়লো ইন্টেরোগেশন বা টর্চারিং সেন্টারে। আজ ভূমিকাহীনভাবে খুব এডামেন্ট হয়ে শুরু করেছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন এলোপাথাড়ীভাবে। একই প্রশ্ন বার বার। আমি আজ আর কোন জবাব দেইনা। ফলশ্রুতি কিছু না পাওয়াতে সন্ধ্যার পর পরই চালালো তারা নির্যাতনের নিত্য–নতুন ধারা। হাত পায়ের অঙ্গুলগুলো ফুলে উঠেছে।

যখন আমি নির্যাতনের এ অমানুষিক শিকার, এমন সময় আনুমাকি রাত সাতটার দিকে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মিষ্টার এ. খালেক ভিতরে প্রবেশ করলেন। সাথে আছে আরো কয়জন লোক। ইন্টেরোগেশনের রাজ আসনে এবার বসলেন তিনি। গায়ের একমাত্র সার্টটিকে নীচের দিকে একটু টেনে জোড় আসনে আমি বসা Is he Mr. Khaleq? দিয়েই শুরু করলেন তিনি। ভদ্রলোক অপলক নেত্রে চেয়ে আছেন আমার দিকে। আমি তখন লজ্জাবনত।

–কেন এমন কর্মটা আপনারা করতে গেলেন এ সময়ে মিষ্টার খালেক। দেশ যখন স্বাধীনতার উষা লগ্নে তখন দেশের এমন এসেটগুলোকে? মেরে ফেলাটা কি আপনাদের বর্বরতা বলে প্রমাণ হয়নি?

আমিঃ–চুপ

ইন্সঃ জেঃ–শহিদুল্লাহ কায়সার সহ এসব বুদ্ধিজীবিরা আপনাদের কি ক্ষতি করেছিলো? তাদেরকে কেন মেরে ফেললেন?

আমিঃ–ও সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা।

ইন্সঃ জেঃ–শহিদুল্লাহ কায়সার কেতো আপনিই নিয়েছেন।

আমিঃ–তাকে আমি আমার জীবনেও কোন দিন চোখেও দেখিনি।

ইন্সঃ জেঃ–একথা বললে তো হবে না। দুনিয়া জেনে গেছে একাজ আপনার কমান্ডে হয়েছে।

www.pathagar.com

আমিঃ-ওসব সম্পূর্ণই মিথ্যা প্রপাগান্ডা। জামায়াতে ইসলামী ঢাকা সিটির অফিস সেক্রেটারী হিসাবে আমার প্রায় তিন বছরের জীবনে অফিস কক্ষের বাইরে আমার কোন কার্যক্রম ছিলো না।

ইন্সঃ জেঃ-আলবদর ক্যাম্প ছিলো কোথায়?

আমিঃ-আমার জানা নেই।

ইন্সঃ জেঃ-ওখানে যেতেন না?

আমিঃ-কখনো না?

ইন্সঃ জেঃ-তাহলে বুদ্ধিজীবিদের হত্যা সম্পর্কে আপনি কি কিছুই জানেন না?

আমিঃ-মাটেই না।

ইন্সঃ জেঃ-আর্মিরা আপনাদেরকে টাকা পয়সা দিতোনা?

আমিঃ-আমি জানিনা।

এ ধরনের কিছু টুকিটাকি প্রশ্ন করার পর আই, জি সাহেব অন্যান্য অফিসারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,-"জামায়াতে ইসলামী এরূপ মিলিট্যান্ট পার্টি হয়ে গেলো কবে? শহীদুল্লাহ কায়সারের মতো একজন লেখক কমই হয়ে থাকে। তার লেখা একটা বই আমিও পড়েছি। চমৎকার লেখা। অথচ এ ধরনের লোকগুলোকে এত নির্মমভাবে মেরে ফেলা হলো। ভাগ্য ভালো যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। তা'না হলে এদেশের একটি বুদ্ধিজীবিও বেঁচে থাকতো না। তাদের টারগেটকৃত আরো বহু লোকই বাকী রয়ে গিয়েছিলো। এভাবে নানা জনের নানা মন্তব্যের পর আই, জি সাহেব খানিক্ষণ চুপ করে রইলেন।

এবার অস্পষ্ট স্বরে ইন্টেরোগেশন টিমের নায়ক আবুল কাশেম আই জি, সাহেবকে কানে কানে কি জানি বললেন। উত্তরে তিনি বললেন-'What could be done? He is not implicating himself in the case. However interogate him gradually. দেখুন কিছু বের করতে পারেন কিনা। Government is very interested regarding him. But don't torture him more. His appearnce indicates on his simplicity and sincerity.

আই, জি সাহেব চলে গেলেন। আমি নীত হলাম আমার নিশি যাপনের স্থান রমনা থানায়। কিভাবে যাই আমি বুঝতেই পারছিনা। দু'জন সিপাহী ধরে উঠায় গাড়ীতে আবার থানায় আসলেও নামায় দু'জনে ধরে।

আমার এ করুন অবস্থার মধ্যে দিয়ে আজ যখন আশীতি পর বৃদ্ধের মত কুঁজো হয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে কম্পিত ও নড়বড় দেহে রমনা থানার হাজতে প্রবেশ করি। তখন হাজতের এক কোণের দৃশ্যে আমি আঁতকে উঠি। ময়মনসিংহের প্রাণাধিক ছোট ভাই কামরুজ্জামান ওই কোণে বসে মিহিসুরে বসে কালামে পাক তলাওয়াত করছে। তার গায়ে শুধু একটি পেঞ্জি। এ ছিলো ডিসেম্বর মাসের প্রকোপ শীতের রাত্রি। ওই সময়ের বেদনা বিধুর অবস্থায়

www.pathagar.com

তার কণ্ঠ নিঃসৃত পাক কালামের ধ্বনি আজও বাজছে আমার কর্ণকুহরে। তার সাথে ছিলো চাঁদপুরের ছোট ভাই আবদুল মতিন। তৎকালীন বিরাজিত অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে রমনা থানায় চোখাচোখি দিয়েই মনের ভাব আদান প্রদান করেছি। কেউ কারুর সাথে কথা বলা সমীচীন মনে করিনি।

সে সময়ে আমি তো মুহূর্ত সময়ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। তবুও এরই মধ্যে তার দেহেও প্রচুর আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাই। এভাবে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি রাতে এস, বি, অফিস হতে ফিরে এসে রমনায় তার সাথে মৌন দেখা হতো। উনত্রিশ তারিখে গিয়ে আর এই ছোট ভাইটিকে রমনা থানায় দেখতে পাইনি। তার সাথে কোন কথোপকথন না হলেও ওদিন তাকে ওখানে না দেখে অনিশ্চিত আশংকায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠি। কিছুদিন পর পুলিশ কাষ্টোডি হতে আমি পুনর্বার জেলে গেলে সেখানে তার সাথে দ্বিতীয়বার দেখা হয়। তখন জেলে সে কদম জমিয়ে নিয়েছে।

২৬শে ডিসেম্বরও যথারীতি আমাকে আনা হলো এস, বি অফিসে। এদিন আমার অবস্থা বেশ অবনতির দিকে যাচ্ছে বলে আমাকে নেয়া হচ্ছিল না ইন্টেরোগেশন রুমে। এদিনই এক সময়ে কয়েকটি পায়ের জুতার খট্‌খট্ আওয়াজ একসাথে আমার দিকে আসতে শুনতে পাই। নিসাড় দেহে যন্ত্রণা কাতর অবস্থায় চোখ বন্ধ করে পড়ে আছি আমি। আমার কাছে এসেই সব পায়ের শব্দ একসাথে থেমে গেলো। একজনকে বলতে শুনি–"এখানেই এসেছে কাহীল অবস্থায়। তাছাড়া খাওয়া দাওয়া করছে না।" অনক্ষণ পর আমার প্রিয় সাথী কম্বল টেনে খোলা হচ্ছে বলে আমি চোখ মেলে তাকাই। ষ্টেথিসকোপ কাঁধে একব্যক্তি আমার উপর নুইয়ে পড়ে কম্বল টানছে। চোখ খুললেই ডাক্তার সুলভ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন– "কেমন লাগছে? কি অসুবিধা? যেন আমার হাউজ ফিজিসিয়ান। ষ্টেথিসকোপ দিয়ে আমার বুক পিঠ পরীক্ষা করে দেখলেন। অতঃপর পালস দেখার পর বললেন–"বেশ জখমী হয়েছে। ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেহে। আবার জ্বরও আছে। জোর করে হলেও খাওয়াতে চেষ্টা করুন। এ টেবলেট গুলোও সেবন করান।" ঔষধ খাওয়াতে চেষ্টা করলেও ঘৃণায় আমি খেতে পারলাম না।

সন্ধ্যা বেলা ইন্টেরোগেশন রুমে আনা হলো। আজ নায়ক প্রবরের চেয়ারে একজন নতুন ভদ্রলোক। বেশ লম্বা। পরে জানতে পেরেছি উনি D. S. P. SB আমাকে একখানা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন–"আপনার ভয় নেই। এখন কোন মেলিটারী সরকার নেই যে সন্দেহ হলেই কোন লোককে ধরে এনে মেরে ফেলবে। এখন একটা গণতান্ত্রিক জনপ্রিয় সরকার ক্ষমতায় আছে। দোষী বলে সন্দেহ হলে অনুসন্ধান চালাবে। আদালতে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ন্যায় বিচারের জন্য পাঠানো হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেবে। দোষী প্রমাণিত হলে দোষ অনুযায়ী শাস্তি হবে। অন্যথা বেকসুর খালাস পাবে। নির্দোষ হলে আপনিও খালাস পাবেন। অতঃপর নির্দিধায় আপনি আপনার কথাগুলো বলে যান। আগের সে ইন্সপেক্টর আবুল কাশেম পাশেই আছে।

www.pathagar.com

আমিঃ-আমার যা বলার ছিলো বলে দিয়েছি। এত অত্যাচারের মুখে এর বাইরে কিছু জানা থাকলে অবশ্যই বলতাম।

ইন্সঃ কাশেম-ও কিছুনা স্যার। ওতে কিছু পাওয়া যায়না।

ডি, এস, পিঃ-ও গুলো লিখে নিয়েছেন

ইন্সঃ কাশেম-প্রত্যেক দিনেরই পৃথক পৃথক লিখা আছে।

ডি, এস, পিঃ-(আমাকে উদ্দেশ্য করে) একটা কাজ করুন আপনি নিজেই একটি স্টেটমেন্ট নিজ হাতে লিখে দিন।

আমি-লিখাতো আমাকে দিয়ে সম্ভব হবে না। আমি কলম ধরতে পারবো না।

ডি, এস, পিঃ-ওহ হো! (আমার হাতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে) ঠিক আছে যা পারেন আস্তে আস্তে লিখে দিন।

সংক্ষিপ্ত আকারে সেড় পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে আমার জীবনতিহাসের দু'একটা কথা লিখে দিলাম।

পরের দিন ২৭শে ডিসেম্বর। এদিন এন্টেরোগেশন সেন্টারে গিয়ে দেখি ডি, এস, পিটি ছাড়া গোটা ইন্টেরোগেশন টিমটিই পরিবর্তিত। সব নতুন নতুন মুখ। বেশ মাইল্ড টেম্পারে কথাবার্তা বলছে। এদের কেউ কেউ আবার কিছু কিছু আরবীও জানে। আরবীর দু'একটা প্রবাদ বাক্যও আমাকে শুনালো। ইন্টেরোগেশনের প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করার পর এক পর্যায়ে এদের একজন আমাকে বললো, মাওলানা সাহেব,-"হোব্বোল ওয়াতনে মিনাল ইমান" কি আপনাদের জানা ছিলো না? হীনকায় অবস্থায়ও মৃদু হাসলাম। বললাম 'ওয়াতন ও হোব্বোন শব্দের সংগাতেই তো আমরা ভুল করছি। আর হোব্বোল ওয়াতন জানা ছিলো বলেই তো আমরা একটা সার্বভৌম রাষ্ট্রের পক্ষে ছিলাম। কোন বিদেশী শক্তি এদেশের উপর কর্তৃত্ব করুক এটা আমরা চাইনি।

এটীমের একজন ইন্সপেটর বেশ চালাক বলে মনে হলো-তিনি ঝট করে বলে উঠলেন-আমরা জানতাম এখনো জানি-দেশ স্বাধীন হবার পর হিন্দুরা আমাদের মাথায় উঠবে। যদি স্বাধীন না হতে পারতাম তাহলে পাঞ্জাবীদের জুতার দলনে দলিত মথিত হয় যেতাম। এ অবস্থায় প্রথমটিই আমাদের জন্য মন্দের ভালো।

৫ই জানুয়ারী এস, বি অফিস থেকে রমনা থানায় নিয়ে আসা হয় রাত অনুমান নয়টার দিকে। আধামরা বিহারীর লাশ, নির্যাতিত মানুষে ভরা রমনা থানার গারদ। গারদের ওয়ালে পিঠ ঠেকায়ে কুজো হয়ে বসে আছি। লোক আসা যাওয়ার দৃশ্য দেখছি। রাত ১০টার দিকে একজন লোক এসে খুব আন্তরিকতার সাথে আমার পরিচয় ও আমার সাথে কথা বলতে চাইলো। আমি বুঝতে পেরেছি আন্দোলনের লোক। কিন্তু আমার সাথে কথা বলা যে তার বিপদের কারণ হতে পারে-এ কথাটা কাতর কণ্ঠে তাকে ইঙ্গিতে বলে দিলাম। "আমার সাথে বেশী কথা বলবেন না। আমার ভাগ্যে যা ছিলো তা ঘটেছে। এর সাথে যেনো আর

www.pathagar.com

কেউ জড়িয়ে না পড়ে"। এটাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। পরের দিন এস.বি অফিস থেকেই আমাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ওখানে আবার তার সাথে দেখা। তিনি হলেন আজকের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন জামায়াত নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। তখন কিন্তু তাঁকে মাওলানা বলে বুঝতে পারিনি। কারণ যে বন্ধুরা তাকে গ্রেফতার করেছে তারা তাঁর মূল পরিধেয় বস্ত্র রেখে দিয়ে একটি টোটা ফাটা লুঙ্গি ও কেরোলীনের একটি শার্ট এক জোড়া ছেড়া চপ্পল পরিয়ে দিয়েছিলো।

আমি আর কিছু বলতে পারলামনা, পারলেও হয়তো বলতামনা। এ ভদ্রলোকটি আমাকে খুলনার প্রফেসার মুসলিম সাহেব সম্বন্ধেও জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই বলে আমি এড়িয়ে গেলাম।

এই ভাবেই '৭২ এর ৬ই জানুয়ারীর অনুমান ১২টা পর্যন্ত এস, বি-র সেই কসাইখানায় দিনে, রমনার থানা হাজতে রাতে একখানা কম্বলকে সম্বল করে অতিবাহিত করতে হয়েছে আমাকে আমার জীবনের স্মরণীয় ১৬টি দিন। এ দিন গুলিতে অনেক অজানা অচেনা মুখও কতনা আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করেছে যা ভুলবার নয়। এমন কি তথাকথিত মুক্তি বাহিনীর বহু ছেলেও সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে দ্বিধা করেনি।

এ সময়ে কত লোক দিয়ে আপন বলে জানতাম এমন দু' একজন লোককে কিছু প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে দেবার জন্যে সংবাদ দিয়েছি। দুর্ভাগ্য, তাদের কারুর দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেনি। তাদের কাছে খবর পৌঁছতো। এ খবরও আমি পেতাম।

এখানে রমনা থানায় এক বন্ধুর সহৃদয় ও নিঃস্বার্থ সেবার কথা আজীবন ভাস্বর হয়ে তাকবে আমার মনে। এ বন্ধুটির সাহায্য অলৌকিকভাবে আমাকে হঠাৎ করে ট্রাইবুনালে পেশ করার দিনও পেয়েছিলাম। সে দিনেও তার আন্তরিক আগ্রহ আপ্যায়নের কথা, আমার আত্মীয় স্বজনকে খবর দেওয়ার উদ্বিগ্নতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। রমনা থানায় নিজ লোক দিয়ে ভালো ভালো বিস্কুট খরিদ করে আমার মাথা ধরে ধরে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে আমাকে খাওয়াতো। অতীব দুঃখ, তার নাম ঠিকানা আজ আর আমার মনে নেই।

৬ই জানুয়ারী জহির রায়হানসহ কোতয়ালীর এস, আই, আবদুল বারী এস, বি অফিসে অনুমান ১১টায় দিকে আমার কছে আমার গ্রেফতার হবার তারিখ জিজ্ঞেস করে। তখন থেকেই বোধ হয় আমার বিরুদ্ধে বানোয়াট মামলা তৈরীর প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়। এই এস, আইটি আমার মামলার এফ, আই, আর নেয় কোতয়ালী থানায়।

এদিনই অনুমান ১টার দিকে রমনার হাজত আর এস, বি র ইন্টেরোগেশন রুম ত্যাগ করে প্রিয় সাথী ছেঁড়া কম্বলটিকে শেষ বিদায় জানালাম।

কারাগারে দ্বিতীয়বার

পনরদিনের পুলিশী নির্যাতনের পর ফিরে এলাম লৌহ কারার ওই রাজপুরীতে, যার জন্যে উতলা হয়ে থাকতো মন ওই দিনগুলোতে। পুলিশের অনাহুত, অবাঞ্ছিত ও যুক্তিবিহীন

www.pathagar.com

কথাবার্তার কর্কষ ও নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর থেকে কারাগারে থাকাটাই ছিলো আমার কাছে অধিক প্রিয় ও আকর্ষনীয়। তাই এখানে আসার পর হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বিগত ১৬ দিন থেকে গোসল নেই। খাওয়া-দাওয়া নেই। মাথার চুল বিন্যস্ত নেই। শেভ হওয়া নেই। কাজেই চেহারা সুরতের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যতসব অত্যাচার ও নির্যাতন চলেছিলো একটি মাত্র হাওয়াই সার্ট ও প্যান্টের উপর দিয়ে। প্যান্টটা কালো রঙ্গের হওয়াতে এতসব অত্যাচার বরদাশত করে কিছুটা অবিকৃত চেহারায় থাকতে পারলেও সাদা সার্টটা তা থাকতে পারেনি। শরীরের রক্তের কিছুভাগ ব্লটিং করে নিতে হয়েছিলো সাদা জামাটিকে। এর উপর আবার মাটিতে এতদিনের গড়াগড়ি খেয়ে নিজের মূল রং হারিয়ে এক নতুন রং ধারণ করেছিলো। এ অবস্থা দেখে দ্বিতীয়বার জেল গেটে আসার পর একজন ডেপুটি জেইলার মন্তব্য করেছিলো,-"চেহারা খানা'তো বেশ হয়েছে।" নীরবে কথাটা শুনা ছাড়াতো আর কোন উপায় ছিলোনা। শরীর আর চেহারার অবস্থা যা-ই থাকুক মনটা তো ছিলো বেশ তাজা।

এ অবস্থায়ই গেটে প্রথম চেকিং এর পর ভিতরে প্রবেশ করলাম ওই আকর্ষনীয় রাজপথ ধরে। আজ আমার সাথে ছিলো আরো দু'জন মেহমান। আমাদের সকলকেই প্রথম দিনের সেই প্রশস্ত বারান্দার বড় টেবিলটির কাছে এনে উপস্থিত করলো একজন কারারক্ষী। এখানেও আবার চেকিং হলো। এরপর আমদানীতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তখন আমদানীর লোকজন জমা হতো ৪ খাতায় এখানে কত বড় এক এরিয়া জুড়ে মানুষ ইতস্ততঃ বিচরণ করছে দেখে মনটা খুশীতে ভরে উঠলো।

এ সময় এখানে মহাখালীর ত্যাগী কর্মি তোরাব আলী সহ কয়েকজন কর্মী ভাইকে দেখতে পেলাম। নালার মত বেশ লম্বা হাউজের পাড়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কেউ আছে বসে। আমাকে দেখেই অশ্রু বিগলিত নেত্রে এসে জড়িয়ে ধরলো তারা। এত দুর্দশার পরও দু'একজন কর্মী ভাইকে দেখতে পেয়ে সান্ত্বনা ও দুঃখ দুটাই পেলাম। তখনো বাঁকা হয়ে হয়ে হাঁটি। আমার দুরবস্থা দেখে প্রত্যেকেই বেদনাহত। নিরিবিলি কথাবার্তা শোনার জন্যে নিয়ে গেলো বিরাট এক কক্ষে। বড় বড় জানালা সারিবাধা মানুষের সিট। এক এক জনের তিন-চারটি করে কম্বল। এ কয়দিনের তুলনায় আমার কাছে মনে হলো এ একটা স্বর্গীয় উদ্যান। কত কষ্ট পেয়েছি ওখানে শীতবস্ত্রের অভাবে-তা কি বলে প্রকাশ করবো।

আমার আপনজন ও রমনার পনর দিনের কোন কোন সাথী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়েই আছি এমন সময়ে একজন কারারক্ষী গিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে এলো ওই বড় টেবিলের পাশে। জেলের ভাষায় এটাকে বলা হয় কেস টেবিল। সাধারণ ব্যবহার কেসটোফাইল। জেলের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে সব আসয়-বিষয় এখানে পেশ করা হয়। কোন অপরাধ ন্যায় অন্যায় হলে এখানেই নালিশ দায়ের হয়। আবার এখান থেকেই সব হুকুমনামা বা ফয়সালা জারী করা হয়। এ আদালতের সর্বোচ্চ বিচারক হলেন ডি, আই, জি অব প্রিজন।

www.pathagar.com

আমাকে ফেরৎ নিয়ে আসার কারণ কিছুই বোধগম্য হলোনা। এমন দুঃসময়ে আপনজনদের পেয়ে, ছেড়ে আসার দুঃসহ ব্যথা বুকে লয়ে ফিরে এসে দাঁড়ালাম এখানে। জোহরের নামাজের প্রায় শেস সময় তখন। এ সময় ঠিক কেস টেবিলের উত্তরে কিছু দূরে নালার মত লম্বা সেই হাউজের পাড়ে সুঠামদেহী সুন্দর চেহারার একটি যুবককে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। তাকে সগোত্রিয় মনে করে নামাজ পড়ার অনুমতি নিয়ে তার কাছে গেলাম। ওজু বানিয়ে তার থেকে টুপী নিয়ে নামাজ আদায় করলাম। যুবকটির সাথে আলাপ হলো। এখানকার কিছু নিয়ম কানুন তার জানা আছে বলে মনে হলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমাকে ওখানে দিয়ে আবার ফেরৎ নিয়ে আসার কি কারণ। আমাকে সাধারণ প্রিজনারদের সাথে থাকতে না দিয়ে কোন সেলের নির্জন কক্ষে রাখা হবে বলে তার ধারণা হলো। তার অনুমানই ঠিক হয়েছে। আমার ভাগ্যে সে ব্যবস্থাই নির্ধারিত ছিলো। পুলিশের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার থেকে সাময়িকভাবে অব্যহতি পেয়ে নিজকে হালকা হালকা বোধ করছিলাম। সেজন্যই বোধ হয় বেশ ক্ষুধা অনুভব করলাম। যুবকটিকে জানালে সে উত্তরে বললো–"এখন তো দুপুরের খাবার শেষ। তবে বিকালের খাবার সময়ও হয়ে আসছে।" এই যুবকটির নাম মহিউদ্দিন বাড়ী বরিশাল। পরে অনেক পরে সে শুটি বসন্তে কারাজীবনেই মহাখালী বসন্ত হাসপাতালে মারা গেছে। ইন্নালিল্লাহে.....।

কেস টেবিল থেকে ডাক পড়লো আমার। যুবকটির সাথে মন উজাড় করে আর কথা বলতে পারলামনা। "আসো"–বলে লয়ে চললো আমাকে এক কারারক্ষী। চললাম তার পেছনে পেছনে। পথ চলতে চলতে তাকেও ওখান থেকে আমাকে নিয়ে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু সে নিরুত্তর। নিয়ে এলো আমাকে এক সেলে। সেখানে কিছু লোকজনও আছে। দু' একজন চেনা চেনা বলেও মনে হলো। কিন্তু কারো সাথেই কোন কথা বলা গেলোনা। একটি অপরিষ্কার ছোট কক্ষে ঢুকিয়ে দিয়ে লক্আপ করে দেয়া হলো।

এ সেলটি ৮ কক্ষ বিশিষ্ট বলে এর নাম আট সেল। ফাঁসি কাষ্টের সংলগ্ন এবং সব ফাঁসির আসামীকে এখানে রাখা হয় বলে এ সেলকে কনডেম সেলও বলা হয়। আমাকে যে কক্ষটিতে রাখা হলো তার সামনেও ঝুলানো রয়েছে ছোট দুইটি সাইন বোর্ড একটির গায়ে লিখা CONDEMNED CELL আরেকটির গায়ে লিখা SEGRIGATION সেদিন শব্দার্থ বুঝে থাকলেও এর ব্যবহারিক অর্থ কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। লোকে লোকারন্য জায়গা থেকে এখানে নির্জন কক্ষে নিয়ে আসার প্রকৃত কারণ বুঝতে আর দেরী হলোনা।

বিকালে খাবার এলে তা নেবার জন্যে আমার সেলটিও খোলা হয় কয়েক মিনিটের জন্যে। বেরিয়েই দেখি শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা মাসুম সাহেব ও ফরিদাবাদ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা বজলুর রহমান সাহেবকে। তারা নিজেদের খাবার নিচ্ছেন।তাঁদের দু'জনকে পেয়ে খুশী হলাম। কথা বলার জন্যে একটু এগিয়ে গেলে মাসুম সাহেব চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন–এখন কথা বলা ঠিক হবেনা। আমাকে দেখে, আমার দূরবস্থা দেখে তার দু'চোখ বেয়ে যেন পানি নিংড়ে পড়ছে। তারা দু'জনই এক রুমে থাকতেন। খাবার নিয়ে চলে গেলেন তাদের রুমে।

www.pathagar.com

বাইরের আর যারা ছিলেন, তারা সব এক এক থানার ও,সি। সুত্রাপুরের সি, আই আবুদল হালিম সাহেব, কোতয়ালী থানার ও,সি, কায়কোবাদ, রমনা থানার ও,সি, খুরশীদ আলম, লালবাগ থানার ও,সি খুরশীদজাহ, কালীগঞ্জের ও,সি ইউছুফ চৌধুরী, মোহাম্মদপুরের ও,সি ইসহাক, জয়বেদপুরের ও,সি মোজাফফর আহমদ। কোতয়ালীর ও,সি কায়কোবাদের সাথে আগে থেকেই পরিচয় ছিলো। তিনি আমাকে দেখেই চিনে ফেললেন এবং বললেন, "কাগজে দেখেছি আজ পেয়েও গেলাম। তবে অবস্থাটা এমন কেন? মুখে কোন রা'না করে দুঃখের মুচকী হাসি দিয়েই তার জবাব দিলাম।

সে সময় আমার শরীরের অবস্থা এমন ছিলো যে ভাতের প্লেটটি পর্যন্ত হাতে করে রুমে যেতে পারছি না। হাতের ফুলা ফুলা আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওগুলো নড়াচড়া বা একত্র করতে পারছি না। ঠিকমত উঠতে বসতে পারছি না। পেট ও পাঁজরের জন্যে প্রশ্রাব পায়খানায় বসতে পারছিনা। চামড়াগুলো পঁচে বিগবিগ করছে। পা হাত গুলোও ফুলে রয়েছে। মনে হচ্ছিল পঁচে পঁচে সব গলে যাবে। এ শরীর আর ঠিক হবে, এ হাত পা আর পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবে, এ আঙ্গুল দিয়ে কলম ধরে আর লিখতে পারবো–এমন আশা তো করিনি।

তিন চার মিনিটের মধ্যে আমাকে পুনরায় সেলে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা বন্ধ করে দেয়া হলো। সন্ধ্যার কিছু আগে আগে এক সময় তিনখানা কম্বল একটি থালা ও একটি বাটি দিয়ে গেলো দরজার লৌহ শলাকার ভিতর দিয়ে ঠেলে ঠেলে একজন সিপাহী। শীতের পূর্ণমৌসুম। পনর–ষোল দিনের শীতের অপরিসীম কষ্ট পেয়ে আজ তিনটি কম্বলকে কত বড় সম্বল বলে মনে হলো, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারুর পক্ষে আঁচ করা সম্ভব নয়।

সন্ধ্যায় চকের সেই অতি পরিচিত মসজিদ সহ চারিদিকের সকল মসজিদগুলোতে গগনবিদারী মাগরিবের নামাজের আজানের ধ্বনি হৃদয়ের শোনিত ধারায় স্রোতের মত বইতে লাগলো। সুমধুর আজন ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো প্রতি শিরায় উপশিরায়। কারার এই লৌহ কপাট তো আমাকে ঘিরে রাখতে পারলো কিন্তু খোদার দিকে মানুষকে ডাকার উদাত্ত আহ্বান–সুমধুর আযান ধ্বনি তো কক্ষের এ লৌহ কপাট কেনো পাষান করার সুউচ্চ প্রাচীরও ফিরিয়ে রাখতে পারলো না। এ ধ্বনি যে মিশে গেছে প্রতি তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে। অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে তখন আবৃত করলাম–

–"কে মোরে শুনালো ওই আযানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর
আকুল করিল প্রান নাচিল ধমনী
কে মোরে শুনালো ওই আযানের ধ্বনি।"

যতটুকু সম্ভব লৌহ শলাকার ফাঁকা দরজা দিয়ে প্রবেশ করা কুয়াশার হাত থেকে বাঁচার জন্যে একপাশে সরে একখানা কম্বল পেতে চাদর ছাড়াই বিছানা পাড়লাম। একখানা কম্বল বালিশ হিসাবে মাথার নীচে দেবার জন্যে ভাঁজ করে রেখে তৃতীয় খানা গায়ে দিয়ে ওখানেই

www.pathagar.com

মাগরেবের নামাজ আদায় করলাম। এ সব কাজ সমাধা করছি খুব কষ্ট করে। প্রথমবারের কারার নিশিবাস থেকে আজ যেন অনেকটা নিশ্চিত হতে পারলাম। যা-ই হোক তবু যেন বাস করার মতো একটু জায়গা পাওয়া গেলো। নামাজের শেষে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। এত কান্না জীবনে আর কাঁদিনি। বাঁধভাঙ্গা নদীর পানি যেন গড়িয়ে পড়তে লাগলো গন্ড বেয়ে নীচের দিকে। চোখের কোথায় জমা ছিল এত পানি! খোদাকে কায়মনো বাক্যে ডাকায় এত সান্ত্বনা, এত তৃপ্তি, এত সুধা আর কখনো পাইনি। নিজের ভাগ্যের জন্য কাঁদিনি। কেঁদেছি জাতির ভাগ্যের জন্যে। তাদের ভুল নির্বাচনের জন্যে। নিজেদের ভুলত্রুটির জন্যে।

মোনাজাতেই মনে হলো শ্রদ্ধেয় প্রিয় নেতাদের কথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কথা। জীবন-চলার-পথের সাথীদের কথা। আত্মত্যাগী ছোট ভাইদের কথা। নিজের অদৃষ্টে যা ঘটার ঘটেছে। কিন্তু তাদের অমঙ্গল আশংকায় মন কেঁপে উঠতো। সে সব দিনে তাদের কথা মনে উঠলেই অশ্রুর নির্ঝরনীর ধারা বইতে শুরু করতো দু'চোখ বেয়ে। দোয়া করতাম মনের পঞ্চদুয়ার খুলে তাঁদেরই জন্যে বেশী।

পুলিশের ইন্টেরোগেশন টীমের এক ইন্সপেক্টর শ্রদ্ধের এক প্রিয় নেতাকে একটি কটুক্তি করাতে সহ্য করতে না পেরে কেঁদে ফেলেছিলাম। সে কথা আজও মোনাজাতে মনে হলো। এ ভ্রমান্ধদের হেদায়েতের জন্যে, তাদের ভুল ভাঙ্গাবার জন্যে আল্লাহর কাছে বিনীত নিবেদন জানালাম।

মনে আছে সে সময়ই উদয় হয়েছিলো-প্রত্যয় জন্মেছিলো হৃদয়ের কোণে, জাতির এ ভুল ভাঙ্গবে। তাই শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দের দেশে ফিরার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবার জন্যও আল্লাহর দরবারে কাকুতি জানিয়েছিলাম। আমাদেরকে, দেশবাসীকে, দেশের মুসলিম জনতাকে আশ্রয়হীন করে, সহায়-সম্বলহীন করে বিদেশ-বিভূঁইয়ে তারাও যে মর্মাবিদারী বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন তা কজলোকে দেখতে পেতাম।

এ সময় আমার শ্রদ্ধেয় পিতার কথাও মনে হয়েছিলো ১৯৬৭ সনে মা'কে হারাবার পর তিনিই ছিলেন আমাদের আশ্রয়স্থল। সন্তানদের মধ্যে আমার উপর বোধ হয় তার আস্থা ছিলো একটু বেশী। আমাদের এ ত্যাগের মহিমা তো তিনি হয়তো বুঝতে পারবেন না। তাঁর মনের প্রবোধের জন্যও দোয়া করলাম। ভবিষ্যতের অমঙ্গল আশংকায় আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর-শ্বাশুড়ি সহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা সরকারী চাকুরী ছেড়ে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এঁদের কাছেই এহেন ঘোর বিপদের দিনে আমার স্ত্রী ও সন্তানরা আশ্রয় নিয়েছে। এরাও হয়তো আমার এ ভাগ্য-বিপর্যয়ের সঠিক মূল্যায়ন করতে সমর্থ হবেন না। তাঁদের মনোবল বৃদ্ধির জন্যও খোদার কাছে আকুল আবেদন জানালাম। অবশ্য আমাদের আন্দোলনের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন ছিলো।

আমার স্ত্রী. সন্তানদের কথা মনে উঠলেও তাদের জন্য দুশ্চিন্তার উদ্রেক হতো না। আমার বড় কন্যা-আদরের দুলালী আঁখিমনি আমার দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজের স্মৃতি-সত্ত্বেও তাদের জন্য ভাবতাম না। তার বয়স তখন সাড়ে পাঁচ বছর। তাকে তখন আমি সূরা পড়াতাম--ক, খ, পড়াতাম অথচ তাদেরকে বাড়ীর পথে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত এগিয়ে

www.pathagar.com

দিয়ে আসার পর তাদের কোন খোঁজ খবর জানতাম না। আমার স্ত্রী আমার সাথে দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘ নয় বৎসরে ইসলামী আন্দোলনকে বুঝে নিয়েছিলো বলে আমার ধারনা। শেষ বিদায়ের কালে তাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্ভূত অবস্থায় আমাদের সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথারও আভাস দিয়েছিলাম। এমন কিছু ঘটে গেলে ভবিষ্যত জীবনের কিছু কর্মপন্থাও তাকে বলে দিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস আমার জীবনের এ পরিণতিকে আমার স্ত্রী সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছিলো। কারণ ন্যায়ের পক্ষে, আদর্শের পক্ষে থাকার অপরাধে সশ্রম কারাদন্ড প্রাপ্ত হবার চার মাস পর আমর এক নিকটাত্মীয়ের নিকট আমার স্ত্রীর ধৈর্য্যের প্রশংসা শুনেছি। তার মনোবল নাকি অটুট। আমার সহোদর বোনদেরকে সে-ই নাকি সান্তনা যোগাতো। আমাদের নির্দোষ, ন্যায়পরায়ণতা ও আদর্শের কথা বলে বলে তাদেরকে আল্লাহর উপর ভরসা করার ও তাঁর কাছে মনের সব আবেদন নিবেদন করার জন্যে উপদেশ দিতো। এ সংবাদ নিঃসন্দেহে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছে।

একই বৈঠকে এশার নামাজ আদায় করে কম্বল জড়িয়ে শুইযে পড়লাম। ক্ষত-বিক্ষত দেহে কম্বলের ছোঁয়াচে জ্বালাতন অনুভব হতে লাগলো। দুর্গন্ধও ভেসে আসছে শরীর থেকে। তবুও কেন জানি মনটা বেশ হালকা লাগছে। শুইয়ে শুইয়ে একটু শব্দ করে কালামে পাক থেকে মুখস্থ জায়গাগুলো তিলাওয়াত করতে লাগলাম। এ ভাবেই আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন সকালে সকলের সেল খোলা হলো। কিন্তু আমারটা খোলা হলোনা। আমি তখন একবারেই নতুন-আর এ হলো আমার জন্যে এক অভিনব জগত। অনুমান চার হাত প্রস্থ ও ছয় হাত দৈর্ঘ্য একটি ছোট কক্ষে থাকা খাওয়া আবার পায়খানা প্রশ্রাবও কিভাবে করবো, নামাজ আদায় করার পর বসে বসে তাই ভাবছি। ঢাকা সিটি সহ আশে পাশের বেশ কয়জন ও,সি প্রথম সাক্ষাতের পর আমার সাথে এক শব্দ কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না।

ওদের মধ্যে একজন ডানপিঠে সুঠামদেহী মুক্তি যোদ্ধা যুবক ছিলো। নাম জামিল। কুমিল্লা শহরে বাড়ী। সে সকলের চোখ এড়িয়ে কোন ফাঁকে আমার সেলের সামনে এসে দরজার শলাকা ধরে দাঁড়ালো। তার দিকে অপরিচিতের করুন দৃষ্টি হানলে সে জিজ্ঞেস করলো-"রাতে কুরআন শরীফ পড়েছে কে?" সতর্কতা অবলম্বন করে সঠিক উত্তর না দিয়ে আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম-কেন কি হয়েছে? বললো না, এমনিতেই জিজ্ঞেস করছি। আমার সেলে এক জিলদ কোরান শরীফ পড়ে আছে। মেঝেতেই পড়ে আছে ওটা। উপরে তুলে রাখার কোন ব্যবস্থা নাই। তাই আমার ভয় লাগে। আপনি পড়তে পারলে ডিউটিরত সিপাহীকে বলে আপনাকে দিয়ে দেবো। কুরআন শরীফ শুনে কাল রাতে আমার বড় ভাল লাগছিলো।" এবার আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম-"ভালইতো হতো কিন্তু কোরান শরীফ দিতে আবার জিজ্ঞেস করতে হবে কেন?"-"না, জিজ্ঞেস করেই দেবো। নতুবা পাছে আবার কোন ঝামেলায় ফেলে দেয় তা কে জানে। আপনার উপর খুব কড়াকড়ি নির্দেশ বলে মনে হয়"-বলেই সে দৌড়িয়ে চলে গেলো।

এক দালানেই বাস করি সবাই। কিন্তু ট্রাজেডি এই যে আমি কারুর মুখ দেখিনা। কথাবার্তার শব্দ শুনি বটে কথককে দেখিনা। প্রত্যেক জমাদার ডিউটিতে এসেই তার অধিনস্ত সিপাহীকে-যে এ ৮ সেলের পাহারায় আছে আমার সেলের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলে

www.pathagar.com

যায়-"২৪ ঘন্টা লক আপ, খাওয়া-দাওয়া গোসল পায়খানা, প্রশ্রাব সবই ভিতরে।" আবার এ সিপাহীটিও তার পরবর্তী সিপাহীকে জমাদারের এ হুকুমনামা শুনিয়ে দিয়ে যায়। এমন করেই দিনরাত কাটতো আমার।

পরেরদিন সকালেও সে যুবকটি আবার সিপাহীর দৃষ্টি এড়িয়ে কোন ফাঁকে এসে দাঁড়ালো আমার সেলের সামনে বড় হন্তদন্ত হয়ে।-বলতে লাগলো, "মাওলানা সাব। জানিনা কার কাছে পরিচয় পেয়েছে। কাল'তো সিপাহী আপনাকে কুরআন শরীফ দিতে দিলোনা। বললো জমাদারকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কিন্তু পরে জানলাম জমাদার, সুবেদার বা কেউ জেলের হুকুম ছাড়া দিতে পারবে না।" ভাবলাম, হায়রে মুসলমানের দেশ! মুসলিম দেশের একজন নাগরিক। কুরআন শরীফ পড়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এখনই পবিত্র কালামুল্লাহ পড়াতো দূরের কথা পড়ার হুকুম চেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। ভবিষ্যতে এ দেশের মুসলমানের ভাগ্যে কি লিখা আছে?

এভাবেই অতিবাহিত হয়ে চলছে দিন। শরীরের চামড়াগুলো আস্তে আস্তে শুকিয়ে-খসে খসে পড়ছে, হাতের আঙ্গুলগুলো তখনো সে অবস্থায়ই, পা ও হাতের কাটার ক্ষত গুলোও টান ধরেছে। মুক্তির ক্যাম্পে হাতে পায়ে শক্ত বাঁধ দেওয়ার ফলে কেটে গিয়েছিলো। ডাক্তারখানায় যাবার জন্যে, ঔষধ পত্র নেবার জন্যে এ সময়ে সকলেই অনুরোধ জানাতো। প্রয়োজনে অনেকেই ডাক্তারখানায় যেতো কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে হতো না। এ সময়ে ও,সি সাহেবদের অনুরোধ উপরোধে ডিউটিরত সিপাহীদের কেউ কেউ সেল খুলে আমাকে কিছু কিছু সময় বাইরে একটু হাঁটা-চলার সুযোগ দিতো। অবশ্য তখন আবার তারা উল্টো ডিউটি দিতো কর্তৃপক্ষের কেউ এসে পড়ে কিনা তা দেখতে। মেডিকেলে যাওয়ার আমার অনিচ্ছা দেখে জয়দেবপুরের ও,সি মোজাফফর সাহেব, (নিজেও আহত ছিলেন) তার ব্যবহারের জন্যে আনা 'তারফিন তৈল' নিজেই আমার হাতে পায়ের আঙ্গুলে ও অন্যান্য আহত স্থানে লাগিয়ে দিতেন। এখন কিছুটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি। একটি টেবলেটও এদের খাইনি।

সিপাহীদের বদান্যতায় গোসল ও নামাজের জন্যে এখন কিছু কিছু সময় সেলের বাইরে কাটাবার সুযোগ পাই। অবশ্য জমাদার, সুবেদারের নজর এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে হয়। এ সময়েই মাওলানা মাসুম সাহেবকে বলে প্রায় সব কয়জন ও,সি সহ জোহর ও আছরের নামাজ জামায়াতের সাথে বাইরে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। মাওলানার ইমামতিতে নামাজ পড়তে কত ভাল লাগতো। চক মসজিদের আযানধ্বনি ছিলো আমাদের সময় নির্দেশক ঘন্টা। জোহরের নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়ার পর প্রায় সকলে বিশ্রাম করতো। আমি সেলবন্দী থাকতাম। আছরের আযান ধ্বনি শুনার পর সিপাহীকে নামাজের কথা বলে আমাকে বাইর করা হতো। সে সময় নামাজ পড়ে বিকালের খাবার আসা পর্যন্ত, যেদিন সুযোগ পেতাম বাইরে বসে বসে সকলের সাথে খতমে ইউনুস পড়তাম। আছরের নামাজের পর মাওলানা মাসুমের ললিতস্বরের মিনতিভরা মোনাজাত, তাঁর স্বভাবজাত ছন্দের সুন্দর ভঙ্গির আকুল আবেদন, আল্লাহর আরশকে যেন কাঁপিয়ে তুলতো। ও,সি,-রা সহ

www.pathagar.com

সকলের চোখ বেয়ে যেন বরফ গলে পানি ঝরতো। এ ঘোর দুর্দিনে তাঁর কাকুতি-মিনতিভরা মোনাজাতের জন্যে আমরা আছরের সময়ের অপেক্ষা করতাম।

এ সময়ে আস্তে আস্তে আমাদের সাথে আরো দু' একজন নতুন নতুন মেহমান এসে যোগ হতে লাগলো। পুলিসের ডি, এস, পি আনোয়ার হোসের সাহেব ও ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ডিপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাফিজুল্লাহ সাহেব আওয়ামীলীগের এম, পি, কুলিয়ার চরের এস, বি, জামান সাহেবও আমাদের সাথে এসে মিলিত হলেন। তাঁদের সকলের অমায়িক ব্যবহারের কথা ভুলতে পারছিনা। আমি ছাড়া ওসব দিনে আর সকলের সাথেই দেখা সাক্ষাৎ করার জন্যে বাইরে থেকে লোকজন আসতো। কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, ফল-পাকড়া প্রায়ই আসতো। তাদের অনেকেই আমার সেলের সামনে এসে দরজার লোহার শলাকার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে নানা খাওয়া-দাওয়া ও ফল-ফ্রুটস দিয়ে যেতেন। আমি গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হলে বা লজ্জানুভব করলে তাঁরা হেসে হেসে বলতেন,- "সংকোচ করবেন না সাহেব। আবার যখন আপনার আসবে আমাদেরকে দেবেন। আমরা গ্রহণ করতে দ্বিধা করবোনা। তখন আরো বেশী লজ্জিত হয়ে পড়তাম। আমার মন বলতো-কেউ আমাকে দেখতে আসব না।-আমি কাউকে আপ্যায়িতও করতে পারবো না। তাদেরই একজনের সাবান মেখেই সে সময় একদিন দীর্ঘ সতর আঠার দিন পর প্রথম গোসল করি। আসলরূপ হারিয়ে ফেলা জামাটিকে কিছু মেজে-ঘসে স্বরূপে আনতে চেষ্টা করি।

দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের ইন্টেরোগেশন

উনিশ-'শ বায়াত্তরের ৬ই জানুয়ারী দ্বিতীয়বার জেলে ফিরে আসার পর হতে শরীরের দুঃসহ অবস্থার ক্রম উন্নতি ঘটতে চলছে। সময়গুলো অতিবাহিত হয়ে চলছে ছক কাটা নিয়মে। মাগরেবের নামাজ সমাপনান্তে একই বৈঠকে এশার নামাজ আদায় করতাম। এ সময়ে আল্লাহকে বেশী বেশী করে ডাকার সুযোগ ছিলো তাই করতাম। তৃপ্তি এবং শান্তি ও পাওয়া যেতো বেশ।

১৩ই জানুয়ারী এমনি ছক কাটা নিয়মে মাগরেবের নামাজের পর বসে আছি জায়নামাজে। জায়নামাজ বলতে বিছানার কম্বল এছাড়া তো আর কিছু ছিলনা। তখনো এশার নামাজ আদায় করিনি। চক-মসজিদের আযান ধ্বনির জন্যে অপেক্ষায় আছি। হঠাৎ পেছনের দিক থেকে কয়েকজন লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঢুকে পড়লো তারা আমার সেলে। খট খট করে তালা খুলতে খুলতে বলতে লাগলো একজন,- "অ্যা আসুন, আপনি বেরিয়ে আসুন।" হতচকিত হয়ে পেছনের দিকে তাকালাম। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সাধারনতঃ এ সময়ে সেল খোলা হয় না।-"কি হলো, আসুন না।" নিরস, কর্কষ শব্দ ঝনঝনিয়ে উঠলো সুবেদারের কণ্ঠ হতে। গায়ে মোড়া কম্বলটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কনকনে শীত, রাত তখন অনুমান সাড়ে সাতটার কাছাকাছি। অজ্ঞাত আশংকায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো মন। হাড়ভাঙ্গা শীতের

www.pathagar.com

কাঁপুনিতে সামনে যেন পা এগোচ্ছিল না। আবার গর্জন বেরুলো-"কি হলো-আসুন না বেরিয়ে।" এত সব ধমকের সুর হলেও আমাকেও যেন তারা ভয় পায়।- "আল্লাহ তুমিই জামিন, তুমি ভরসা" ধীর কদমে বেরিয়ে এলাম সেল থেকে। তখনো কুঁজো হয়েই হাঁটতে হতো প্রায় কচ্ছপ-গতিতে। হাত-পা ও আঙ্গুল গুলো তখনো ফুলাই আছে। এক পা রেখে তার উপর ভারসাম্য রেখে আর এক পা উঠাতে হতো। এ অবস্থায় সেলের সিড়ি বেয়ে নীচে নেমেই দেখি আমার যাওয়ার পথের পাশে বেশ দূরে দূরে সান্ত্রী দাঁড়ানো। আট সেল হতে ছোট ছোট রাস্তা দিয়ে রাজপথে পড়েই দেখি একজন ডেপুটি জেলার দাঁড়ানো। আমার চলার গতি বেশ মন্থর। সুবেদারের উদ্দেশ্যে গর্জে উঠে বললো-"কি এত দেরি কেন?" আমরা দিকে লক্ষ্য করে বললো, Quick March, বললে তো আর হবেনা। আমি হাঁটছি আমারই গতিতে। দু'মিনিটের পথ বোধ হয় বেশ কয়েক মিনিটে অতিক্রম করে জেলের গেটে গিয়ে পৌঁছলাম।

শীতের এমন রাতের এ সময় জেল অফিস বেশ সরগরম হয়ে আছে। জেলারের রুমের সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে সুবেদার গেলো ভিতরে। ক্ষণিক পরে ফিরে এসেই বললো "সেন্ডেল খুলুন।" অবাক হলাম। আবার কোন শাহানশাহের দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমকে সেন্ডেল খুলতে হবে কেনো। তখনো জেলার কি পদার্থ তাঁর আবার অফিস আছে এসব কিছুই জানতাম না। হুকুমের অন্যথা সেসব দিনে কল্পনা করাও ছিলো অসম্ভব। এমনিতেই শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছি এ উপর আবার খালি পা। বরফ ঠান্ডা মেঝে পা রাখতে হবে। তবুও খুলে নিলাম সেন্ডেল।

সুবেদারকে অনুসরণ করে জেলারের রুমে প্রবেশ করলাম। স্প্রিং এর একটি সুন্দর মুন্ডি চেয়ারে টেবিলের এক পাশে। খাকী ইউনিফরমে নিটোলদেহী একজন পুরুষ। তার তিন পাশ ঘিরে বসে আছেন আট দশজন লোক। হাতে কাগজ কলম। একজনের কাছে একটি মুন্ডি ক্যামেরা। পরিবশটা আমার কাজে ভীতিপ্রদ বলে মনে হলো। সালাম ওদেরকে দেওয়া সমীচীন বলে মনে করলাম না। এক পাশে দাঁড়ালাম। জেলারের ঠিক বিপরীত দিকেই আর একজন স্যুটধারী ভূড়িওয়ালা মোটা লোক বসা। দেখলেই মনে হবে রহস্য উদঘাটন টিমের নায়কের ভূমিকায় অবিনয় করার জন্যই এহেন অসময়ে তার পদার্পন ঘটেছে। এ সময় সুবেদার বেরিয়ে গিয়ে হাঁকাহাঁকি করছে ওদেরকে এনেছো? আখতার ফারুক এসেছে? একথাগুলো শুনেই আমি এ অসময়ে এখানে আনার কারণ বুঝে ফেললাম। এস, বি, র ইন্টেরোগেশনে আর কোন কাজ হলোনা তাই ধরেছে এবার ভিন্ন পথ। এতদিন যেন বোরাকের আরোহী ছিলাম। বোরাকের যেখানে যাত্রা শেষ,ব্যবস্থা হয়েছে আবার নতুন বাহনের, সে হলো রফরফ-সাংবাদিকের ইন্টোরোগেশন।

মোটা লোকটি তার বিরাট বপু ঘুরিয়ে ফিরলেন আমার দিকে। আমি শীতে কাঁপছি তখন। আমার এ কম্পন তাদের কাছে ভীতির কম্পন বলে অনুমিত হওয়াও অসম্ভব ছিলো না। তাদের পরস্পর কথোপকোথনের মাধ্যমেই বুঝলাম ইনি টেলিভিশনের এক হোমরা-চোমরা। পুলিশের ইন্টেরোগেশন সহ সব ইন্টেরোগেশনই ছিলো একই ধরনের। আজ দু'বছর পর যা মনে আছে তাই সন্নিবেশিত করছি এখানে।

www.pathagar.com

টি, ভি, প্রতিনিধিঃ এই কিলিংগুলো আপনারা কেন করলেন? এরাকি এদেশের লোক ছিলো না? এদেশের জন্য কি আপনাদের মায়া নেই?

আমিঃ আমরা কোন লোক মারি নাই।

টি.ভি.প্রঃ তবে কে মারলো?

আমিঃ তা জানি না?

টি,ভি,ঃ আলবদর বাহিনীকে আপনারা টাকা পয়সা দিতেন না?

আমিঃ আমি জানি না।

টি.ভি.প্রঃ সারেন্ডারের আগেও তো আপনারা আলবদর বাহিনীকে টাকা পয়সা দিয়েছেন।

আমিঃ আমি বলতে পারি না।

টি.ভি.প্রঃ আপনি পুলিশের কাছে স্বীকর করেছেন।

আমিঃ ঠিক কথা নয়। নিয়ে থাকলে ছাত্র সংঘের ছেলেরা নিয়েছে।

১৬ তারিখে কেউ কেউ কিছু টাকা নিয়েছিলো। ভাউচার ছিলো অফিসে তাই আমি একথা বলতে পেরেছি।

ইতিমধ্যে মীরপুরের কিছু বিহারী অশিক্ষিত ছেলেকে আনা হলো রুমে। এখন ওদের দিকে মনোযোগী হলেন টি, ভি প্রতিনিধি সাহেব। তাদেরকে যেরূপ শিখিয়ে দেয়া হয় তারা ঐরূপই বলে। এক পর্যায়ে তারা প্রতিনিধি ব্যক্তিটির এক প্রশ্নের জবাবে বললো হ্যাঁ মুসলিম লীগ আমাদেরকে মানুষ মারার জন্যে টাকা পয়সা দিতো। তখনই এ সাথে জামায়াতের নামও আনার জন্য তিনি বলে দিলেন– জামাতে ইসলামীও দিয়েছে। ছেলেটি তখন বলে গেলো হ্যাঁ জামায়াতে ইসলামীও দিয়েছে।

এবার টিমের একজন সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

সাংবাদিকঃ মাইক্রোবাসটি আপনার বাসার কাছেই এসেছিলো, না ওটা চৌরাস্তার মোড়েই রেখে চৌধুরী মঈনুদ্দীন এসে আপনাকে নিয়ে গেছে।

আমিঃ কথাটা বুঝে উঠতে পারিনি।

সাংঃ ও, বুঝে উঠতে পারেননি? আচ্ছা রাতে আপনি চোখে দেখেন?

আমিঃ দেখি।

সাংঃ চৌধুরী মঈনুদ্দীনকে চিনেন?

আমিঃ চিনি।

সাংঃ সে কি করতো?

আমিঃ সাংবাদিকতা করতো।

www.pathagar.com

সাংঃ পড়তো না?

আমিঃ আমি জানি না।

সাংঃ সে কি করতো? জামায়াত না সংঘ।

আমিঃ জামায়াত।

সাংঃ বুদ্ধিজীবি হত্যার অপারেশন ইনচার্জ কি সেই ছিলো না?

আমিঃ আমি জানি না

সাংঃ আপনি আমাকে কোথাও দেখেছেন?

আমিঃ দেখেছি বলেতো মনে হয় না।

সাংঃ আমি আপনাকে দেখেছি।

আমিঃ আপনি বললে অবিশ্বাসের কি আছে?

সাংঃ আমি তো আগে সংঘ করতাম। সংঘের অফিসে যেতাম ওখানে আপনাকে দেখেছি।

আমিঃ হতে পারে।

এ সময় টীমের আর এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন–

সাংঃ ছাত্রজীবনে আপনি কোন দল করতেন?

আমিঃ ছাত্রজীবনে লেখাপড়াই করেছি। কোন দল করার সুযোগ পাইনি।

সাংঃ সমর্থনও করতেন না কোন দলকে?

আমিঃ সমর্থন করেছি ছাত্র সংঘকে।

সাংঃ আপনি সংঘের রোকন ছিলেন না?

আমিঃ না।

সাংঃ আপনাকে হাওয়া থেকে এনে জামায়াতে ইসলামীর অফিস সেক্রেটারী করেছে না!

আমিঃ চুপ।

সাংঃ বাংলাদেশে আপনাদের রোকন সংখ্যা কত?

আমিঃ আমি জানি না।

সাংঃ আপনাকে কে বানিয়েছে অফিস সেক্রেটারী?

এবার মোটা হিরোটি আমার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ সব হিন্দু মেরে ফেলাটাই বুঝি আপনাদের পরিকল্পনা ছিলো না? ওই সব হিন্দু ধরেই মেরে ফেলতেন। এই সময় জেলার

www.pathagar.com

সাহেবের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখালেন তিনি। তখনো আমি জানতাম না যে, জেলার সাহেব একজন হিন্দু বাবু।

এরপর ক্যামেরাম্যান আমাকে এক পাশে দাঁড় করিয়ে ফ্লাস ভাল্ব জ্বালিয়ে আমার কয়েকটা স্লেপ নিয়ে নিলেন। তাদের পর্ব শেষ করে আমাকে বিদায় দিলেন। আমি বেরিয়ে এসেই দেখি আখতার ফারুক সাহেব বাইরে একটি লাইনে আরো কয়েকজন লোকের মধ্যে বসে আছেন। তাকেও ইন্টোরোগেশনের জন্যে আনা হয়েছে বলে আমার ধারণা হলো।

আমি চলে এলাম আমার সেল কক্ষে। পরেরদিন ভোরে মাওলানা মাসুম সাহেব আমাকে এসে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন ভাই তুমি ফিরে এসেছো? আমরা মনে করেছিলাম বুঝি তোমাকে আবার নির্যাতনের জন্যে নিয়ে গেছে। আমি আর মাওলানা বজলুর রহমান সাহেব তোমার জন্যে চিন্তা করতে করতে রাতে ঘুমোতে পারিনি। এ কয়দিনে একটু শক্ত হয়ে উঠেছিলে। সারা রাত তোমার জন্যে দোয়া করেছি।

আমার রাতের দাস্তান তাঁদেরকে শুনালাম।

রাশিয়ান সাংবাদিকদের ইন্টেরোগেশন

১৩ জানুয়ারীর পর ইন্টেরোগেশনের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। গ্রেফতার হওয়ার পর এতদিন পর্যন্ত ইন্টেরোগেশনের পালাই শেষ হলো না। আর ইন্টেরোগেশনও তো সবই একই প্রকৃতির। আর ভালো লাগছিল না। আর সহ্য হচ্ছিলো না এ সব মুখের অত্যাচার। তাদের কোন কোন অবান্তর ও অযৌক্তিক কথাবার্তায় বেশামাল হয়ে পড়তাম। কিন্তু তৎকালীন বিরাজিত অস্বাভাবিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এতটা বেশামাল হয়েও বা উপায় ছিল কি? এমনিতেই মহামূল্যবান মানুষেরর নেই জীবনের এক পয়সা মূল্য। সেখানে আমার প্রতি তাদের সৌজন্যতা বোধ তো ধারণাও করতে পারি না। কাজেই এতটা বেশামাল হয়ে যেন না পড়ি সেদিকেও লক্ষ্য রাখতাম। অনেক রাগ মনের মধ্যেই চেপে রাখতাম। এসব অনাহুত কথাবার্তা ও অবান্তর প্রশ্নবানের হাত থেকে বাঁচার জন্য ইন্টেরোগেশনের অত্যাচার হতে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আল্লাহর কাছে আরাধনা জানালাম–জেলে যে অবস্থাই রাখো রাজী আছি খোদা। জালিমদের শানিত মুখের মিথ্যা বাক্যবান থেকে আমাকে এবার মুক্তি দাও খোদা! কিন্তু আমার এ দোয়া তখনো খোদার দরবারে মঞ্জুর হয় নি। কবুল করেননি তিনি আমার আবেদন।

১৭ জানুয়ারী বেলা একটার দিকে অনাবিল মনে আরো দু'একজন সাথীসহ খাবার খাচ্ছিলাম। জোহরের নামাজ তখনো আদায় করিনি। এমন সময় আমার ডাক পড়লো। একজন সিপাহী বললো–"আপনার অফিস কল।" কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেউ বলছেন দেখার জন্যে লোক এসেছে। আবার কেউ বলছে ইন্টেরোগেশন হবে। এভাবে নানা জল্পনা কল্পনার আশা–নিরাশা ছায়া বুকে করে জোহরের নামাজ সেরে রওয়ানা হলাম ধীরে ধীরে অফিসের দিকে।

www.pathagar.com

প্রথমে আমাকে নিয়ে গেলো ডেপুটি জেলারদের রুমে। আমাকে দেখেই একজন ডেপুটি জেলার আসন হতে উঠলো। আমাকে তার অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিয়ে চললো জেলারের রুমের দিকে। চললাম তাকে অনুসরণ করে- সেদিনের সে শাহানশাহের রুমের দিকে। রুমটি একই অবস্থায় সজ্জিত। শুধু প্রভেদ এই সেদিন ছিলো রাত আজ হলো দিন। সেদিন ছিলো কতক দেশী মেটো রঙের মানুষ। আজ তার সাথে মিশেছে কিছু শ্বেতাঙ্গ ধরনের চেহারা। যেন ভ্যারাইটি শো। জেলকর্তা সে মূর্তি চেয়ারে বসেই চারদিকে হর্ষোৎফুল্লভাবে তাকাচ্ছেন।

আমার প্রবেশের সাথে সাথেই শরীরে একটা মনোরমভঙ্গী করে বললেন কর্তাটি The culprit has come এক সাথে সকলেই আমার দিকে মনোযোগী হলেন। আজকার টীমের নায়ক কে হবেন তা আমার অনুমান হয়ে গেলো। তাই আমারও পূর্ণ দৃষ্টি আমি তারই দিকে নিবদ্ধ করলাম। বড় তাচ্ছিল্যের মনোভাব প্রকাশ করে জেলারের দিকে একবারও তাকালাম না। তা ছাড়া টীমের নায়কটিকেও আমার ভালো লেগেছিলো। একহারা গড়নের সুন্দর চেহারা। দেখতে বেশ শান্ত-শিষ্ট ও ভদ্র লোক বলেই মনে হলো। অবশ্য আমার ধারণা ঠিকই হলো। আমার মুখ নিঃসৃত কথা হতে আমার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রতিই যেন লক্ষ্য ছিল তার বেশী। তার প্রথম প্রশ্নটি ছিল বড় নাটকীয় ভঙ্গীতে ঃ

Q. Are you Mr. Abdul Khaleque Majumder.

A. Yes.

Q. What was your connection with Pak Occupation Army?

A. I had no connection with them at any level.

Q. To what party did you belong?

A. Jamaat-e-Islami

Q. Why did you join Jamaat-elslami not Awami League.

A. Every citizen has got democratic right to join any party according to his free choice.

Q. What of Jamaat-e-Islami Attracted you?

A. The ideology of Jamaat-e-Islami attracted me.

Q. What were the ideology of Jamaat-e-Islami

A. Islam.

Q. Is killing men the ideology of Islam?

A. No.

Q. Then what?

www.pathagar.com

A. Silence.

Q. Are you a member of Jamaat-e-Islami?

(A little sound from his side-they cal Rukon.)

A, yes!

Q. What's the meaning of Rukan?

A. Member.

Q. Had you seen dead bodies in the street of Dacca city on the day of the operation of Pak Army?

A. No.

Q. No! Were you in Dacca at that time?

A. Yes, I was in Dacca. But I did not go out fearing the situation.

Q. What's your qualification?

A. I am graduate and passed the diploma in library science from the university of Dacca, and also passed the Kamil Examination.

Q. What's Kamil?

A. Top most class of Madrashah education.

Q. Where from you were graduated?

A. From the Jagannath college; Dacca.

Q. What were the combination in your degree class?

A. Political Science, Sociology and Arabic.

Q. Why did you take Arabic as one of your combinations?

A. It is my favourite subject and I had knowledge of it from the Madrashah life.

Q. Had you gone to jagannath college after if was made a camp of Al Badar

A. No.

www.pathagar.com

Q. Why? That is your college where from you obtained your degree?

A. Who does go in a college after complition of his education?

Q. Well, Mr. A. K. Mazumder what was your rank in Al Badar Bahini

A. I had no connection with Al Badar . I was marely the office secy. of Jamaat-e-Islami Dacca City.

Q. Absured! Office Secretary of Jamaat-e-Islami had no connection with Al Badar! It can't be. Well, by whom it was organised?

A. I can't say.

Q. Mr. Khaleq mazumder you are concealing the fact?

A. As an Office Secretary of Jamaat-e-Islami my duties were fixed within the office room. I had no part with the policy matter of the party. (Slow suond raised form one side, the party is very cautious as regards it's policy matters.)

Q. Than by whom the plan of Al Badar was chalked out, when it is admitted fact that the member of Al Badar belonged to yours student party?

A. I can't say that your version is correct. But so far I kanow Army was the supream authority of each and every programme. There was no place of any political leader of any party in making any plan and programme during the last nine months.

Q. How could you say so?

A. I heard it on various occasions from the leaders their table takls.

Q. What was your enamity with late Shahidullah Kaiser and others intellectuals?

A. Nothing.

Q. Would you please tell the actual fact of Mr. Kaisar.

www.pathagar.com

A. I have never seen him in my life.

Q. Would you be able to say it keeping in your hand ow the Holy Quran?

A. Yes, Hundred times, thousand times.

Q. Do you know Islami Chhatra Sanghs boys?

A. Some leaders are known to me.

Q. As?

A. Mr. Matiur Rahman Nezami, Nurul Islam, Showkat Imran etc.

Q. Could you think what would be your's position on this Soil?

A. God knows better.

Q. What do you think; will you be saved, out side, if you are be released?

A. surely.

Q. Well, Mr. Khaleq Mazumder would you fly for Pakistan if the Government of Bangladesh would be pleased to buy a ticket for you?

A. No.

Q. Why?

A. As this is my native land.

Q. No. You are not right. you have consealed the whole of scene (slow sound raised from his side-he needs severe punishment).

A. You did not fail to do sot.

আমার সর্বশেষ উত্তরের পর সাংবাদিক সাহেব জেলারকে লক্ষ্য করে বললেন- "Well Mr. Roy-thank you for your kind co-operation. I am sorry for giving trouble to you all untimely." রায় মহাশয় উত্তরে বললেন ঃ It does not matter, Have you got anything from him?-Yes, there are some contradictions. দিয়েই রাশিয়ান সাংবাদিক সাহেব শেষ উত্তর দিলেন।

www.pathagar.com

সুবেদার সাহেব ইনাকে নিয়ে যান। চারটার দিকে পৌঁছলাম আমার নির্দিষ্ট বাসস্থানে। সাথীরা ঘিরে ধরলেন ঘটনা শোনার জন্যে। অগত্যা বিদেশী সাংবাদিকের সাথে আমার সাক্ষাৎকার তাদেরে শুনালাম।

আসরের নামাজের পর আবর খোদার সকাশে আরজ করলাম! খোদা এদের এ অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাও। জেল তো খাটছিই। এর পর আবার এতসব আপদ কেন? এরপরও একবার C. I. D ইন্টেরোগেশনে যেতে হয়েছে। বায়ান্তরের মার্চের পর এ আপদের সম্মুখীন আর হতে হয়নি।

স্থানান্তরিত করণ

২১শে জানুয়ারী সকালে নাস্তা করার পর হঠাৎ জমাদার সুবেদার এসে আমাকে ফাঁসি-মঞ্চ সংলগ্ন সেলে স্থানান্তরিত করলো। কিছুক্ষণ পরেই সব সেল গুলি খালি করে মাওলানা মাসুম সাহেব সহ সকল বন্দীদেরকে এখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেললো। কয়েকদিনে গড়ে উঠা একটা পরস্পর সহানুভূতিশীল পরিবেশ হঠাৎ ভেঙে চুরমার করে দিলো। উৎকণ্ঠার ছাপ মুখে চোখে লয়ে এক এক করে অশ্রু সজল নয়নে মৌন সমবেদনা জানিয়ে বিদায় হলো সকলে। এই দূর্যোগে, জীবনের এই প্রথম ঘোর বিপদের দিনে যে লোকগুলোকে একান্ত আপন হিসাবে পেয়েছিলাম হঠাৎ তাদের সকলের একত্রে চলে যাবার বিয়োগ ব্যাথায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। সর্বশেষ মাসুম সাহেবকে নিয়ে যাবার সময় অশ্রু সম্বরণ করে রাখা সম্ভব হলো না। যে দরজাটি খুলেই ফাঁসিমঞ্চে চড়ানো হয় সেটি ধরেই আমি তাদের পদসঞ্চালনের দিকে তাকিয়ে আছি। -নয়নের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিগলিত অশ্রুজল। ফরিয়াদ বেরুলো মুখ দিয়ে ফার্সি একটি শ্লোক দিয়ে-

অবশ্য এই দিনই কিছু সময় পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফরিদপুরের ওয়াহিদুজ্জামান সাহেবের ছোট ভাই ফাহেকুজ্জামান এম.এম.এ. আমার নতুন সাথী হলেন। তিনি পঙ্গু হলেও তাঁকে পেয়ে মনটা কিছু হালকা হয়ে উঠলো। তাঁকে দেয়া হলো ৮নং সেলে আর আমাকে দেয়া হলো ১নং সেলে। ফাঁসি কাষ্ঠের সংলগ্ন সেল বলে এখানে রাতে সিপাহীরাও নাকি পাহারা দিতে ভয় পায়। এখানকার অনেক ভীতিপ্রদ ঘটনা ইতিপূর্বে কিছু কিছু শুনেছি সে ভয় আমাকে নিঝুম নীরব রাতেও পায়নি। সাথীহারা ব্যথা বুকে নিয়েই ছটফট করে কাটিয়েছি সারাটি রাত।

পরের দিন ২২শে জানুয়ারী নোয়াখালীর এডভোকেট আনোয়ার হোসেন সাহেব এ মুসাফির খানায় এসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিলো না।

www.pathagar.com

কোন নতুন লোক এলে পরিচয় পর্ব সমাধা করার জন্যে এখানে বাইরের মত কোন মিডিয়া বা ফরমালিটির প্রয়োজন হতো না। পরিচয় করিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠতো সকলে। আনোয়ার সাহেব সেলে প্রবেশ করার সময় সৌভাগ্যবশতঃ আমি ছিলাম বাইরে। কাজেই পরিচয় পর্ব শেষ করে আমরা মুহূর্তের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। দুজন দু'জনকেই অন্তর দিয়ে, সুহৃদ্যতা দিয়ে আপন জনের মমত্ববোধ দিয়ে দেখতে লাগলাম। দু'জন দু'জনকেই সান্তনা, সমবেদনা জানালাম। অনেকদিন পর, অনেক দুর্ভোগ পোহাবার পর জীবন পথের সহযাত্রী, একই আদর্শে বিশ্বাসী পরমাত্মীয় এ ভাইটিকে পেয়ে যেন সাত রাজার ধন পেলাম। মনের অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ করার সাথী পেলাম। সেলের ভিতর আটক থাকার কড়াকড়ি প্রথম কিছুদিন তার উপর থাকলেও কয়েকদিন পর সে অসুবিধা দূর হয়ে গিয়েছিলো। যদিও আমার ব্যাপারে তা হয়নি। তিলাওয়াতে কালামে পাকই ছিলো আমাদের প্রধান কাজ। ফেব্রুয়ারীর দিকে যখন বন্দীদের সংখ্যা বার তের হাজারে পরিণত হলো তখন সে সুঠামদেহী যুবকজালিমকে আমাদের সাথেএকই সেলে থাকতে দেয়া হলো। এদিনগুলোতে দুঃখের সুখের বেদনা বিধুর আলোচনা দু'চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়ে দিতো। ভিন্নভাবে এ সম্পর্কের আলোকপাত করতে চেষ্টা করবো।

ঈদুল আজহা

সম্ভবতঃ ২৮শে জানুয়ারী ছিলো ঈদুল আযহার দিন। এ নতুন জীবনে নতুন জগতের প্রথম ঈদ। ঈদ হবে শুনছি। বন্দীদেরকে, সেলের লোককে বিশেষ করে কনডেমড সেলের বন্দীদেরকে ঈদের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা কিছুই জানি না। একটু ব্যাকুলতার মাঝেই আমাদের সময় কাটছে। আমি আনোয়ার সাহেব ও ফাহেকুজ্জামান সাহেব আছি এ কনডেমড সেলে।

ঈদগাহও নাকি এখানে আছে। ঈদের নামাজও নাকি এখানে হয়। এবারও ঈদের নামাজ ভিতরে হবে। শুনছি সিপাহীদের মুখে। আমাদের নেবার কথা শুনলে অন্ততঃ গোসলটাও করে রাখার প্রস্তুতি নিতে।

সবলোকজন ঈদগাহে নিয়ে যাবার পর একজন জমাদার এলো আমাদের সেলে। খুব ত্রস্ততা দেখিয়ে বলতে শুরু করলো-চলুন-চলুন। আমাদের সকলের মান্য বয়োবৃদ্ধ ফাহেকুজ্জামান সাহেব বললেন-"জমাদার সাহেব আমাদেরকে আগে একবার খবর পাঠালে ভাল হতো না? আমরা তৈরী হয়ে থাকতাম। এখানে আমরা সকলেই নতুন। এখানকার ঈদ পর্ব উপলক্ষ্যের প্রচলিত নিয়ম-কানুন কিছুই জানি না। এখনো গোসল করি নাই। ওজু করি নাই; অথচ আপনি বলছেন, চলুন, চলুন। আমরা কিভাবে চলবো,-অন্ততঃ অজুটা করার সময় তো দিবেন। ওজু ছাড়া তো আর নামাজ পড়া যায় না।" উত্তরে জমাদার খুব তির্যকভাবে বললো, সেসব কথা আমি জানিনা। গেলে চলুন না হয় থাকুন। আমি নিতে এসেছি ওজু গোসল করাতে আসিনি।

www.pathagar.com

সকলের মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আজ ঈদের দিনও তাদের এমন দুর্ব্যবহার। তবু মান অভিমান না করে আমরাই নতি স্বীকার করে অগত্যা কড়া প্রহরায় ঈদের মাঠে গেলাম। শুধু একসাথে সব লোকগুলোকে এক জায়গায় দেখতে পাবো এ আশায়।

ঈদের মাঠে গেলাম। পরমাত্মীয়, হৃদয়ের তন্ত্রীর সাথে গ্রথিত দূরস্থ ভাইদের অনেককে দেখতে পেলাম তথায়। সকলের বিবর্ণ-বিষন্ন মুখ। উৎকণ্ঠিত চেহারা। বিভিন্ন জেলার লোক-নেতা, উপনেতা, কর্মী মিলে প্রায় ভরে গেছে মাঠ। এক একজন কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে উঠছে। ঈদের নামাজ পড়াবার জন্য বাইর থেকে আগত ইমাম সাহেব নামাজ শেষে খুতবার পর একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণে যখন বললেনঃ ভাইসব, আমি অনুভব করছি এই রুদ্ধ করাগারে সব আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এসে আপনাদের ঈদের নামাজ পড়ার ব্যথা। ভাষনে তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করা ছাড়া আর আমাদের তো কিছু করার উপায় নেই।" একথা কয়টি উচ্চারিত হবার সাথে সাথে সারাটি ঈদের মাঠে কান্নার কি যে এক মর্ম বিদারী রোল পড়ে গেলো। থেকে থেকে চাপা কান্নায় গগন বিদারী রোল উত্থিত হতে লাগলো। মোনাজাত শেষে যে যাকে পারে বুকের সাথে মিশিয়ে ধরে কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিতে লাগলো। বড় নেতা, ছোট নেতা, কর্মী সকলেরই একই অবস্থা।

ঈদের এ খুশীর দিনে হৃদয় বিদারক এমন শোকের ছায়া-এমন অপূর্ব করুন দৃশ্য জীবনে আর দেখিনি। কান্নার এ বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতে ভেসে গিয়ে কোন কোন জেলরক্ষীকেও কাঁদতে দেখেছি। ঐ দৃশ্য অনেকদিন জাগরুক থাকবে মনে। কেন্দ্রীয় কারাগারের ৫ খাতার সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ঈদের নামাজ। ঈদের ময়দানের প্রধান আকর্ষণ ছিলো পাকিস্তানের এক সময়ের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদের স্পীকার জানাব মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরী। তিনি অবশ্য নামাজ পড়েননি। বন্দীদের জন্য ঈদের নামাজ প্রয়োজন নেই। তার উপস্থিতি ছিলো ছোট বড় সকলের জন্য অনুপ্রেরনা। ডি. আই, জি ও জেলারের সঙ্গে তিনি ৫ খাতায় শিরওয়ানীপরে রাজপুত্রের মতো মাথা উচু করে দাড়িয়েছিলেন। রাঙ্গায় মুখে অপূর্ব হাসি। অকুতভয় মানুষ।

ডাণ্ডাবেড়ীর নির্যাতন
(BAR FITTER)

৩১শে জানুয়ারী এগারটার দিকে সেল কক্ষ হতে ছাড়া পেলাম কিছু সময়ের জন্যে। গোসল করে খাবার নিয়ে আবার সেলে বন্ধ হলাম। নামাজান্তে আহার শেষ করে শুইয়ে শুইয়ে ভাবছি অনেক কথা। নিজের দূর্দশার সাথে সাথে দেশের ভবিষ্যতের কথা, হতভাগ্য জাতির কথা। অন্যান্য সেল কক্ষের লোকজনের কথাও ভেসে আসছে কানে।

হঠাৎ আমার সেলের তালা খোলার খটখট শব্দ পেলাম। এ অসময়ে তো বিশেষ কোন কারণ না থাকলে সেল খোলার কথা নয়। সচকিত হয়ে উঠে বসলাম। সত্য কথা বলতে কি, সে সময়ে আমার সেলে কোন সিপাহী বা জমাদার আসলে নানা কথা মনে উঁকি ঝুঁকি

www.pathagar.com

মারতো। মাঝে মাঝে মনে হতো আমার কোন আপনজন বুঝি দেখা করতে এসেছে। আর আমাকে গেটে নিয়ে যেতে এসেছে এরা। আপনজনদের কাউকে দেখার ইচ্ছাও মাঝে মাঝে মনে জাগতো। পরক্ষণেই আবার তাদের অমঙ্গল আশংকায় দুর হয়ে যেতো সে ইচ্ছা।

তালাটি খুলছে একজন জমাদার। আমার উঠে বসার সাথে সাথেই তার চোখে চোখ পড়লো। কিন্তু কোন কথা বলছেনা সে। তার চোখে মুখে রহস্য ভরা ছাপের ইঙ্গিত। ওইরূপ কোন সংবাদ থাকলে তো গেট থেকেই নাম ডাকা আরম্ভ হয়। এর আগে দু'বারই অফিস কলের নাম করে ইন্টেরোগেশনের ফ্যাসাদে ফেলেছে আমাকে আকসিস্মকভাবে। কাজেই শুভ হতে অশুভ খবর শোনার উৎকণ্ঠা নিয়েই তাকিয়ে রইলাম জমাদারটির দিকে।

তালাটি খোলার পর জমাদারটি আমাকে বললো–'উঠে আসুন।' বললাম 'কি ভাই, আবার কোথায় যেতে হবে?' সে সময় মাওলানা মাসুম সাহেব এর দেয়া একটা অর্দ্ধছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি আমার গায়ে। কোন ইন্টেরোগেশন সন্দেহ করে বললাম–'জামাটা গায়ে দিয়ে আসবো?' বললো–'না লাগবেনা, আপনি আসুন।' তাকে অনুসরণ করলাম। সেলের বাইরে আসার পর জমাদারটি আমার দিন রাতের একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র প্যান্টটি পায়ের গোড়ালী থেকে টেনে উপরের দিকে উঠাতে বললো। তাই করলাম। খুব মনোযোগ সহকারে আমার পায়ের গোড়ালীর দিকে দেখতে লাগলো সে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার?' কোন জবাব না দিয়েই বললো–'আসুন।' চললাম। যেতে যেতে আমার সেল এরিয়া পার হবার পর ছিন্ন ময়লা গেঞ্জি পরিহিত বলে একটু লজ্জানুভব হলো। তাই আবার বললাম–জামাটা গায়ে দিয়ে আসলে ভাল হতো না? কোথায় নিয়ে চলছেন? এবারও সঠিক কথা না বলে শুধু বললো। "না লাগবে না–আপনি আসুন।"

দুপুর বেলা। নিয়ে এলো আমাকে কেস টেবিলে। জনকলরব এসময়ে একটু কম। খাওয়া দাওয়া শেষে সবাই হয়তো যার যার জায়গায় বিশ্রামরত। ৬ই জানুয়ারীর পর এই–ই–প্রথম এ জায়গায় আমার আগমন। এ জায়গায় সব বিচার–আচার হয় বলে এখানে একটা ভীতিপ্রদ পরিবেশ সব সময় বিরাজ করে। জমাদারটি দু'একজন লোক ডেকে আনলো। দু'মাথায় কড়াযুক্ত লোহার রড, বড় বড় হাতুড়ী লোহার মুগুরসহ নানা সরঞ্জাম এনে জমা করতে লাগলো এক পাশে। তখনো কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। তারপর আমাকে কাছে ডেকে নিলো। অনুমান তিন সের ওজনের দুমাথায় পৃথকভাবে দুটি ও আর এক মাথায় একটি যুক্ত কড়া বিশেষ লোহার রড়গুলো আমার দু'পায়ে পরাতে শুরু করলো।

একটু আগেও ছেঁড়া–ময়লা গেঞ্জির জন্যে লজ্জানুভব করছিলাম। কিন্তু এ ঘটনার আকস্মিকতায় বাকহীন হয়ে পড়লাম। অনুভূতিহীনভাবে মুগুরের উপরে রাখা পা'টির দিকে অপলক নেত্রে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। পরে শুনেছি দু'একটি ছোট ভাইও নাকি এ সময়ে এখানে উপস্থিত ছিলো। কিন্তু আমি কাউকেও দেখছি বলে মনে পড়ে না। তারাও নাকি বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটি দেখছিলো শুধু। আগে কোনদিন না দেখলেও এখন আমার বুঝতে অসুবিধা হলোনা আমার পায়ে লাগানো সব লোহাগুলোর একত্রে নাম 'ডাভাবেড়ী।' কারণ ইতিপূর্বেই জেলের ভেতরের বহুরকম 'বেড়ীর'

www.pathagar.com

রোমাঞ্চকর কাহিনী পুরানো কয়েদীদের মুখে শুনেছিলাম। তখন মনে হয়েছিলো এগুলোকে রূপকথার কাহিনী। মজার মজার বানানো গল্প মাত্র। এখন আর আমার সংশয়ের কোন অবকাশ রইলোনা। এগুলো কাহিনী বা মজার মজার গল্প নয়। বাস্তব ব্যাপার। আমি তার বাস্তব প্রমাণ।

আবার রওনা হলো জমাদারটি আমাকে নিয়ে। পথে জিজ্ঞেস করলো আমাকে–"কি ব্যাপার? এখানে কোন অপরাধ করেছেন নাকি? ডান্ডাবেড়ী লাগানো হলো কেনো?" তখনো নির্বাক ছিলাম আমি। কোন কথা–ই সরলোনা আমার মুখ দিয়ে। আবারও জিজ্ঞেস করলো সে। বললাম–আমি কিছুই জানিনা। অন্যায়–অপরাধ কিছুই করিনি। আমার সাথে তো লোকজনেরই দেখা শুনাই হয় না। অপরাধ করবো কার সাথে? কেন লাগিয়েছে তা আপনারই ভালো জানা থাকার কথা? উত্তরে জমাদারটি বললো–না ভাই, আমি কিছুই জানিনা। আমি ডিউটিতে আসার পর জেলার সাহেব ডেকে নিয়ে আমাকে এ হুকুম দিয়েছেন। এভাবে ঝুনঝুন করতে করতে আবাসস্থলে গিয়ে উঠলাম। আমাকে নিয়ে যাবার সময় কেউ টের পেয়েছিলো কিনা জানিনা। কিন্তু ঢোকবার সময় আমার পায়ের ঝনঝনানির শব্দে সবাই খবর পেয়ে গেলো আমাকে দেখে তারা হতবাক।

ডান্ডাবেড়ীর অমানবিক নির্যাতনে কি অসুবিধা তা ইতিপূর্বেই শুনেছি। শুনেছি কোন ধরনের আসামীদেরকে কোন ধরনের অপরাধ করার পর এমন নির্মম শাস্তির শিকারে পরিণত হতে হয়। দুঃখের আতিশয্যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এ সব কথাই ভাবতে লাগলাম। এর কোন্ অপরাধটি আমি করেছি। কোন কারণে জেল কর্তৃপক্ষ এমন বিমাতা সুলভ ব্যবহার করেছে। তাদের তো থাকা উচিৎ নিরপেক্ষ। সরকার আসবে যাবে। কিন্তু তারা তো সব সময়ই থাকবে। আমি যদি অপরাধ করে থাকি–রাজনৈতিক অপরাধ করেছি। রাজোচিত আচরণই রাজবন্দির প্রাপ্য। রাজসম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্যেই রাজবন্দীর সাথে রাজার আচরণ হয় সম্মানের। এ প্রথাই জগতে আজো প্রচলিত। রাজা বা রাজশাসন কোনটাই চিরঞ্জীব নয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক জগতে গণসরকাররা তো এ রীতি পাল্টিয়ে দেয়নি। আজ যারা ক্ষমতার আসনে তারাও তো এ রাক্ষসপুরীর নাগরিক ছিলো একদিন। আমি চোর নই। ডাকাত নই। নই কোন দাগী আসামী। জেলেও তো আমার আর আগমন ঘটেনি কোনদিন যে আমার ডানপিটাপনার রেকর্ড আছে তাদের কাছে। কাজেই জেল ভেঙ্গে পালাবার অশুভ সম্ভাবনার হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমাকে এ নির্মম ও অভদ্র শাস্তি দিয়ে পঙ্গু করে রেখেছে। তা নাহলে এমন বর্বর শাস্তি একজন রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার কৃত লোককে কি করে দিতে পারে!

এ সময়েই মনে উঠলো আল্লামা জাফর থানেশ্বরীর কথা। বৃটিশ অধীনতার নাগপাশ থেকে এদেশকে মুক্ত করার জন্যে, মুসলমানদের মধ্যে তৌহিদের প্রকৃত বীজ বপন করার নিমিত্ত আজ থেকে সোয়া'শ বছর পূর্বে শহীদ সৈয়দ আহমদ মরহুমের নেতৃত্বে পাক ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ঘরে ঘরে আন্দোলনের যে তুফান উঠেছিলো তা বৃটিশ বেনিয়াও জাত হিন্দুদের ছত্রছায়ায় ধ্বংস করে দিয়েছিলো। এ আন্দোলনের অসংখ্য নেতা ও কর্মীকে নানাভাবে নির্যাতন করেছিলো। জাফর থানেশ্বরীর মত প্রখ্যাত আইনজীবিসহ

www.pathagar.com

কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে ডান্ডাবেড়ী লাগিয়ে পায়ে হাটিয়ে এক জেল থেকে আর এক জেলে স্থানান্তরিত করেছে। এসব বীর সেনানীরা দীপান্তরিত পর্যন্ত হয়েছিলো। এসব ঘটনা সে সময়ের জন্যে ছিলো অত্যন্ত সান্ত্বনার বস্তু।

ডান্ডাবেড়ী সহ সে সব দিনের সময়গুলো কাটাবার কথা মনে হলে আজকে চমকে উঠি। সোয়া হাত লম্বা লোহার ডান্ডা দু'পায়ের গোড়ামীর খাড়ুর মতো লোহার গোল কড়া দিয়ে আটকানো। এ নিয়েই আহার-বিহার, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা, পায়খানা-পেশাব নামাজ-রোজা সব করতে হয়। কিন্তু আমার জন্য আরো বড় বিপদ ছিলো এই যে, গ্রেফতারের পর থেকেই একটি মাত্র প্যান্ট পরেই দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা সময় অতিবাহিত করছি। গোসল নামাজ ইত্যাদির জন্য এ একটিই মাত্র সম্বল। ডান্ডাবেড়ী লাগাবার পর তো স্বাভাবিক ভাবে প্যান্ট খোলা পরা যায়না। অবশ্য প্যান্ট খোলা ও পরার একটি কন্দি শিখে নিলেও তা ছিলো বড় দুষ্কর ও সময় সাপেক্ষ কাম। পায়ের গিরার সাথে লাগানো কড়ার ভিতর দিয়ে গোটা প্যান্ট আনতে নিতে হতো । কিন্তু মোটা প্যান্ট আনা-নেয়া করা যায় না। শীতের হীম-শীতল দিনগুলোতে পায়ে লোহার ডান্ডাসহ সব কাজ করার সাথে সাথে এটি নিয়ে শুইতেও হতো। চব্বিশ ঘন্টাই ওটার ঝন ঝন ধ্বনী প্রায় লেগেই থাকতো। পা নাড়া-চাড়া করাও হয়ে উঠতো মুশকিল।

সে সব দিনে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতাম, খোদা! তাহরিকে ইসলামের একজন নগন্য কর্মী হওয়া ছাড়া তো আর কোন অপরাধ নেই। যত মিথ্যাই তারা আমার নামে রটনা করুক না কেন, তোমার তো জানা আছে আমার কি অপরাধ। দ্বীনি আন্দোলনের কর্মী হবার অপরাধে আজ আমি ও আমার মত হাজার হাজার কর্মী যদি অত্যাচারের এ অমানুষিক শিকার হয়ে থাকে তবে, তা সানন্দে গ্রহণ করলাম। তাহলে তোতো এ তেমন কিছু নয়। এ একই কারণেই তো ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) মতো বিশ্ববরণীয় মোজাহিদও কারার এ অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। তাঁকে দিয়েও তো বহন করিয়েছিল তারা নিষ্ঠুরভাবে ইটের বোঝা। বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি এ নির্যাতনকে আনন্দ চিত্তে। অন্যায়ের সামনে তিনি মাথা নত করেননি। তৎকালীন বিচার বিভাগের সর্ব উচ্চ পদকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন অবজ্ঞা ভরে। ইমান আহমদ বিন হাম্বলের (রাঃ) মত বড় বিশ্ববিখ্যাত ইমামও জালেমের নির্যাতন নিষ্পেষণে তিলে তিলে জীবন দিয়েছেন তবুও অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। এ সেদিনও মিসরের মরণজয়ী বীর শহীদ হাসানুল বান্না, শহীদ কুতুব সহ অসংখ্য দ্বীনি আন্দোলনের বীর সেনানী জালেম নাসেরের পাশবিক অত্যাচারের সামনে অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ হাসি মুখে ফাঁসি নিয়েছেন। আবার অনেকেই অতিক্রম করেছেন নির্যাতনের কঠিন পথ। তবুও অন্যায়ের সামনে মাথা নত করে তারা বেছে নেননি জীবনে বাঁচাবার কোন সহজ পথ। তাদের নামেও জঘন্য মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিলো। আমাদের সকলকেই এ নির্যাতনের সামনে ধৈর্যধারণ ও ঘৃণা অপবাদ সহ্য করার শক্তি দাও। সভ্য জগতে তো কোন রাজনৈতিক প্রতি-পক্ষের সাথে এমন অসভ্য আচরণের নজীর নেই।

ফাঁসিই আমার অবধারিত শাস্তি। জেলেও উর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তি হতে শুরু করে জমাদার সিপাহী মায় সবলোকই আমার সাথে সে আচরণ করতো। বিশেষ করে জেলার নির্মলেন্দু

www.pathagar.com

রায়। সেপারতো তো আমাকে প্রথম দিনেই ফাসি মঞ্চে চড়িয়ে দিতো। আমার সেলের সামনে আসলেই নানা কুমন্তব্য করতেণ তিনি। প্রথমদিকে অবস্থার নাজুকতার জন্যে সম্ভব না হলেও কিছুদিন পর রায়বাবুর এ ঐদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিবাদ করতে লাগলাম।

আমাকে ডান্ডাবেড়ীর শাস্তি দেয়া রায়বাবুরই কারসাজি বলে আমার বদ্ধমূল ধারণা। বাইরে থেকে এমন কোন হুকুম আসতে পারে না। প্রায় দু'মাস পরে কোন এক সূত্রে আমার এ ধারণা সঠিক হবার কিছু ইঙ্গিত পেলাম। এর মধ্যে একদিন রায়বাবু আমাদের সেল পরিদর্শন করতে আসলে আমার শারিরীক অক্ষমতা জানিয়ে ডান্ডাবেড়ীটি খুলে দেবার জন্যে অনুরোধ জানালাম। আমার অত্যাচারিত দেহে তখনো ব্যথা বেদনা ও কোন কোন জায়গায় ক্ষত রয়ে গেছে। এটা এন. এস. আই-র হুকুম বলে তিনি পাশ কাটাতে চাইলো। বললাম, 'তাহলে এ কথাটা আমার হিস্ট্রি টিকেটে লিখে দিন।' কোন জবাব না দিয়েই চুপচাপ চলে গেলো সে।

কিছুদিন পর তৎকালীন ডি, আই, জি অব প্রিজন্স আনোয়ারুল হক সাহেব আসলেন আমাদের দেখতে-আমাদের সুবিধা অসুবিধা তদারক করতে। আমাদের অভিযোগ শুনতে। সাধারণতঃ ডি, আই, জি সাহেব এ কারণেই ভিতরে দৈনিক একবার করে আসেন। তাঁর এ আসাকে জেলের ভাষায় 'ফাইলে আসা' বলা হয়। তার কাছে আমি অভিযোগটি পেশ করলাম। তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন রায়বাবুর দিকে। রায়বাবু আস্তে করে বল দিলো, বাইরের অর্ডার। 'আমাদের কিছু করার-নেই' জবাব দিয়ে চলে গেলেন ডি, আই, জি, সাহেব।

এরপর একদিন বৈকালিক রাউন্ডে রায়বাবু আসলেন আমাদের সেলে। আমি আবারও আমার শারিরীক অবস্থার কথা জানিয়ে ডান্ডাবেড়ীর বোঝাটা নামিয়ে নেবার জন্যে অনুরোধ জানালাম। এবার তিনি বললেন- 'কোর্টের অর্ডার।' এটা খোলা আমার ইখতিয়ারভুক্ত নয়। আমি মৃদু হেসে বললাম-"আমাকে কোর্টে হাজির করা হয়নি একবারও। আমার কেসও শুরু হয়নি এখনো। কোর্ট অর্ডার দিলো কি করে। তাছাড়া একদিন বললেন N.S.I-র অর্ডার, আজ বলেন কোর্টের-কোনটা ঠিক।" এসব কথার কোন জবাব না দিয়ে এবার সে বললো "মেডিকেলের ডাক্তার মেডিকেল গ্রাউন্ডে খুলতে পরামর্শ দিলে তবে আমি খুলি দিতে পারি।" মেডিকেলী খোলার প্রচেষ্টা চালায়েও ব্যর্থ হয়েছি। মেডিকেল ডাক্তারও নানা রকম তালবাহানা করেই বিফল মনোরথ করলেন।

অতঃপর বদলী হয়ে জনাব কাজী আবদুল আউয়াল আসলেন নতুন ডি, আই, জি। অমায়িক ভদ্রলোক বলে তার সুখ্যাতি। তার কাছে আমার সব পরিচয় জানিয়ে এ সম্বন্ধে অভিযোগ জানাতে পরামর্শ দিলো সকলেই। একদিন 'ফাইলে' আসলে তাঁকেও জানালাম আমার অভিযোগটি। তিনিও রায় বাবুর দিকে তাকালেন। রায় বাবু এনাকেও বললেন বাইরের অর্ডারের কথা। রায় বাবুর সামনে এনাকে অসহায় বলেই মনে হতো। কিন্তু আমার বাড়াবাড়ীতে কিছু ভীতও হলো রায় বাবু। তাই বললো এনু N.S.I. কে দরখাস্ত করতে। তাই করেছিলাম।

www.pathagar.com

তার অজ্ঞাতেই বোধ হয় আমার দরখাস্তখানা চলে গিয়েছিল N.S.I.তে। সেখান থেকে দরখাস্তখানা ফেরৎ এসেছে-"Such order has not been issued from this office" রিমার্ক নিয়ে। বিশ্বস্ত সূত্রেই অফিস থেকে জানলাম একথা। একজন কুখ্যাত মুসলমান বলে রায়বাবুরই এসব কারসাজি বলেই অফিসের কেউ কেউ মন্তব্য করেছে। আমার কেস শুরু হবার একদিন আগে দীর্ঘ চার মাস পর দাভাবেড়ীটি খুলে দিলো জেলার রায় মাহশয়।

২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ এর হৃদয়-বিদারক ঘটনা

জেলের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও হৃদয় বিদারক ঘটনাটি ঘটে বাহাত্বরের উনত্রিশে ফেব্রুয়ারী। নির্মমভাবে নির্য্যাতিত হয়ে এসেও দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ভেতরেও নির্যাতনের সীমা ছিল না। বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগহীন এ কারান্তরালে কি নির্মম নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের সাথে এর প্রকৃত বিবরণ দেশবাসীর কাছে পৌঁছেনি। এই মজলুমদের আহাজারী-কাতরধ্বনি আল্লাহর আর্শকে কাঁপিয়ে তুললেও পাষাণ কারার উঁচু প্রাচীর ভেদ করে বাইরের মানুষের কানে প্রবেশ করতে পারেনি। পৌঁছতে পারেনি এদের উপর পরিচালিত নিষ্পেষণের প্রকৃত ইতিহাস। নির্দোষ নিরপরাধ নিরিহ মানুষকে গুলী করে মেরেও সম্পূর্ণ উল্টো মিথ্যে ও বানোয়াট খবর সরবরাহ করে ইচ্ছাকৃতভাবে বাইরের জগতের মানুষকে করেছে বিভ্রান্ত। এতে তারা একটুও দ্বিধা করেনি-প্রয়োজন বোধ করেনি কোন প্রকার সংকোচের।

সে দিনটি ছিল বাহাত্বরের উনত্রিশে ফেব্রুয়ারী রোজ সোমবার। সকালে নাস্তা করার পর সেল বন্দী হবার নিয়ম থাকলেও ওইদিন তখনো সেল বন্দী হইনি। একজন নম্র ভদ্র সিপাহী ডিউটিতে থাকায় বাইরে পায়চারী করছি তখনো। হঠাৎ অনুমান সাড়ে আটটার সময় কেস টেবিলের দিকে শোর গোলের শব্দ শুনতে পাই। এর সাথে সাথেই জেল গেটের দিক হতে ঘন্টি বাজার অবিরাম বিকট ধ্বনি ভেসে আসতে লাগলো কানে। এই সময়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো সিপাহীটি। চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলো-"আপনারা সেলের ভেতরে যান। সেলের ভেতরে যান।" তাড়াতাড়ি আমরাও তাই করলাম। কারণ যে ঘন্টার ধ্বনি উঠলো, জেলে প্রচলিত কথায় একেই বলে 'পাগলা ঘন্টি'। এই ঘন্টির মাহাত্ম ইতিপূর্বেই আমরা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কয়েদীদের মুখে গল্পচ্ছলে একাধিকবার শুনেছি। শুনেছি এর ভয়াবহতার অনেক ইতিহাস। অনেক কাহিনী। তাই সিপাহীটির চীৎকার ধ্বনির সাথে সাথে আমরা সেলে ঢুকে পড়লাম।

জেলের ভেতরে কোন গন্ডগোল বাঁধলে ও তা জেল রক্ষীদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তৎক্ষণাৎ বাঁশী বাজিয়ে একটি জরুরী বিপদসংকেত দেয়া হয়। আর এই সংকেতের সাথে সাথেই জেল গেট থেকে সে ঘন্টিটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবিরাম গতিতে বাজতে থাকে আর অবিরাম গতিতে বাজার জন্যেই বোধ হয় এর নাম দেয়া হয়েছে 'পাগলা ঘন্টি'। বিপদ সংকেতের কথা ঘোষণা করে শুনিয়ে দেয় জেল সিপাহীদের ব্যারাকে ব্যারাকে মেসে

www.pathagar.com

মেসে। এ শব্দ শুনলেই বুঝে যায় তারা মহাবিপদের কথা। আর অমনি যে যেখানে যে অবস্থায় থাকে ডান্ডা হাতে দৌড়িয়ে এসে প্রবেশ করে জেলের ভিতরে। আর যায় কোথায়? যাকে যেখানে পায় পিটিয়ে শুইয়ে দেয়। কোথাও আগুন লাগলে যেমন চারিদিক থেকে মানুষ এসে আগুন নিভিয়ে ফেলার চেষ্টা চালায়। কে লাগিয়েছে কেনো লাগিয়েছে, কিভাবে লাগলো–এসব কিছুই জিজ্ঞেস করে না। জিজ্ঞেস করার সময়ও থাকেনা। এখানেও এক্ষেত্রে ঠিক এরূপই হয়ে থাকে। কে দোষী, কে নির্দোষ, কে গন্ডগোলের কারণ এসব এখানেও প্রথমবস্থায় খুঁজে বের করে না। পাইকারী হারে পিটিয়ে সব ঠান্ডা করে দেয়। তারপর দেখা যাবে কি হয়েছে।

এ কারণেই 'পাগলা ঘন্টির' অবিরাম ধ্বনি শোনার সাথে সাথে বন্দীশালার বন্দীরাও এ বিপদ সংকেতকে বুঝে ফেলে। এবং যে যেখানে থাকুক নিরাপদ আশ্রয়স্থান বেচে নেয়। এ সময় নিরাপদ স্থান নাকি শুধু জেল হাসপাতাল। ওখানে গিয়ে মারধর করার সাধারণতঃ কোন নিয়ম নেই। মুহূর্তের মধ্যেই জন-কোলাহলপূণ জেলখানা জনশূন্যের মতো হয়ে পড়ে। নীরব নিস্তব্ধ যেন এক পাতালপুরী। পথ ঘাট সব জনশূন্য। কোথাও টু শব্দটিও পর্যন্ত থাকে না। শোনা যায় শুধু রক্ষীদের বুটের ঠক ঠক শব্দ।

অল্প সময় পরেই গুলির তান্ডব ধ্বনি ভেসে আসতে লাগলো কানে। চারদিকে উঁচু দেয়াল ঘেরা বাড়ীতে গুলির সে কি মর্মাবিদারী শব্দ। পাগলা ঘন্টি পড়ার অনেক ঘটনাই শুনেছি আমরা। পিটিয়ে সটান করে দেয়া হয়। কিন্তু এরূপ গুলি করার কথা তো শুনিনি কোনদিন। সুউচ্চ দেয়াল ঘেরা এ পাষাণ পুরীর ভেতরে আরো ছোট ছোট অনেক দেয়াল। সম্পূর্ণই বিপদহীন এই জায়গায় গুলির কি কারণ ঘটলো তা আমরা কিছুই উপলব্ধি করে উঠতে পারলাম না। বিপদের এই জোয়ারে আমরাও নিপতিত হই আশংকায় নির্বাক বিস্ময়ে বসে আছি। কোন কথা নেই মুখে। চেহারায় উৎকণ্ঠার গভীর ছাপ।

বর্বরোচিত এই নিষ্ঠুর গুলির আঘাতে শহীদ হয়েছেন এ পাষাণ কারার নয়টি নির্দোষ প্রাণ। শাহাদতের লাল রক্তে রঞ্জিত করেছে তারা কারার শুষ্ক পথ। বিশ্বাসঘাতকতা করতে না পারার অপরাধে নির্দোষ জীবন নিয়ে কারায় আসার পরও এ ক্ষুদ্র গন্ডির ভেতরে তাদের স্থান হলো না। বর্বরদের অমানুষিক অত্যাচার ও গুলির নির্মম আঘাতে তারা অমূল্য প্রাণ দান করে গেলো অকাতরে, অম্লান চিত্তে। দেশবাসী জানতে পারলো না তাদের শাহাদতের প্রকৃত কারণ। তারাও দেখে যেতে পারেনি ভুল উপলব্ধি করার পর তাদের প্রতি জাতির অবনত মস্তকের শ্রদ্ধার দৃষ্টি ও মিনতি ভরা আহ্বান –"তোমরা বেরিয়ে এসো-শিকল টুটে ফেলো, আমরাই ভুল করেছি। জাতির ভাগ্য নির্মাণের কাজে সব শক্তি নিয়োগ করো। তোমরাই আমাদের ভবিষ্যত।" এ নয়টি প্রাণের মধ্যে পাবনার ছোট ভাই ঢাকা ভার্সিটির অর্থনীতির ছাত্র শহীদ আনিস ও নোয়াখালীর মাওলানা আবু তাহের অন্যতম। দুর্গত জীবনে রমনা থানায় আনিস আমার এক রাতের সাথীও ছিলো।

দেশ স্বাধীন হবার পর তথাকথিত স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে স্বাধীন তাকামীরাও আসতে শুরু করলো এই মোসাফিরখানায়। আমাদের আসার কারণ শুধু একটা হলেও

www.pathagar.com

তাদের আসার কারণ ছিল বহুবিধ। তাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিলো না। জেলে এসেও তারা নিজেদেরকে অপরাধী বলে মনে করতো না। দুর্দান্ত দাপট খাটিয়ে চলতে শুরু করলো। তাদের দাপটে জেল কর্তৃপক্ষ থাকতো সব সময়ই হয়রান পেরেশান। যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। দুর্ধর্ষ পাক জান্তার কবল থেকে দেশকে, দেশের মানুষকে পশ্চিমাদের শোষণ থেকে মুক্ত করেছে। জাতির ভবিষ্যত এখন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। এসব গৌরবময় কীর্তিই ছিলো তাদের দাপটের একমাত্র কারণ। এটাই ছিল তাদের গর্ব। এই জন্যই জেলের প্রচলিত নিয়ম কানুন মেনে চলতে তরা রাজী নয়। এমন কি চলতোও না। জেলের নিয়ম অনুযায়ী যাকে যে সীমায় থাকতে দেয়া হয় সেখান হতে বেরিয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু তারা সে আইন মেনে চলতে বাধ্য নয়। একত্রিত হয়ে জটলা পাকানো, জল্পনা-কল্পনা করা, কোন মিটিং করা জেলের দৃষ্টিতে বেআইনী। এ আইন অমান্য করলে অমান্যকারীকে দন্ড দেবার নিয়ম আছে। কিন্তু তারা নিজেদেরকে সব আইনের ধরা ছোঁয়ার উর্ধে মনে করতো। তারা অবাদে সব করতো। বন্দীদের সংখ্যা ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য জেলে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে চার চার জন করে বসিয়ে গণনা করারও একটা নিয়ম আছে। জেলের মধ্যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এভাবে বসিয়ে গণনা করার নাম হলো ফাইলে বসা। অবশ্য যারা হায়ার ষ্টেটাস পায় তারা ব্যতিক্রম। কিন্তু এভাবে বসে গণতি দিতে রাজী নয় তারা। এ অবহেলিতভাবে বসে বসে গণতি দিতে তাদের আত্মসম্মানে বাধে। যদিও চুরি, কি মেয়েঘটিত কেলেংকারী কিংবা ডাকাতি বা কোন হাইজাকিং-এর মতো সম্মানিত অপরাধের জন্য তারা জেলে এসেছে। তাদের খুব ভাল খাবার দিতে হবে। স্পেশালভাবে তৈরী করে খাবার দিতে হবে। হাজার হাজার লোকের সাথে একত্রে বসে খাবার খেয়ে তাদের পোষাবে না। নিয়মিত গোসল করার সুযোগ দিতে হবে রোজ রোজই। নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ের বাইরেও প্রচলিত নিয়ম হতে মুক্ত রেখে তাদের পায়খানা প্রস্রাবের ব্যবস্থা করতে হবে। যথেচ্ছা ঘুরতে ফিরতে পারবে তারা। কারুর বাধা দেয়া চলবে না। ইত্যাকার সুযোগ সুবিধাগুলো পাওয়াই হলো তাদের দাবী। দফা আর দাবী আদায় কিভাবে করতে হয় শুরু এখন বাইরে থাকলেও সে শিক্ষা তারা সাথে করেই নিয়ে এসেছে জেলের ভেতরে। সময় মত প্রয়োগ করা হবে। অবশ্য এ জন্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সে কাজটিও তারা সেরে নিয়েছে বিভিন্ন রুমে গিয়ে সবাইকে একত্র করে একমতে এনে। অপরাধ যা-ই হউক দেশ তারা স্বাধীন করতে পেরেছে এটাই ছিলো তাদের অহংকার। আর এ কারণেই তারা এসব সুবিধা সুযোগ পাবার দাবিদার।

আমাদের চেয়ে তথা স্বাধীনতা বিরোধী বা ভারত বিরুধীদের চাইতে তাদের অনেক গুণ বেশী সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকলেও কর্তৃপক্ষ তাদের ষোল আনা দাবী মেনে নেয়নি। মেনে নিতে পারেনি। এ নিয়েই কিছুদিন থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে চলছে অসন্তোষ। আর এ অসন্তোষকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় ২৯শে ফেব্রুয়ারীর গোলযোগ।

সে সময় এদের ছাড়া আর যারা এ কারান্তরালে বাস করতো তারা হলো পাইকারী হারে ধরে আনা কথিত স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক অপরাধে বন্দী। তাদের যে যত ধনী জ্ঞানী গুণী সম্মানী আর বুদ্ধিমানই হোকনা কেন খুব দীনহীন বেচারার মতোই কাটাতো

www.pathagar.com

দিন। প্রথম কাতারের সাংবাদিক, রাজনৈতিক, আদমজী ইস্পাহানী বাওয়ানীর মত মিলের জেনারেল ম্যানেজারদের করুন ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবন দেখে কাহার না মনে করুণার উদ্রেক হয়েছে। পায়খানা পেশাবের অসুবিধার কথা বর্ণনার যোগ্য নয়। এমন অবস্থায় রাখা হয়েছিল যে ২/৩ সপ্তাহে ও একবার গোসলের সুযোগ পায়নি। হাড়ভাঙ্গা শীতের সময়েও একখানা কম্বল দিয়ে কাটাতে হয়েছে শীতের রাত। দাবী করে কিছু অধিক আদায় করা তো দূরের কথা, অধিকারের ন্যায্য পাওনাটুকু না দিলেও তো'টু শব্দটিও করতে পারেনি কেউ। যেভাবে বলে, যেভাবে রাখে সেভাবেই তারা সুবোধ-সুশীল বালকের মত নিয়ম পালন করে চলে। স্পেশাল খাওয়া-দাওয়া তো দূরের কথা ন্যায্য পাওনাটুকু না পেলেও কিছু বলতে সাহস পায়নি তারা। ফাইলে বসে গণতি দেয়া কেন শীতের ভোরে কুয়াশায় শুইয়ে গণতি দিতে বললেও প্রতিবাদ করার হিম্মত তাদের ছিল না। এ ছিল তৎকালীন জেলের দু'গ্রুফের প্রকৃত রূপ।

থাকার ব্যবস্থা হিসেবে আবার ভিন্ন ভিন্ন ওয়াল বা তৎসমতুল্য কিছু দিয়ে ঘেরা দুতল-তেতল বিশিষ্ট কতগুলি দালান আছে। প্রত্যেক দালানেই আবার আট নয়টি করে রুম আছে। এ দালানগুলিকেই এখানে বলা হয় খাতা। এখানে ১/২ খাতা, ৩ খাতা, ৪ খাতা ও ৫ খাতা এরূপে বৃহৎ বৃহৎ মোট ৪টি খাতা আছে। আর এ দালানগুলির প্রত্যেকটি রুম এক একটি নম্বর।

এদিন চার খাতায় একজন জেলরক্ষীর সাথে সকালের ফাইলে বসা নিয়ে সে হাইজাকারদের শুরু হয় বচসা। এটাই ক্রমে ক্রমে হাতাহাতির রূপ ধারণ করে। এবং এক পর্যায়ে হাইজাকার বাহিনীর ছেলেরা ওখানে ডিউটিরত দু'তিনজন জেল রক্ষীকে বেদম প্রহার শুরু করে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে জেলের নিয়মানুসারে রক্ষীগুলো বিপদ সংকেত জানিয়ে বাঁশী বাজাতে থাকে। আর এ বিপদসংকেত পেয়েই জেল গেটের ঘন্টি সব কারারক্ষীদের মহাবিপদের সংকেত দিয়ে পাগলের মত বাজতে থাকে বিরামহীন গতিতে। আর অমনি ছুটে এলো লাঠি-সোটা হাতে নিয়ে প্রায় তিন-চার শত জেল রিজার্ভ ফোর্স। শুরু হলো পাল্টা মাইরের পালা-বেদম প্রহার। সে সময় প্রায় চার পাঁচ শত লোক বাস করতো চার খাতায়। তাদের মধ্যে প্রায় শ'খানেক ছিল হাইজাকার। দ্বৈত যুদ্ধে লিপ্ত থাকলেও বেশী সময় টিকে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু দু'চার জন রক্ষী বেশ জব্দ হয়ে গিয়েছিলো। এই গন্ডগোল চলাকালে শান্তিপ্রিয় সুস্থ্য-মস্তিষ্কের রাজবন্দীদের কেউ কেউ দু'পক্ষকেই শান্ত করা ও গন্ডগোল মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছেন। স্নেহের ছোট ভাই শহীদ আনিস ছিলো তাদের একজন।

এ ছোট ভাইটি ঢাকা ইউনিভারসিটির ইকোনমিক্স অনার্সের ছাত্র। পরিবারের একজন সম্ভাবনাময়ী সদস্য ছিলো। মাদ্রাসা জীবন থেকে ইন্টারমেডিয়েট পর্যন্ত সব কয়টি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলো। অনার্স কোর্সের ক্লাসেও একজন ভাল ছাত্র হিসাবে তার খ্যাতি ছিলো। একজন সৎ, কর্মঠ ও সমাজসেবী হিসাবেও তার প্রচুর সুনাম। স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে বিপক্ষে কোনটাতেই ছিল না তার কোন ভূমিকা। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে ছাত্র সংঘকে সমর্থন যোগানোর অপরাধেই আর দশ ভাইয়ের মত তাকেও

www.pathagar.com

ভাগ্যবরণ করতে হয়েছে এ পাষাণ কারার। আনিসের মত একজন ধর্মভীরু সত্যনিষ্ঠ ও মেধাবী ছাত্রের জন্যে সংঘকে সমর্থন যোগানো ছাড়া দেশে আর ছাত্র দলই বা ছিলো কোনটা।

হাইজাকার ও জেল-রক্ষীদের মধ্যে মল্ল-যুদ্ধ চলাকালে মুসলিম বিদ্বেষী, কুটিলমনা জেলার নির্মলেন্দু রায়বাবু এলো অকুস্থলে। তার সাথে এলো রাইফেলধারী কিছু জেলরক্ষী। শুরু হলো গুলির গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। দক্ষিণ দিক হতে লোহার বেষ্টনীর ফাঁক দিয়ে চার খাতার বন্দীদের উদ্দেশ্যে চললো গুলি। শুধু হুকুম দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি মহামান্য রায়বাবু বরং নিজেও স্বয়ং চালালো গুলি। চলছে গুলি বিরামহীন গতিতে। উচ্ছৃংখলদের কবলে পতিত হয়ে দু'একজন রক্ষীর অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছিলো। অবিরাম ধারার গুলির শব্দ শুনে জেল প্রাচীর সংলগ্ন বাড়ীগুলোর ও একটি স্কুলের ছাদে উঠেও ঘটনা দেখছে অসংখ্য পুরুষ নারী।

এবার অবস্থা বেগতিক দেখে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হাইজাকাররা গুলি হতে বাঁচার জন্যে শুইয়ে পড়লো মাটিতে। ক্রলিং করে করে এদিক ওদিক সরে পড়লো ওরা। অন্যান্য বন্দীরাও উর্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে রুমে রুমে গিয়ে নিতে লাগলো আশ্রয়। কিন্তু ছোট দরজা ও দুতলা তিন তলায় উঠার সরু সিড়ি বেয়ে এতগুলো লোকের একত্রে দৌড়িয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া ছিল কত কষ্টকর ব্যাপার। এই সময়েই নিষ্ঠুরমতি রায়ের হুকুমে পরিচালিত নির্মম গুলির আঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালো তিনটি মূল্যবান প্রাণ। দেশবাসীর তথা মুসলিম মিল্লাতের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা, তামাদ্দুন-তাহাজিবের বিরুদ্ধে ছিলো না তারা। এ ছাড়া তো আর কোন অপরাধ ছিলে না এদের আর কোন অন্যায়। হাইজাকারদের বেদম প্রহারে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে একপাশে পড়েছিল একজন কারারক্ষী। গুলির শব্দ যখন সম্পূর্ণই থেমে গেলো। এ সময়েই সংজ্ঞালুপ্ত রক্ষীটির দেহ নজরে পড়লো ছোট ভাই শহীদ আনিসের তার অবোধ করুন মন সইতে পারলো না এ দৃশ্য। ছুটে গিয়ে সে ধরলো রক্ষীটিকে। সে সময় গুলিবিদ্ধ মুমূর্ষ লোকগুলোকে সরানো হচ্ছিলো মাঠ থেকে জেল হাসপাতালের দিকে। মরনজয়ী বীর শহীদ আনিস এ সময়ে এ কারারক্ষীটিকে নিয়ে এলো রায়বাবু সহ অন্যান্য রাইফেল বাহিনীর কাছে। এ কলহ দমনে স্নেহের আনিসের আপ্রাণ প্রচেষ্টার জীবন্ত সাক্ষী। স্বয়ং এ ঘোর বিপদের সময় ঘটনার ভয়াবহতাকে উপেক্ষা করে নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে মুমূর্ষ রক্ষীটিকে আর্তমানবতার খাতিরে রায়বাবুর কাছে নিয়ে যাওয়াটাই শহীদ আনিসের সরল প্রাণ, নির্দোষ মন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত প্রমাণ।

কিন্তু হায়। শহীদ আনিস কি তখন একথা জানতো মুসলিম বিদ্বেষী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র কুটিলমনা রায়ের রাইফেলের নলে তার যমদূত এসে অপেক্ষা করছিলো তার জন্যে। কারা প্রাচীরের বাইরে জাতির জন্যে যে অবদান সে রেখে আসতে পারেনি তার ক্ষতি পূরণ কারা প্রাচীরের এই নিরাপদ সীমানায় নিজের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দিয়ে-শাহাদাত বরণ করে। রক্ষীটিকে তাদের সামনে নেবার সাথে সাথেই রায়বাবুর সম্মুখে অপর একজন রক্ষী গুলি করলো আনিসের বক্ষ লক্ষ্য করে। মুমূর্ষ রক্ষীটি তার এ অবস্থায়ও আনিসের প্রাণ রক্ষা করতে চাইলেও পারলো না গুলির হাত হতে তাকে বাঁচাতে। বলেছিল সে আনিসের নির্দোষিতার কথা। কিন্তু রায় ও তার সঙ্গীরা কেউই তার কথায় ভ্রুক্ষেপ করলো না। সাথে

www.pathagar.com

সাথেই আনিস ভূতলশায়ী হলো। তার বুকের তাজা রক্তে লোহিত বর্ণ ধারণ করলো পাষাণ কারার একটি অংশ। কে বা কারা তাকে হাসপাতালে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল তার হদিস খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এ সময় হাসপাতাল সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জেলের কাজ-কর্ম সমাপণে ছোট ভাইগুলোর ভূমিকা ছিলো অন্যতম। এগুলি ছিলো তাদের সেবামূলক কাজ। হাসপাতালে সেবারত ভাইগুলো শহীদ আনিসের বুলেট বিদ্ধ লাশ, লাল রক্তে রঞ্জিত দেহ হাসপাতালে নেয়ার পর দেখে কাতরিয়ে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে খবরটি ছড়িয়ে পড়লো সারা জেলে। শোকাভিভূত হয়ে পড়লো জেলটি। শোকের কালোছায়া বুকে লয়ে আমাদের কাছও গিয়ে পৌঁছলে খবরটি। শোকে-দুঃখে ক্ষোভে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে উঠলাম আমরা। কিন্তু হায় শহীদ আনিসের প্রাণপাখী সে সময় এ জগতে আর নেই। ইন্নালিল্লাহে .....। তার জীবন সায়াহ্নে শেষ মুহূর্তগুলোতে গুড়ি গুড়ি করে কথা কয়টি বলে গিয়েছিল। সংক্ষিপ্তভাবে তার অন্তরঙ্গদের সাথে। তারাই তার নির্মম হত্যার সাক্ষী। জানিনা আনিস সহ অন্যান্যদের এই হত্যার মামলা গণ আদালতে দায়ের হতে পারবে কিনা? এই সাক্ষীরা সেই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জনসম্মুখে এ সত্য সাক্ষ্য পেশকরতে পারবে কিনা? মিথ্যার সব ব্যসাতি দূর হয়ে প্রকৃত সত্য খবর দেশবাসী জানাতে পারবে কিনা?

একটু পরেই দেখা গেলো ৪ খাতার মাঠে বিভিন্ন দিক থেকে ইট পাটকেল কুড়িয়ে কুড়িয়ে এনে ছিটিয়ে দেয়া হচ্ছে। সারাটি মাঠ ভরে ফেললো ইট দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই। প্রর্তক্ষদর্শীরা এ রহস্য তখনো বুঝে উঠতে পারেনি কিছুই। দুপুরের দিকে তৎকালীন আই, জি, অব প্রিজন-বিভাগীয় প্রধান ঢাকার ডি. সি. ঘটনাস্থলে আসলেন সরেজমিনে তদন্ত চালাতে। তদন্ত শেষে চলেও গেলেন তিনি। এবার ধূর্ত রায়কে বেশ হালকা হালকা বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে হয়েছে।

পরদিন সকালে সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় দেখতে পাওয়া গেলো চাঞ্চল্যকর ও বিস্ময়কর এক খবর ঃ "জেলরক্ষীদের গুলিতে ছয়জন নিহত" শিরোনামায় খবর পরিবেশন করা হলো-কুখ্যাত আলবদর-রেজাকাররা জেল রক্ষীদের উপর ইট-পাটকেল ছুঁড়ে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। খুব উচ্ছৃংখল হয়ে পালাবার জন্যে ইটপাটকেল ছুঁড়ে ছুঁড়ে প্রধান গেটের দিকে অগ্রসর হবার সময় জেল পুলিশ বাধা প্রদান করে। কিন্তু তাতেও নিবৃত্ত করতে অসমর্থ হয়ে অগত্যা কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। তাতে ছয়জন নিহত হয়। ঘটনাস্থলে নিহত তিন ব্যক্তি কোন উল্লেখও নেই।

এবার জেলার বাবুর চাতুরীপনা বুঝা গেলো অতি সহজেই। ইট ছিটিয়ে ছিটিয়ে মাঠ ভর্তি করার কারণ বুঝতে আর কারো বাকী রইলোনা। ডি. সি. সহ আই, জি, সাহেবকেও ঠিক এরূপই বুঝিয়েছে। অথচ মজার কান্ড এ যে, গুলি-গোলার পর যখন জেল রক্ষীরা মরিয়া হয়ে হাইজাকারদের খুঁজে খুঁজে ঠ্যাংগানো শুরু করলো তখন সকলেই বলতে শুরু করলো- 'না, না, না, আমি মুক্তি না, আমি রেজাকার। আলবদর রেজাকারা এ দুষ্কর্ম

www.pathagar.com

করিনি ইহা প্রতিষ্ঠিত সত্য বলেই একটু আগেও যে আলবদর-রেজাকারদের ঘৃণার চোখে, অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হতো এখন সে নাম ভাঙ্গিয়ে জীবন রক্ষার কাজে ব্যস্ত হলো তারা। অথচ এ সত্যকে জঘন্যভাবে মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে গোলাগুলির যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য দেশবাসীকে নতুন আর এক বিভ্রান্তিতে ফেলা হলো। পাপের কি পরাকাষ্ঠা! কি জঘন্য ষড়যন্ত্র!

সারা দেশে যখন আলবদর-জোকারদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত উপায়ে বিষোদগার ছড়াচ্ছিলো এ দেশের সংবাদপত্র সহ সব প্রচার যন্ত্র গুলো। ঠাঁই নেবার জন্যে যখন জেল ছাড়া এদের নেই এক বিন্দু জায়গা বাইরের জগতে আর জেলের ভিতরেও যারা জীবন্মৃত। টুঁ শব্দটিও যাদের ছিল না কোথাও। তারা নাকি জেল ভেঙ্গে পালাচ্ছিলো। প্রকৃত সত্যকে আমূল বিকৃত করে, জঘন্য মিথ্যা প্রচার করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার তাদের কি অন্তত ও পংকিল পাঁয়তারা! এ বিবেকহীনদের কি একটি বারও বিবেকের কাছে জবাবের জন্যে বিবেকের কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হয়নি-হবে না কোন দিন?

একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরের পর শেষ পরিণতি হিসাবে জেলকেই যখন ভাগ্যবরণ করে নিতে হলো তখন আমরা সব নির্যাতনকেই মেনে নিয়েছি। মেনে নিয়েছি সব অত্যাচারকে অতি সহজভাবেই। জাতির প্রকৃত কল্যাণের জন্যে, খাটি মহৎ, সৎ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাগরিক হিসাবে দেশের মঙ্গল সাধানের জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করেছি তার মূল্য, তার পুরস্কার একমাত্র খোদার নিকট প্রাপ্য। কিনতু দেশ ও জাতির এটাই যে প্রকৃত সেবা। স্বার্থসংরক্ষণের খাটি ও একমাত্র পথ। এতে ছিল না আমাদের দর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ। আর সন্দেহ ছিলো না বলেই সংখ্যা সল্পতার পরোয়া না করেও এক অসম্ভব রকম ঝুকি মাথায় নিয়ে কাজ করেছে। আর এ কারণেই এমন বিপর্যয়েও বিন্দুমাত্রও দুঃখ বা অনুতাপ করেনি। দেশবাসী মূল্যায়ণ করবে এ সঠিক সত্যকে একদিন তাই সব নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা ছিলো আমাদের সান্ত্বনার একমাত্র খোরাক। প্রকৃত সত্যকে লুকিয়ে রেখে যে বক্তব্য দেশবাসীর কাছে তাদের স্বার্থেই রাখা দরকার ছিলো তাতে তারা ভুল করেনি। তা যতই মিথ্যা, প্রবঞ্চনাময় ও ঘৃণ্যই হউক না কেন? পরিণতির প্রতি তাদের তাকানো প্রয়োজন ছিল না। এ ভাবেই তারা অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে বিভ্রান্ত করেছে সবাইকে। করেছে ভুল পথে পরিচালিত।

জেলখানার ভেতরে সেদিনকার ঘটনা সম্পূর্ণই বিকৃতরপে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়া-সংবাদ পত্রের নিরপেক্ষ প্রতিনিধিত্বের পরিচায়ক নয়।

ভুল ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করে জাতিকে অন্ধকারের অতল তলে নিমজ্জিত করে রাখার এ উজ্জল দৃষ্টান্ত। জাতির যদি ভুল সংশোধন নাও হয়, আমরা যদি চিরদিনই অবহেলিত হয়েই থাকি তবুও আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। সত্যকে আমরা সত্যই বলবো। আর মিথ্যাকে মিথ্যাই-তা যত অপ্রিয়ই হোক। পার্থিব কোন স্বার্থের জন্যেই ও পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হবো না এক তিলও। তা শত্রুরা যত শক্তিশালী হউক। কারণ, আমাদের পথই সত্য ও সুন্দরের পথ। ঐ পথের পথিকরা দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ,

www.pathagar.com

লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, ত্যাগ-তীতিক্ষা, অত্যাচার-অবিচার মাথা পেতে নেয় অতি সহজে একটি জাতিকে শক্তি ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলার এটিই হলো খাটি পথ। এ সত্য ও সুন্দরই হলো আমাদের অনুপ্রেরণার মূল উৎস। এ পথকে ঢেকে রেখে আর কতদিন তারা একটি জাতিকে প্রবঞ্চিত করবে। দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। আর কতদিন পংকিলতার গভীর গহ্বরে ডুবে থাকবে। এদের এ হীন কার্যক্রমের কোন হিসাব কি দিতে হবে না কোনদিন কারো কাছে?

তাজুদ্দিন সাহেবের সাথে কথোপকথন

১৯৭২ এর মার্চের পনর তারিখের পর থেকে জেলখানা বেশ সরগরম হয়ে উঠলো। এদিক সেদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। তেল লাগিয়ে মিশকালো করে ফেলা হচ্ছে লোহার শলার সব বেষ্টনীগুলো। ফুলের বাগানগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেমন কোন বর-কনের বাসর সজ্জা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজ-সজ্জার এ মহড়া দেখে মনে হচ্ছে রাজন্যবর্গের কারো শুভা-গমন ঘটবে। এখানকার সবজান্তা সিপাহীদের এক একজন এক এক রকম সংবাদ দিয়ে যান। ভাবখানা এমন যে 'আমি যা বলেছি এটাই হলো নির্ভুল ও খাঁটি সংবাদ।' আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় কর্তা ব্যক্তিটির সাথেই তার সরাসরি যোগাযোগ। এমনকি মাঝে মাঝে দেন দরবারও হয় তার সাথে। তাই কারো মুখে শুনতাম-"শেখ সাহেব আসছেন-যে ঘরে তিনি ছিলেন সে স্মৃতি দেখতে।" আবার কেউ বলছেন-"হোম মিনিষ্টার।" কেউ বলছে, "তাজুদ্দিন সাহেব।" এসব পরস্পর বিরোধী কথাবার্তাকে তখন জেলখানায় 'চৌকা গেজেট' বলে উপহাস করা হতো। তবে কেউ যে একজন আসবেন তা জেল কর্তৃপক্ষের হন্নে ভাব থেকে অনুমান করা যেতো। -এ রাজোচিত আয়োজন নিশ্চয়ই অনাহুত নয়।

২৭ মার্চ সকাল বেলা থেকেই শোনা গেলো আজ অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিন সাহেব আসবেন কারা পরিদর্শনে। তখন আমি ও বন্ধুবর এডভোকেট আনোয়ার সাহেব বাস করি একই সেলে। সকালে নাস্তা করার পর আমাদেরকে সেলেপুরে তালা বন্ধ করে দেয়া হলো। মনে হলো যেন তিনি এখনই আসছেন। আমরা দু'বন্ধু প্রায়ই নান দুঃখ সুখের কথাবার্তা বলেই সময় কাটাতাম। আজও সেভাবেই কাটছে আমাদের সময়। আমাদের ধারণা, আমাদের কারণে না হলেও অন্ততঃ আওয়ামী লীগের এম. পি এস. বি. জামান সাহেবের সাথে দেখা করতে তাজুদ্দিন সাহেব তশরীফ আনতে পারেন, আমাদের এ কুখ্যাত সেলে। জামান সাহেবও আমাদের এ কুখ্যাত সেলেরই বাসিন্দা। আওয়ামী লীগের নমিনিশনেই তিনি সত্তরের নির্বাচনে এম, পি, নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭০ এর বিাচনে দলের জন্যে তার কিছু আর্থিক অবদান আছে বলেও আমরা জানতাম। একাত্তরের গন্ডগোলের সময় ছয় দফাকে বজায় রেখে পাকিস্তান টিকে থাক-এ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবেই বোধ হয় তাকে আমাদেরই ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

যাক, আমরা প্রতিটি মুহূর্ত তার আগমন প্রতিক্ষায় সময় কাটাতে লাগলাম। কিন্তু কোথায়? বারটা, একটা পর্যন্তও কোন খোঁজ নেই। অবশেষে গোসল ও পানাহারের জন্যে আমরা সেল থেকে ছাড়া পেলাম। সব কাজ সমাধা করার পর আমরা যখন খাবারে মগ্ন তখনই শুনা গেলো তিনি আসছেন। একটু ত্বরা করে খাবার শেষ করে আমরা সেলের ভিতরে চলে গেলাম।

সব সেল দেখে আমাদের সেলের সামনে এলেন তিনি। আমি ও আনোয়ার সাহেব দু'জনই সে সময় সেল দরজায় লোহার শলা ধরে দাড়ানো। মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে রয়েছেন তখন জেল ডিপার্টমেন্টের সর্বোচ্চ ব্যক্তি–আই, জি থেকে শুরু করে ডি, আই, জি, জেলার, ডিপুটি জেলার, সেলে ডিউটিরতঃ জমাদার সিপাহী পর্যন্ত প্রায় একটি কাফেলা। তাজুদ্দিন সাহেব আমাদের সেলের ভেতরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই জেলার বাবু একটু তাড়াতাড়ি করে এসে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন–এ হলো আলবদর কমান্ডার খালেক, আর এ হলো রেজাকার কমান্ডার আনোয়ার। আমরা উভয়েই প্রতিবাদ করলাম। আমি বলে দিলাম, আমি জামায়াতে ইসলামী ঢাকা সিটির অফিস সেক্রেটারী ছিলাম। জেলার ইহিপূর্বেও কেউ আসলে এভাবে আমার পরিচয় করে দিতো। কোন সময় আমি প্রতিবাদ জানিয়েছি আবার কোন জায়গায় ছেড়েও দিয়েছি। আজ ছেড়ে দিলাম না।

তাজুদ্দিন সাহেবকে আজও আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি তার রাজনৈতিক আচরণের জন্যে। চুনো পুটিদের মতো ছিল না তার আচার আচরণ। মনে ক্ষিপ্রতা, রোষানল ও জেদ থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক আচরণ ছিলো তার বেশ মার্জিত। রাজনৈতিক অপরাধের মর্যাদা দিয়েই তিনি শুরু করলেন কথাবার্তা। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে বেশ ধৈর্য্যের সাথে কথা বললেন তিনি। অতটুকু শোভন আচরণ তাঁর থেকে প্রত্যাশা করিনি। আমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিলঃ

তাজুদ্দিনঃ–"কেমন আছেন আপনারা কোন অসুবিধে নেই তো?"

উঃ–"আলহামদুলিল্লাহ ভালই আছি।"

তাজুঃ– এ অবস্থায় খুব ভালো থাকার তো কথা নয়। থাকেন, একটু কষ্ট তো হবেই। এরূপ হয়ে থাকে। আমরাও কষ্ট করেছি। এই যে দরুন মুজিব নগরের কথা। ওখানে আমাদের কি–ই–না কষ্ট করতে হয়েছে। খাবার রসদ ছিল না, পরার কাপড় ছিলো না। শু'বার জায়গা ছিলো না। তারপরও আমরা ক্ষান্ত হইনি। আপনারা তো প্রচারণা চালিয়েছিলেন–"মুজিব নগর বলতে কিছুই নেই।" ওসব কথা সত্য ছিল না। আমরা মুজিবনগর থেকেই আমাদের সব কাজ চালিয়েছি। আমাদে সংগ্রাম ওখান থেকেই হয়েছিল পরিচালিত। পরিকল্পনাও আমাদের ওখানেই হতো।

উঃ–নীরবে শুনে যাওয়া।

তাজুঃ–আপনারা তো শুধু মানুষ মেরেছেন–বাঙ্গালী মেরেছেন–হিন্দু মেরেছেন। আপনাদের প্রোগ্রামই তো ছিলো শুধু মানুষ মারার প্রোগ্রাম, না খালেক সাহেব?

www.pathagar.com

উঃ-আমরা আপনাদের সাথে ফাতেমা জিন্নাহ ইলেকশনের সময় 'কপ্' কমবাইন্ড অপজিসন পার্টি করেছি। প্রো পি, ডি, এম, আওয়ামী লীগের সাথে মিলে পি, ডি, এম, করেছি। আবার সর্বশেষ 'ডাক' DAC-ডেমোক্রেটিক এ্যাকসন কমিটি করেছি। অতএব আমাদের প্রোগ্রামের সম্বন্ধে আপনি অবহিত থাকারই কথা।

তাজুঃ-প্রোগ্রামের তো পরিবর্তন হয়।

উঃ-আমাদের প্রোগ্রামের পরিবর্তন হয়নি।

তাজুঃ-আপনার বাড়ী কুমিল্লার হাজীগঞ্জে না? আমাদের নুরুল ইসলাম ও আপনাদের একই তো গ্রাম?

উঃ-জি, হাঁ। (তখন জেলার রায়বাবু মন্ত্রীমহোদয়ের গা থেকে মাছি তাড়াচ্ছিলো)।

তাজুঃ-আপনার ফ্যামিলির কোন খোঁজ খবর জানেন? তাদের তো বোধ হয় where about জানা যাচ্ছে না।

উঃ-আমি কোন খবর জানিনা।

তাজুঃ-প্রফেসার ইউসুফ আলীকে চিনেন?

উঃ-চিনি।

তাজুঃ- কি-ই-না মিথ্যে প্রচার প্রপাগান্ডা চালিয়েছিলেন তিনি আমার বিরুদ্ধে নির্বাচন কালে। আমি ধৈর্যের সাথে সব সহ্য করে গেছি। সব কিছুরই বিচার হবে। কাউকেও ছেড়ে দেয়া হবে না। আবার বিচার ছাড়া কাউকে শাস্তিও দেয়া হবে না। প্রত্যেককেই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে।

এড্ভোকেট আনোয়ার। আপনার এ সুন্দর জীবনটাকে নষ্ট করতে গেলেন কেনো? কেনো রাজাকার হলেন। এ দেশের হাজার হাজার লোক মারলেন আনোয়ার সাহেব?

আনোয়ার সাহেব তার সংক্ষিপ্ত উত্তরে বললেন-এসব মিথ্যে কথা। কোন কমান্ডার-টমান্ডার ছিলাম না। আমরা কোন অন্যায় কাজ করিনি।

অতঃপর তাজুদ্দিন সাহেব চলে গেলেন।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, জেলার কর্তৃক অন্যায়ভাবে আমার পায়ে লাগানো ডান্ডাবেড়ীটা তখনো আমার পায়ে ছিলো। আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিলো এটি বাইরের কারো হুকুম নয়। বরং জেলারেরই মনের জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্যে সে ইচ্ছাকৃত ভাবেই লাগিয়েছে। আমি কিন্তু ওই ডান্ডাবেড়ী তাজুদ্দিন সাহেবকে দেখালাম না। নিজের রাজনৈতিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্যে তা এমনভাবে লুকিয়ে রাখলাম যেন তার নজরে না পড়ে। তখনকার অসহায় অবস্থায় এছাড়া তো আর কিছু করার উপায় ছিল না। সেল এ্যারিয়র সেলে থাকতেন তখন পাকিস্তানের এক সময়ে আকটিং প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের স্পীকার মুসলীম লীগ নেতা চট্টগ্রামের মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরী। ৭ সেল ও পুরানা ২০ সেল সহ মিলে সেল এ্যারিয়ায় তখন থাকতেন

www.pathagar.com

মুসলীম লীগের অন্যতম নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খুলনার মরহুম আবদুস সবুর খান, পাবনার আবদুল মতিন, পাকিস্তানি জাতীয় পরিষদের ডিপুটি স্পিকার, চাঁদপুর মতলবের জনাব এ, টি, এম মতিন জামায়াতে ইসলামীর জনাব আব্বাস আলী খান ও মাওলানা এ, কে, এম ইউসুফ সহ আরো অনেকে।

জনাব তাজুদ্দীন সাহেব কারা পরিদর্শনে গিয়ে এ সেল এ্যারিয়ায়ও ভিজিটে যান। সেখানে মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে তাজুদ্দিন সাহেব কথা বলেন। কথা প্রসঙ্গে জনবা চৌধুরী সাহেব তাজুদ্দিন সাহেবের পীঠ চাপাড়িয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বলেন– "ওবা তাজুদ্দিন তোয়ারে হনে ফাডাইয়ে শেখ মুজিব না?" তাজুদ্দিন সাহেব মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন।

"ক্ষমতায় থাকা কালীন সময়ে আমরা জেল খানার কোন উন্নয়ন মূলক কাজ না করে ভুল করেছি। এখন ভীষন কষ্ট পাচ্ছি। তোমরা এ ভুলটি করোনা। এখন থেকেই বিদ্যুত পাখা লাগাও। টয়লেটের সুন্দর ব্যবস্থা করে নাও। তোমাদের কাজে লাগবে। কারণ এরপর তো তোমাদের পালা।

ঘটনাটি আমাকে সুনিয়েছে ১৬ বছরের প্রাণ চঞ্চল যুবক সম্ভবতঃ সর্ব কনিষ্ট সাথী কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামের আবুল হাশেম ভূইয়া। অফিসের কাজে নিয়োজিত থাকাতে সে অবাধে সব জায়গায় ঘুরতে পারতো।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস ১৯৭৫ সনের মধ্যেই এ তাজুদ্দীন সাব সহ আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের জেলে আসতে হলো আবার ওখানেই মৃত্যুও বরণ করতে হলো নির্মম ভাবে। মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবের কথা কিভাবে অক্ষরে অক্ষরে খেটে গেলো।

রিলিজ অর্ডার

২২শে ফেব্রুয়ারী, একজন সিপাহী, সাথী বন্ধুদের অনুরোধে সন্ধ্যার কিছু আগ পর্যন্ত সেল প্রকোষ্ঠের বাইরে দু'কদম পায়চারী করার সুযোগ দিয়েছিলো। আমি আনোয়ার সাহেব ও এস, বি, জামান সাহেব নিজ ভাগ্য, দেশের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিষয় নিয়ে নানা কথা আলাপ আলোচনা করতে করতে পায়চারি করছি–এমন সময় স্লিপ হাতে একজন সিপাহী এসে আমাদের এ সেলে প্রবেশ করলো। বাইরের মানুষের চেহারা আমরা কদাচিতই দেখে থাকি। এ জন্যেই একজন মানুষ দেখলে উন্মুখ পানে চেয়ে থাকে সবাই তার দিকে। ঝাড়ুওয়ালা ঝাড়ু দিতে এলে, পানিওয়ালা পানি দিতে এলে এমন কি সুইপারও তার কাজে এলে সবাই একজন মানুষ পেয়েছে বলে খুব খুশী হয়ে তার সাথে নানা আলাপ কথাবার্তা ও তার কাছে বাইরের খোঁজ খবর জানতে চাইতো। যেমন কোন কথা শুনেছো? বাইর থেকে কোন খবর এসেছে?–আজ বাইর থেকে কোন নতুন লোক এসেছে? –কেউ কোন সংবাদ দিয়েছে, ইত্যাদি। দু একজন অবশ্য এর কিছু ব্যতিক্রমও ছিলো।

www.pathagar.com

এখানকার কারুর দেখা সাক্ষাৎ থাকলে সিপাহীরাই এসে দেখা করাবার জন্যে নিয়ে যায় বেশীর ভাগ। এ কারণেই এ সিপাহীটিকে দেখেও আমাদের সকলের কৌতুহল বেড়ে গেলো। সকলেই চেয়ে আছি তার দিকে কিছু শুনার আগ্রহ নিয়ে। সে এসেই জিজ্ঞেস করলো–আবদুল খালেক পিতা আবদুল মজিদ বলে কেউ আছে এ সেলে? বাক্‌রুদ্ধ হয়ে আমি তাকিয়েই আছি শুধু তারদিকে এস, বি, জামান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার? কি আছে? উত্তরে সিপাহীটি বললো, রিলিজ অর্ডার আছে। সবাই বিস্মিত হলো। এত ঢাকঢোলের মধ্যে রিলিজ আসবে, একেবারে ছেড়ে দিবে এ কুখ্যাত লোকটিকে–এ যেন আমি ভাবতেই পারছিলাম না। কিন্তু তবুও যখন লোকটি বলছে–আমিই আবদুল খালেক বলে নিজকে প্রকাশ করলাম। আমার পরিচয়ের পর আমার দিকে দু'তিন বার তাকিয়ে সে জেলার সাবকে জিজ্ঞেস না করে আমাকে গেটে নিয়ে যেতে সম্মত হলো না। কারণ আমার পায়ে ডান্ডাবেড়ী দেখে সে ভয় পেয়ে গেছে। দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক বলেই নিশ্চয়ই ডান্ডাবেড়ীর ব্যবস্থা। কাজই এমন ব্যক্তিটিকে নিয়ে যেতে হলে আর একবার জেলার সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তাই সিপাহীটি চলে গেলো।

এবার আমার মুক্তির সম্ভাবনা দেখে সবাই আপনজনদের কাছে বলার জন্যে নানা সংবাদ বলতে লাগলো। আমি সকলের সংবাদই শুনছি। কিন্তু বিশ্বাসই আমার হলো না, আমি মুক্তি পাবো, জেলের বাইরে যেতে পারবো। সন্ধ্যার আগে সিপাহীটি আর ফিরে আসছে না। এদিকে মাগরিবের আযান হয়ে গেছে। লকআফ করার সময়। ডিউটির সিপাহীটি আমার রিলিজ সংবাদ বহনকারী সিপাহীটির ফিরে আসার অপেক্ষায় আমাকে লক্‌আফ করছে না। আমি বার বার বলছি আমাকে লক আপ করে দিন। সিপাহীটি আবার ফিরে আসবে এতেও আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। প্রকৃত সে আর এলোও না। তার ফিরে আসতে দেরী দেখে ডিউটিরত সিপাহীটি অগত্যা আমাকে সেলে বন্ধ করে দিলো। পরের দিন এক সময় কোন কাজে সে সিপাহীটি একবার আসলে এস, বি, জামান সাহেবই তাকে জিজ্ঞেস করলেন কালকের কারণটি। উত্তরে সে বললো–"জেলার সাহেব আমাকে বলেছেন–তাকে আনতে হবে না। আনার প্রয়োজন নেই।" এ রইস্য আমি আজও বুঝতে পারিনি।

পুলিশ কাষ্টোডিতে দ্বিতীয়বার

৯/৩/৭২ বারটার দিকে দুপুরের খাবার কিছুক্ষণ পূর্বে হঠাৎ কোর্ট সিপাহী গিয়ে উপস্থিত। আমাকে কোর্টে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে। এটাও আমার ব্যাপারে এক ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ কোর্টে নিয়ে যাবার জন্যে পূর্ব হতেই খবর দেয়া হয়। অন্ততঃ পক্ষে কোর্টের দিন সকালে তাকে স্লিপ দেয়া হয় কোর্টের। আমার ব্যাপারে তার উল্টো। রওনা হলাম তার সাথে কোন বাক্য ব্যয় ছাড়াই। 'ডান্ডাবেড়ী পায়ে চলছি জেল গেটের দিকে ঝুন ঝুন শব্দ করে। চারদিকের লোকজন তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। দু'একটি পরিচিত মুখও আমার নজরে পড়লো। তাদের বেদনাভরা দৃষ্টিতেই সহানুভূতির গন্ধ পেয়েছি। ডান্ডাবেড়ী

www.pathagar.com

সহকারেই কোর্ট হাজতে উপস্থিত হলাম। ওখানে ওই দিন আমার টি, আই প্যারড্ হলো। বেশ লম্বা আর একটা কোর্টের তারিখ নিয়ে ফিরে এলাম জেলে। খাওয়া দাওয়ার কষ্টের ব্যাপার এখানে বর্ণনা না-ই-বা করলাম। পরে বুঝতে পেরেছি প্রকৃত পক্ষে এদিন থেকেই আমার নামে নতুন করে কেস্ বানানো শুরু হয়। টি, আই প্যারড দিয়েই তার সূচনা। এ জন্যেই কোর্টের পরবর্তী তারিখে আমাকে কোর্টে না নিয়ে-নিয়ে যাওয়া হলো পুলিশ কাষ্টোডিতে। পুলিশ কাষ্টোডিতে যাবার কথা শুনে একটু চমকে উঠলাম। প্রায় দুমাস আগের পুলিশ কাষ্টোডির বিভৎস ইতিহাসের কথা মনে পড়লো। ওসব কথা তখন ভুলেই গিয়েছিলাম। বেলা বারটার দিকে কড়া পুলিশ পাহারায় নিয়ে যাওয়া হলো মালিবাগে। কিন্তু আজ এস, বি অফিসের পরিবর্তে নিয়ে গেলো C.I.D অফিসের নতুন এক মেহমানখানায়।

দো'তলার একটি নির্জন রুমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। রুমটার পরিবেশটাই কেমন যেন ভূঁতুড়ে ভূঁতুড়ে। একটু বিব্রত বোধ করে থাকলেও সাহস ছিল পুরো মাত্রাই। পূর্ব হতেই দু'জন অফিসার ওখানে ছিলেন বসা। একখানা চেয়ারের দিকে বসতে ইঙ্গিত দিয়ে একটা নতুন ফাইল হাতে তুলে নিলেন একজন অফিসার। তখনো আমার পায়ে 'ডান্ডাবেড়ী।' খুব ভদ্র ও শান্তভাবে অফিসারটি বললেন আমাকে-

অফিসারঃ-আপনার ইন্টেরোগেশন তো পূর্বেই হয়েছে একবার। সে ফাইলটাই ট্রান্সফার হয়ে এসেছে আমাদের কাছে। খুব বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন হবেনা আমাদের। তুবও যে কয়টা প্রশ্ন করবো আশাকরি তা ঠিক ঠিক ভাবে বলবেন।

আমিঃ-আমরা বেঠিক কথা বলিনা। মিথ্যা কথা আমরা জানিনা।

অফিসারঃ-তা আমি জানি। আপনিতো রোকন, না?

আমিঃ-জি হ্যাঁ?

অফিসারঃ-জামায়াতে ইসলামী রোকনরা মিথ্যা বলে না তা আমার জানা আছে। আচ্ছা, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন খালেক সাহেব?

আমিঃ-ঠিক চিনতে পারিনি, তবে কোথাও দেখেছি বলে মনে হয়।

অফিসারঃ-দেখেছেন, কয়েকবার দেখেছেন। আপনাদের ছিদ্দিক বাজারের অফিসে। আপনার সামনের টেবিলের পাশে বশেই অনেকবার চা টা খেয়েছি। আপনাদের পল্টনের সভায় গন্ডগোলের ব্যাপারে তদন্তের ভার পড়েছিল আমারই উপর। সেই উপলক্ষ্যেই কয়েকবার যেতে হয়েছিল আমাকে আপনাদের অফিসে।

আমিঃ-জি হ্যাঁ। মনে পড়েছে। আমিও এতক্ষণ ধরে মনে মনে খুঁজছিলাম আপনাকে। কিন্তু বের করতেই পারছিলাম না, কোথায় দেখেছি।

অফিসারঃ-আচ্ছা, আলবদরের সাথে আপনার কি সম্পর্ক ছিলো?

আমিঃ-কিছুই না।

অফিসারঃ-চৌধুরী মুইনুদ্দীনের সাথে আপনার কি সম্পর্ক?

www.pathagar.com

আমিঃ-একই দলের লোক, এই সম্পর্ক।

অফিসারঃ-তার বাড়ী কোথায়?

আমিঃ-নোয়াখালী বলে জানি।

অফিসারঃ-নোয়াখালীর কোন জায়গায়? ঠিকানা জানেন?

আমিঃ- না। ঠিকানা জানিনা।

অফিসারঃ-কতদিন থেকে আপনি জামায়াতে ইসলামী ঢাকা সিটির অফিস সেক্রেটারী?

আমিঃ-উনসত্তরের শেষের দিকে হতে আমি ঢাকা সিটি জামায়াতের অফিস সেক্রেটারী।

অফিসারঃ-শহিদুল্লাহ কায়সারের অপহরণ সম্পর্কে কি আপনি কিছু জানেন?

আমিঃ-কিছুই জানিনা। তাকে আমি জীবনে কোনদিন দেখিওনি।

অফিসারঃ-তাদের বাসা আপনার বাসা থেকে কত দূরে?

আমিঃ-বাসাতো আগে চিনতাম না। আমাকে গ্রেফতার করে তাদের বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর তাদের বাসা চিনলাম। আমার বাসা আগামসিহ্ লেনে আর তাদের বাসা গোলকপাল গাঙ্গুলি লেনে।

অফিসারঃ-তাদের সাথে আগ থেকেই আপনার কোন পরিচয় ছিলো?

আমিঃ-পরিচয় তো দূরের কথা। তাদের পরিবারের কোন লোককেই আমি জীবনে দেখিনি?

অফিসারঃ-সিনেমা দেখতেন?

আমিঃ-না।

অফিসারঃ-তারা আপনাকে টি, আই, প্যারডে সনাক্ত করলো কিভাবে?

আমিঃ-বাহ্‌রে! আমাকে এরেষ্ট করে তাদের বাসায় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা রাখলো। আমার সাথে কথা বার্তা বললো। পরিবারের সকলে মিলে আমার উপর নির্যাতন চালালো। তারপরেও টি, আই, প্যারডে সনাক্ত করতে পারবে না?

এসব নানা প্রশ্নের পর আমাকে অন্য কক্ষে নিয়ে কিছু সময়ের জন্যে রাখা হলো। জোহরের নামাজ ওখানেই আদায় করে নেই। বেলা তিনটার দিকে আমাকে আবার জেলে পাঠাবার সময় সে অফিসারটি বললেন-খালেক সাহেব একটি কথা বলছি। কোন পুলিশ অফিসার হিসাবে নয়-আপনার শুভাকাংখি হিসাবে। আর তা হলো এখন জামিনের চেষ্টা করাবেন না। কারণ President Order '50 নির্দেশ পঞ্চাশ অনুযায়ী এসব কেসের কোন জামিন হবে না। খামাখা উকিলদের পয়সা দিয়ে লাভ কি? আমরা তদন্ত করবো।

www.pathagar.com

এরপর কিছু পাওয়া না গেলে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দিবো। আপনি মুক্তি পেয়ে যাবেন। আর কিছু পাওয়া গেলে চার্জ সিট দেবো। কোর্টে কেস চলবে।

আমি শুভাকাংখীর উপদেশকে মাথা নেড়ে সমর্থন জানিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লাম–আমার আবাসস্থল জেলের উদ্দেশ্যে। এ অফিসার টি ছিলো ইনস্পেক্টর শামসুদ্দিন।

বিচার প্রহসন

আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ২২/১২/৭১ তারিখে। আর আমার কাছে মালিবাগ এস, বি, অফিসে কোতয়ালীর আই, ও (Ivestigation officer) এস. আই. আবদুল বারেক, শহিদুল্লাহ কায়সারের সহোদর জহির রায়হান সহ গিয়ে আমার গ্রেফতারের তারিখ জেনে নেয় ৬/১/৭২ তারিখে। অথচ F. I. R. এর তারিখ দেখানো হয়েছে ২০/১২/৭১ । অর্থাৎ একটা ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা দেখাবার জন্য। এর থেকেই বুঝা যায় যে শহিদুল্লাহ কায়সারের অপহরণের সাথে আমাকে জড়ানোর খেলা শুরু হয় আমারই গ্রেফতারের পরে। ৬/১/৭২ তারিখ হতেই আমার বিরুদ্ধে একটা বানোয়াট কেস দাঁড় করিয়ে। ইনস্পেক্টর বারেক ও জহির রায়হান আমাকে গ্রেফতারের তারিখ জিজ্ঞাসার থেকেই একথা প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সাথে সাথে মুক্তিবাহিনীর হাতেই ছিলো সব নিয়ন্ত্রণ।

পুলিশের হাতে কোন দায় দায়ীত্ব ছিলনা বলে অন্ততঃ ডিসেম্বর মাসে খুব বেশী কেস থানায় দায়ের হয়নি। আর একারণেই আমার গ্রেফতারের ১৬ দিন পরে এজহার করেও এর তারিখ দেখাতে পেরেছে ও দেখাতে হয়েছে। ২০/১২/৭১ তারিখে এজহার দিয়ে থাকলে আমাকে গ্রেফতার করতো পুলিশ, মুক্তিবাহিনী নয়।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে আমাকে গ্রেফতার করেছে ১নং সাক্ষী নাসির আহমদ ২নং সাক্ষী জাকারিয়া হাবিব সহ ৪/৫ জন মুক্তিবাহিনী পরে নাসিরকে মুক্তিবাহিনী হতে আলাদা করে বাদী হিসাবে দেখিয়েছে। আমার বিতলভারটিও নিয়েছে বাদী নিজে।

গ্রেফতারের পরই চললো ইন্টেরোগেশনের দীর্ঘ পালা। গ্রেফতারের দিনই শহিদুল্লাহ কায়সারের বাসায় তার স্ত্রী পান্না কায়সার সহ অনেকেই করলো নানা জিজ্ঞাসাবাদ। নির্য্যাতন ক্যাম্পেও চললো নানা প্রশ্ন। পরদিন থেকেই শুরু হলো পুলিশের প্রশ্নবানের অবিরাম ধারা। ৬ জানুয়ারী জেলে ফিরে আসার পর মনে করেছিলাম ওদের জিজ্ঞাসাবাদের নির্যাতন থেকে বাঁচা গেলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হলো না। এখানে জেল অফিসেও চলতে থাকলো জিজ্ঞাসাবাদের নির্মম ধারা। এই নিষ্ঠুর ধারার কঠিন নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটলো ১৯৭২ এর ২৪শে মার্চ সি, আই ডি–র ইন্টেরোগেশনের মাধ্যমে তাদের অফিসে।

গ্রেফাতারের পর আমার বিরুদ্ধে কেস দাড় করাবার পালা চললো অনেকদিন। এরপর ৩/৭/৭২ তারিখ থেকে চললো কোর্টে সাক্ষী। এসব দিনে বড় ভাই আবদুল আজিয়াল মজুমদার সহ শ্বশুর পক্ষের দু একজন আত্মীয় ছাড়া কোর্টে আর যারা থাকতেন তারা

www.pathagar.com

থাকতেন বেশ দূরে দূরে। আমি পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে বসতাম। নীচে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ধারা বিবরণী ও তাদের জেরা সন্নিবেশিত হলো।

১ই মার্চ নেয়া হলো আমাকে কোর্টে। এটাই ছিলো আমার প্রথম কোর্ট। কোর্টে হঠাৎ করে নেবার কোন কারণ বোধগম্য হয়নি তখনো। কোর্ট হাজতের দরজায় বার কয়েকই পুলিশ এসে আমার নাম ধরে ডাকলো। তখনো আমার পায়ে ডান্ডাবেড়ীর অলংকার শোভা পাচ্ছিলো। প্রতিবারই ওই অলংকারটির ঝন্‌ঝন্ ধ্বনি উটিয়ে হাজীর হতাম দরজায়। আমাকে এক নজর দেখেই চলে যেতো তারা। এদের এভাবে ডাকা আবার আমাকে দেখেই ফিরে যাবার গূঢ় রহস্য কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। অনুমান বেলা আড়াইটার দিকে আমাকে বের করে নিয়ে রাখলো কোর্ট হাজতের একটি নির্জন কক্ষে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো কয়েকজন বেশ বয়স্ক লোকও নিয়ে হাজির করলো আমার সাথে। একজনকে বলতে শুনলাম–"বোধ হয় টি, আই, প্যারড হবে।" তখনই বুঝলাম আজকের তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের কথা। টি, আই, প্যারড? তা হলে নিশ্চয়ই আমারই হবে। তাদের সেনাখৃতীকরণের সুবিধার জন্যেই ডান্ডাবেড়ীর সুন্দর অলংকার পরিয়ে চিহ্নিত করে আনা হয়েছে আমাকে। এ যে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র তা বুঝতে আর বাকী রইলো না কিছুই।

ক্ষণিক পরেই এলো সিভিল পোষাক পরিহিত একজন ভদ্রলোক। বেশ দূরত্বের ব্যবধান রেখে এক পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বুঝে ফেললাম ইনিই প্যারড পরিচালক ম্যাজিষ্ট্রেট। তার সাথে একজন পুলিশ। আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলে দিলো পুলিশটি–"এ হলো আসামী।।" তখনই আমি ঝট করে বললাম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে–"স্যার, আমাকে ২২/১২/৭১ তারিখে গ্রেফতার করে বাদীদের বাসায় নিয়ে রাখা হয়েছিল প্রায় তিনচার ঘন্টা। সকলেই আমাকে দেখেছে–আমার সাথে কথাবার্তা বলেছে। এরপরও আজ আবার ডান্ডাবেড়ী পরিয়ে আনা হলো আমাকে। এই অবস্থায় টি, আই, প্যারেডের তাৎপর্যতো বুঝে উঠতে পারলাম না।" মিনিট খানিক চুপ করে থেকে বললেন তিনি আমাকে –"আচ্ছা, এখন টি, আই প্যারড হয়ে যাক। বিচারের সময় আপনি হাকিমকেই বলবেন এ কথা।" খামুশ হয়ে যাওয়া ছাড়া তখন আমার আর কি করার ছিল। টি, আই প্যারড হয়ে গেলো। আট নয়জন বয়স্ক লোকের মধ্যে ডান্ডাবেড়ীর চিহ্নিত তাদের পূর্ব পরিচিত লোকটিকে সেনাখৃত করার মত সহজ কাজটি সমাধা হয়ে গেলো অতি সহজেই। ঠিক যে পোশাক পরিহিত অবস্থায় গ্রেফতার হয়ে তাদের বাসায় নেয়া হয়েছিলো ওইদিন, ডান্ডাবেড়ীর নতুন অলংকারটি ছাড়া আজ এই দিনেও ঠিক ওই পোশাক পরিহিত অবস্থায়ই টি, আই প্যারডে হাজির হলাম।

২৩শে মার্চ আবার কোর্টের তারিখ পড়লো। ডান্ডাবেড়ী পরিয়ে এনে একবার বাজিমাত করে গেলো আমার শত্রু পক্ষ। এ তারিখে আবার নতুন করে কোন ফ্যাসাদে ফেলে দেয় সে দুর্ভাবনায় পড়লাম। তখনো বাইর জগতের একজন প্রাণীর সাথেও আমার দেখা সাক্ষাৎ নেই। দ্বীনি ভাইদের কে কোথায় তা তো দূরের কথা, পরিবার পরিজনের কে কোথায় তারও খবর জানতাম না কিছুই। আমার সম্পর্কে তারা কিছু জানে কিনা সে সংবাদটিও জানি না। কোর্টে নেবার পালা শুরু হলে অনুমান করলাম কেস আরম্ভ হবে শীঘ্রই। তাই বাইরের

www.pathagar.com

লোকজনের সাথে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবণে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। এ সময়েই জানতে পারলাম, কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বাইরের লোকজনের সাথে পত্র যোগাযোগ করার বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে এখানে কিন্তু আমার মতো একজন কনডেমড বন্দীর পক্ষে কর্তৃপক্ষের অনুমতি অর্জন করা ছিলো রীতিমত এক দুরুহ কাজ। কিছুদিনের মধ্যেই সৌভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলাম ডি, আই, জি, অব প্রিজনকে আমাদের সেলে। সাপ্তাহিক ভিজিটে এসেছিলেন তিনি। অবশ্য কোন বন্দীকে চিঠি লেখার অনুমতি দিতে তার মত একজন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাকে চিঠি লেখার অনুমতি দিতে ইনিও ইতস্তত প্রকাশ করলেন। একটা চিঠি লেখার আবেদন জানালে তিনিও চুপ হয়ে গেলেন। তার এই সংশয় দেখে সানুনয়ে জানালাম আমার অসুবিধার কথা। বললাম–"স্যার আজ প্রায় তিন মাস যাবৎ একটি প্যান্ট ও একটি শার্ট পরে কালাতিপাত করছি। এর উপর আবার 'ডান্ডাবেড়ীর' এই নির্মম ও অভদ্রজনোচিত নির্যাতন। এ বেড়ীটা পরিয়েই টি, আই, প্যারড পর্ব সমাধা করে আনা হয়েছে। সামনে আবারও কোর্টের তারিখ পড়েছে। খুব শীগগীরই কেস শুরু হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমার কোন লোকজনকে এ সম্পর্কে জানাতে না পারলে কেসের তদবির তালাশী চালাবো কি ভাবে।

মাননীয় ডি, আই, জি সাহেব তাকালেন একবার জেলার বাবুর দিকে–"ঠিক আছে দিয়ে দিন না একটা পোষ্ট কার্ড। এস, বি,র মাধ্যমে সেন্সর হয়ে গেলে আমাদের অসুবিধে কি?। জেলার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। এ সময়ে একজন ডিপুটি জেলার এগিয়ে এসে আমার হিষ্ট্রি টিকেটে একখানা পোষ্ট কার্ড পাশ করে দিলো। এখন জেল অফিস থেকে এ কার্ডখানা আনার পালা। বলা বাহুল্য এ অনুমোদিত কার্ডকানা জেল অফিস থেকে আমার হাতে এসে পৌঁছতে লেগেছিল পুরো দু'টি মাস। দুঃখের সে এক ভিন্ন কাহিনী।

এলো ২৩শে মার্চ– আমার কোর্টের দিন। জনমানব সম্পর্কহীন একজন লোকের জন্যে সে সময়কার কোর্টের কষ্ট, ভুক্তভোগী ছাড়া কারো পক্ষে বুঝে উঠা কঠিন। দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা–গঞ্জনার সীমা না থাকলেও কোর্টে যেতে হবে তাই তৈরী হয়ে রইলাম নেয়া হলো না আমাকে কোর্টে। পরের দিন ২৪শে মার্চ হঠাৎ স্লিপ পেলাম পি, সি,র (Police Custody)

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ে গেলো সি, আই, ডি, অফিসে। চললো আবার নতুন করে ইন্টেরোগেশন। এ যেন কাবুলীওয়ালার রোমাঞ্চকর কিস্‌সা–প্রতিবারেই "ফের চে শুরু।" কিন্তু আমার তো করার কিছু নেই। এখান থেকে আরম্ভ হলো আমার বিরুদ্ধে শেষ চক্রান্তের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা।

কোর্টের পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করা ব্যতিরেকেই মে'র ৩ তারিখ হঠাৎ করে আবার কোর্টে নেয়া হলো। এবার কোর্ট হাজতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলাম না। বাম হাতে শিকল পরিয়ে নিয়ে উঠালো স্পেশাল ট্রাইবুনাল প্রধান জনাব হান্নান চৌধুরী সাহেবের কোর্টে। আত্মপক্ষ সমর্থন করবো কিনা, সময়ের প্রয়োজন আছে কি? জিজ্ঞেস করলেন চৌধুরী সাহেব। কিছু 'সময়' চেয়ে নিলাম। জনাব হান্নান চৌধুরী শান্তচেহারায় আমাকে যে প্রশ্ন

www.pathagar.com

করেছেন তাতে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। আবার সে শিকলপরা অবস্থায় লোকের ঔৎসক্যের দৃষ্টি ভেদ করে কোর্ট হাজতে এলাম ফিরে। সত্য কথা বলতে কি সে সব সময়ে শিকল পরতে আমার খারাপ লাগতোনা। সত্যের পথের পথিকদের পাওনা, এই–ই–ইতিহাসের এ এক অমোঘ বিধান। তাই এ ব্যাপারে কোন রকম জড়তা, লৌকিকতা বা কোন রকমের দুর্বলতা আমার মনে স্থান পেতো না। অবশ্য পথচারিদের দু'একটা অশ্লীল মন্তব্যে ব্যথা পেতাম মনে।

এরই মধ্যে সম্ভবতঃ মে' মাসের প্রথম দিকে আমার বড় ভাই জনাব আবদুল আওয়াল মজুমদার এলেন আমার সাথে দেখা করতে। তার দেখা করারও একটা কাহিনী আছে। আমার সাথে সাক্ষাৎ করার কথা শুনেই আতকে উঠেছিলো জেলার নির্মলেন্দু বাবু। নানা অশ্রাব্য মন্তব্য করে বসলো সে। সহোদর ভাই। একজন নিরপরাধ সহোদরের এমন তীক্ষ্ণিহীন কুৎসা বরদাস্ত করতে পারলেন না। পরিণতিতে কিছুটা বাক–বিতন্ডা ঘটেই বসলো। অবশ্য I. G. অফিসের যে ভদ্রলোকটির ছত্রছায়ায় এখানে আসতে পেরেছিলেন তার মধ্যস্থতায় বেশী দূর গড়াতে পারেনি ঘটনাটি। অবশেষে তার সাথে দেখা আমার হলো। তিনি হলেন তৃতীয় ব্যক্তি, গ্রেফতারের পর বাইরের জগতের যাদের দেখতে পেলাম। এর মাত্র কয়েকদিন আগে ছোট চাচা জনাব আবদুল বাকী মজুমদার ও তার বড় ছেলে আবদুর রব মজুমদার কে কারাজীবনে প্রথমবারের মতো দেখতে পেয়েছিলাম। তাদের দেখার মাধ্যমেই দুর্গত জীবনের নিদারুণ কষ্টের কিছুটা লাঘব ঘটলো। বড় ভাই সংবাদ পত্রের মাধ্যমে আমার মামলার সংবাদ পেয়ে পটুয়াখালী হতে ছুটি নিয়ে ছুটে এসেছিলেন ঢাকায়–সহোদরের ঘোর দুর্দিনে তমাচ্ছন্ন জীবনের কোন সুরাহা বের করার তদবিরে। তাকে দেখে ভেঙ্গে না পড়লেও মনের দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। লোহার ডান্ডার দুষ্ট বেড়ী তার দৃষ্টি হতে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেও ঝন্ ঝন্ শব্দের জন্যে তা পেরে উঠলাম না। অশ্রুসজল নয়নে আমার পায়ের দিকে তাকালেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই তার সাথে আলাপ আলোচনা ও কুশলবার্তা বিনিময় করলাম।

মামলার জরুরী সব কাগজ পত্রের নকল সংগ্রহ করে বহু কায়–ক্লেশে আর একদিন আসলেন তিনি আমার সাথে দেখা করতে। বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা দিলেন তিনি আমাকে। সব নকলপত্র দেখে নামজাদা উকিলেরা নাকি আমার কেস টেক্‌আপ করতে খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছে। বহুদিনের ঢাকঢোল পিটানো একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মামলার ক্রেডিট নেবার প্রত্যাশী হয়ে উঠেছে অনেকেই– "একটা বানোয়াট কেস"। এ নাকি ছিলো সকলের মন্তব্য। তাছাড়াও দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যে সব আজগুবি, অলীক ও উদ্ভট কাহিনী প্রচার করেছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচার যন্ত্র তার কিছুরই উল্লেখ নেই F. I. R এ। কাগজ পত্রের প্রচারের সাথে কেসের নাকি কোথাও নেই কোন সামঞ্জস্য। খবরটি শুনে যারপরনাই প্রীত হলাম। পরবর্তী অবস্থার কথা তাড়াতাড়ি অবহিত করাবেন কথা দিয়ে ওই দিনের মতো বিদায় নিলেন তিনি।

উদগ্রমনে দিন গুণে চলছি কারান্তরালে ভাইয়ের পরবর্তী সাক্ষাৎকারের জন্যে। কেসের পরবর্তী ডেভলাপমেন্ট শোনার নিমিত্তে। কিন্তু তিনি আসছেন না। চিন্তিত হয়ে উঠলাম তার

www.pathagar.com

কোন অমঙ্গল আশংকায়। অতঃপর তিনি এলেন একদিন অত্যন্ত বিষন্নমুখে। তার চেহারায় দুশ্চিন্তার কালোছায়া লেপটে রয়েছে। সারা জীবনই তাকে একজন সাহসী লোক বলে জানতাম। সহজে কোন কিছুতে ঘাবড়িয়ে যাবার লোক নন তিনি। তাই বিষাদমাখা মলিন চেহারা দেখে চিন্তিত হলাম। সংবাদ কি জানতে চাইলে চেপে যেতে চাইলেন। তাকে মৃদু স্বরে বললাম–যে কোন পরিণতির জন্যেই তৈরী আছি। নির্যাতন–শাস্তি, সে দৈহিক হোক আর মানুসিক যত প্রকার হতে পারে, কোনটিরই বেশী কিছু বাকী নেই। এদের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ শাস্তি যেটি সেটির জন্যেও প্রস্তুত আছি। আসলে এটিতেই তো নিহিত রয়েছে আমাদের প্রকৃত মুক্তি। আমি ঘাবড়াবো না, ভীতও হবো না। কাজেই খুলে বলতে পারেন ব্যাপারখানা কি? বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জানালেন বড় ভাই– "একজন উকিলও এখন আর কেস নিতে সম্মত হচ্ছে না।" মাত্র কয়েকদিন আগে যেখানে সবাই কেস করতে এত উৎসাহী ছিলেন সেখানে সে উৎসাহে এত ভাটা পড়ার কারণ কি জানতে চাইলে বললেন তিনি–কে বা কারা নাকি গোটা উকিল 'বার'কে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে দিয়েছে–"এ কেস করলে জীবন নাশের সম্ভাবনা রয়েছে।" তাই সাহস করে কেউ মামলা পরিচালনায় এগিয়ে আসতে রাজী হচ্ছে না। প্রকৃত ব্যাপারে কেস যা–ই হউক জীবনের রিস্ক নিয়ে আমার পক্ষ সমর্থনে কেউ সম্মত হচ্ছে না।–"তবুও–আমার জীবন থাকতে তোমার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি হবে না।" আমার প্রবোধের জন্যে এমন সান্তনা দায়ক কথার প্রয়োজন না থাকলেও বড় ভাই সুলভ ভঙ্গীতে শেষের বাক্যটি উচ্চারণ করলেন তিনি। তার আশ্বাস বাণীতে শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিতে ওই দিনের মতোও বিদায় দিলাম বড় ভাইকে।

ট্রাইবুনাল প্রধান মাননীয় হান্নান সাহেবের কোর্ট হতে জনাব এফ, রহমান, এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট জাজের কোর্টে এলো আমার কেসটি ট্রান্সফার হয়ে। যথা সময়ে শুরু হলো সাক্ষী। বহু চেষ্টা সাধনার পর এড্‌ভোকেট শাফকাত হোসেন ও এড্‌ভোকেট তাওসির আহমদ নিযুক্ত হলেন আমার কেসে। ১৯৭২ এর ২রা জুলাই হতে নিয়মিত চলতে থাকলো সাক্ষীদের জবানবন্দী। অনবরতঃ ১৩ দিন চললো সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরা। সর্বমোট ১৩জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করলেন আমার বিরুদ্ধে। তাদের দাবী হলো আমি একজন আলবদর কমান্ডার। আমার পুরোহিত্যেই শহিদুল্লাহ কায়সারকে বাসা হতে অপহরণ করা হয়েছে। আর বাসার প্রায় সকলেই এ কাজ সমাপণ হতে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছে আমাকে। অথচ প্রকৃত ব্যাপারে এই যে, না আমি শহিদুল্লাহ কায়সারকে জীবনে কখনো দেখেছি, আর না ইমাম ও বাড়ীওয়ালা ছাড়া সাক্ষীদের কেউ তাদের জীবনে আমাকে কখনো দেখেছে। এমন কি আমি যে এ কাজ করিনি এতেও তারা সকলেই স্থির নিশ্চিত। তবুও আমাকে ফাসাতেই যে হবে। আমাকে জড়াতেই হবে। আমার অপরাধ শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করা নয় বরং বিপরীত বিপ্লবী জীবনাদর্শের সাথে শরীক থাকাই আমার অপরাধ। মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার রুটি রুজির বিহিত ব্যবস্থা করা, নিখিল বিশ্বে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপ্লবী মতাদর্শ দুনিয়াব্যাপী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তাদের সাথে জড়িত থাকাই আমর একমাত্র অপরাধ। এ অপরাধই আমাকে ফাসাবার জন্যে তাদের

www.pathagar.com

এক সুবর্ণ সুযোগ। এ আন্দোলনের একজন কর্মীকেও নিঃশেষ করতে পারলে তারা অপরিসীম খুশী। এতেই তাদের অনেক লাভ। কারণ তারা ভাভারী গোষ্টি ও নাস্তিক।

আমাদের উল্লেখযোগ্য কোন লোক, গ্রেফতার না হওয়াতে আমারই উপর পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে তাদের। এ জন্যেই জঘন্য ও ঘৃণ্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে একটা জলজ্যান্ত ও বানোয়াট ঘটনা তৈরী করে মরণপণ চেষ্টায় জড়াতে থাকলো আমাকে এ কেসের সাথে। আর এ অপকর্মের জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিলো আমাকে আলবদর প্রমাণ করার। তাই সকল প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি তারা। শহিদুল্লাহ্ কায়সারের পরিবারের সব সাক্ষী ছায়াছবি নির্মান পরিকল্পনার মত এতে কাজ করেছে। একটা অন্ধ মতবাদের পুরা নাস্তিক গোষ্ঠী, দেশী বিদেশী চক্রান্তের বহু কর্মকুশলী ও কুটিল বুদ্ধির সুচতুর লোকজনেরা আমাকে ফাসাবার কাজে ছিলো ব্যস্ত। দীর্ঘ শুনানীর পর ২৪২ সি, আর, পি, সি, ধারা মতে আমার বিরুদ্ধে ২টি চার্জ গঠন করে আমাকে শুনালে আমি উভয় চার্জে নির্দোষ বলে দাবী করলাম।

ছায়াছবির জগতের এক এক দিলপাল নিজেদেরকে প্রগতিবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা বলে দাবী করতে করতে উষ্ঠাগত প্রাণ। অথচ একটা মিথ্যা বানোয়াট মামলায় জেনে শুনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের এমন একজন নির্দোষ নিরপরাধ লোককে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে সত্য কথা বলার শপথ নিয়ে এতসব মিথ্যা কথা বলে জড়ালো যাকে তার সাথে ঘটনার কোন সংযোগ নেই। এতসব মিথ্যা কথার পরও প্রগতিবাদী আন্দোলনের মান একটুও ক্ষুন্ন হয়নি। মিথ্যার প্রলেপের কোন কাজ আদর্শের স্থান অধিকার করতে পারে কিনা তাদের নিকট জিজ্ঞাসা। তা যত বড় শত্রুর বিরুদ্ধেই হউক না কেন? মিথ্যুকেরা হতে পারে না কোন আদর্শের পতাকাবহী। চরিত্রহীন ও মিথ্যুকরা কোন আদর্শের দাবীদার হলে নিঃসন্দেহে প্রামানিত হবে সে আদর্শের অন্তঃসার শূন্যতা ও অসারতা। স্বয়ং বাদী-সাক্ষী শহিদুল্লাহ কায়সারের ছোট বোন শাহানার স্বামী নাসির (এখন তালাক প্রাপ্ত, তার কিছু সহযোগী সহ মাণীবাগ হতে গ্রেফতার করে আনলো আমাকে। শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ীতেই নিয়ে রাখলো প্রায় ৩/৪ ঘন্টা। নির্যাতন ক্যাম্পে নিলো। ওখান হতে একজন ভারতীয় সামরিক ব্যক্তির হাতে নানা লঘু লাঞ্ছনা খেতে খেতে সেক্রেটারীয়েটে নিয়ে গেলো আবার। এখান হতে নির্যাতন ক্যাম্পে আনলো ফিরিয়ে। নির্যাতন চালালো পুরোটা দিন। এরপরও আদালত কক্ষে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার উকিলের এক জেরার জবাবে বললো-"আমি জানিনা কারা তাকে গ্রেফতার করেছে এবং কোন ক্যাম্পের ছেলেরা তল্লাশী করেছে তার বাড়ী। অথচ শহিদুল্লাহ কায়সারের ছোট ভাই জহির রায়হান, জাকারিয়া হাবিব সহ সে নিজে আমার বাসার সব জিনিষপত্র লুটপাট করেছে। টাকা পয়সা নিয়েছে। কয়েকটি সার্টিফিকেট সহ আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র ও বই পুস্তক সরিয়ে নিয়েছে। ক্যাম্পে কথা কাটাকাটির সময় সে নিজেই এসব কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছে। আমার সম্মুখ দিয়েই আমার গ্রেফতারের দিন আমার বাসা হতে লাইসেন্স করা আমার রিভলবারটি এনে পকেটে পুরেছে। অথচ এজলাসে দাঁড়িয়ে বলে গেলো-"রিভালবারটি মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা উদ্ধার করেছে এবং ওটা তারাই নিয়ে গেছে।"

www.pathagar.com

১৯৬৪ সাল হতে শুরু করে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত ছয় বছরের ডায়রীসহ রাষ্ট্র বিজ্ঞানে আমার এম, এ, পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বের সব নোটগুলিকে তারা আমার আলবদর কমান্ডার হবার দলিল হিসাবে চিত্রিত করতে চেষ্টা করলো। এ প্রসঙ্গেই তারা বললো–"তার ঘর তল্লাসী করে অনেক গোপন দলিল ও কাগজপত্র পাওয় গেছে।" এ সম্পর্কে বিজ্ঞ ট্রাইবুনাল জাজ স্বয়ং জিজ্ঞেস করলেন–

জাজঃ–সে কাঁগজ পত্রগুলো কোথায়?

উত্তরঃ–সেগুলো প্রেস ক্লাবে জহির রায়হান সাহেবের অফিস কক্ষে ছিলো? তার নিখোঁজ হবার পর ওগুলোর আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

হাকিমঃ–জহির রায়হান তো নিখোঁজ হলো। কিন্তু প্রেস ক্লাব তো আর নিখোঁজ হয়নি। কাগজপত্রগুলো তো অন্ততঃপক্ষে সাবমিট করতে পারতেন। ওগুলো সাথে করে নিয়ে তো ওনি আর নিখোঁজ হননি।

এবার সাক্ষী প্রবর খামুশ হয়ে পড়লো। একথা থেকে বুঝতে আর কারো বাকী থাকার কথা নয় যে, কেসটিকে সিরিয়াস করার নিমিত্ত আমাকে ভাল করে ফাঁসাবার জন্যেই মিথ্যে মিথ্যিভাবে আমার ওই ব্যক্তিগত কাগজপত্র গুলোকেই তারা আলবদর কমান্ডার হবার দলিল হিসাবে প্রমাণ করতে চেয়েছে। ওগুলো তো আর হাকিমের সামনে পেশ করা যাবে না তাহলে তো সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে। তাই জহির রায়হান এর নিখোঁজের নাম দিয়ে ওগুলোকেও বেমালুম হজম করে ফেলেছে। ঠিক এ ব্যাপারটিই ট্রাইবুনাল জাজ নিজে সি, আই, ডি, ইন্সপেক্টর শামসুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ

জাজঃ–আলবদর দলিলপত্র হিসাবে যে কাগজপত্রগুলো পাওয়া গিয়েছিলো ওগুলো আপনি দেখেছেন?

ইন্সপেক্টরঃ–দলিল পত্র পাওয়া গিয়েছে বলে আমি শুনেছি কিন্তু আমি দেখিনি।

জাজ? -আসামীর বাড়ীতে আপনি যাননি?

ইন্সপেক্টরঃ– গিয়েছি, তবে বাসার ভিতরে প্রবেশ করিনি।

জাজঃ–সে কাগজ পত্রগুলো কোথায় গেলো?

ইন্সপেক্টরঃ–শুনেছি জহির রায়হানের চেয়ারম্যানশীপে বুদ্ধিজীবি হত্যার একটা তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিলো। তার অফিস ছিলো প্রেস ক্লাবে। ওখানে ছিলো ওগুলো। ৩০শে জানুয়ারী তিনি নিখোঁজ হন।

জাজঃ–প্রেস ক্লাব তো ওখানেই আছে, ওটা তো আর নিখোঁজ হয়ে যায় নি। প্রেসক্লাবে ওগুলোর খোঁজে আপনি গিয়েছিলেন কি?

ইন্সপেক্টরঃ–গিয়েছিলাম স্যার, রুমটি আন্ডার লক্ এন্ড কি ছিলো।

জাজঃ–আন্ডার লক্ এন্ড কি! তালা খুলেন নি!

www.pathagar.com

ইন্সপেক্টরঃ-না, স্যার।

জাজঃ-কেন? তালা খোলার চাবি কি ঢাকায় ছিলো না?

ইন্সপেক্টরঃ-চুপ।

এসব কথা কাটাকাটি হতে দিবালোকের মত একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আলবদর হবার কোন দলিল-পত্রই ছিল না তাদের কাছে। আর থাকবেই বা কোথা হতে? তাই এতসব গোজামিলের অবতারণা করেছে তারা পবিত্র আদালত কক্ষেও।

বাড়ীর সকল সাক্ষী গুলোই এক এক করে বলে গেলো, দুষ্কৃতিকারীরা দরজা ভেঙ্গে বাড়ীতে প্রবেশ করার সাথে সাথে তারা সকলেই স্ব স্ব কামরায় বিজলী বাতি জ্বালিয়ে দিলে ঘর আলোর ঝলমল করতে থাকে। অতএব এ উদ্ভাসিত আলোতে দুষ্কৃতিকারীদের একজনকে তাদের চিনে রাখতে অসুবিধা হয়নি। কি মজার ব্যাপার! যে লোকটিকে ঘটনাচক্রে গ্রেফতার করেছে শুধু তাকেই চিনে রাখতে পারলো তারা, আর একজনকেও চিনতে পারলো না। এ যেন পূর্ব পরিকল্পিত এক ষড়যন্ত্র। যে সি, আই, ডি ইন্সপেক্টরের যোগ্য ষড়যন্ত্রে মাত্র ৩ মাসের মধ্যে এ বিখ্যাত মামলাটি একটা ভয়ংকর রূপ নিয়ে দাঁড়াতে পারলো। সে সি, আই, ডি ইন্সপেক্টরকে আমার উকিল ও প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "না তাদের কেউ-ই আমার কাছে ঘরে বিজলী বাতির সুইচ অন্ করে দিয়েছে-এ কথা বলেনি।" অতএব আমাকে দেখেছে প্রমাণ করার নিমিত্ত তাদের সকলের এক যোগে বিজলী বাতি জ্বালিয়ে দেবার কথাটা যে একটা ডাহা মিথ্যা ও বানানো ষড়যন্ত্র মূলক ব্যবস্থা এ সহজ কথাটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হবার কথা নয়।

এক সুযোগ্যা নাস্তিক বাম-মনোভাবাপন্না পরিত্যাক্তা মহিলা সাক্ষী তার নির্দিষ্ট আসনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তীর্যক কটাক্ষ করে বললো-"আমার ভাইকে অপহরণকারীর চেহারা আমি ভুলব না। ভুলতে পারি না। তার গালের সে তিলক আমি আজও ভুলিনি। ভাইকে নিয়ে যাবার সময় তাকে ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করলে এক পর্যায়ে তার সাথে আমার ধস্তাধস্তি হয়। তখনই তার গালের সে তিলকটি আমি স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছি।" অথচ এ কথাটিই সি, আই, ডি-ইন্সপেক্টরকে জেরার সময় আমার উকিল জিজ্ঞাসা করলে, তিনি উত্তরে বললেন-"না তিলকটি ছিলো বলে কোন সাক্ষীই তাদের ষ্টেটমেন্ট নেবার সময় আমার কাছে বলেনি।'

ঠিক এ সাক্ষীটিকেই আমার উকিল জিজ্ঞেস করলেন-"আচ্ছা আপনার ভাইকে নিয়ে যাবার সময় আসামীর সাথে যে আপনার এক পশলা ধস্তাধস্তি হলো এ কথাটা আপনি পুলিশ অফিসারের নিকট বলেছিলেন কি? 'হাঁ' এবং 'না' দুরকম উত্তরই আমতা আমতা করে বেরিয়ে পড়ছিলো তার ঠোঁট বেয়ে। কিন্তু তখনো ঠিক করে উঠতে পারছিল না কোন্‌টি হবে তার জন্য সঠিক জবাব। তাই ইতস্ততঃ করতে করতে অতি সত্য কথাটিই অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লো তার মুখ দিয়ে। বলেই ফেললো,-"ষ্টেটমেন্ট নেবার জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোন পুলিশ অফিসারই যায়নি আমার কাছে" হাকিম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন-কি! পুলিশের কোন লোক যায়নি আপনার কাছে? ভদ্র মহিলা এবার ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে গেলেন। আমার উকিল

www.pathagar.com

ও জাজের একত্রে চমকিয়ে উঠা ও মহামান্য পি, পি, সাহেবের চোখের ইশারা হতে সুচতুরা বুঝে গেলো– তার এ উত্তর ঠিক হয়নি। এবার তাই ঝট করে বলে দিলো–"দেখুন আমি সে সময় খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলাম। কাজেই ওখানে কে গিয়েছে না গিয়েছে, পুলিশের কাছে কি বলেছি না বলেছি আমর মাত্রও মনে নেই।"

সাক্ষীদের এ ধরনের জবাব দেয়া উকিল সাহেবানদের একটা বাতলিয়ে দেয়া কৌশল মাত্র। বিপক্ষীয় উকিল জেরার সময় কোন প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর নিরুপণ করতে না পারলে চট করে বলে দিতে হবে– 'আমার মনে নেই।'–'খেয়াল নেই'–'আমি বলতে পারি না।" 'আমি স্মরণ করতে পারছিনা' ইত্যাদি। একটা জলজ্যান্ত বানোয়াট কেসে তাই আমার উকিলের জেরার প্রায় সব কয়টি প্রশ্নের উত্তরেই এ অভিনয় করতে হয়েছিলো সুদক্ষ সব সাক্ষীগুলোকে। যদিও কেস শুরু হবার পর দিনই কোন অদৃশ্য মুখের ধমকের সামনে ভীত হয়ে আমার উকিল সাহেব জেরা করার মোক্ষম পয়েন্ট গুলো ছেড়েই দিয়েছিলেন। সুক্ষ্ম জেরার ফলে মিথ্যে মামলাটিই উৎসন্নে যাবার লক্ষণ দেখে পর্দার আড়াল থেকে জীবন নাশের ধমক দেয় হলো আমার উকিলকে। স্বাভাবিক কারণেই ঘাবড়িয়ে গেলেন আমার উকিল।

প্রথম সাক্ষী নাসির বলে গেলো–"আসামীকে গ্রেফতার করেছে মুক্তি বাহিনী। তার রিভলবারটিও নিয়েছে তারাই।" অথচ একটু আগেই হাকিমের সামনেই সে বললো, পাড়ার মসজিদের ইমামের কাছে এই এলাকার জামায়াতে ইসলামীর একজন লোক আছে সংবাদ পেয়ে শহিদুল্লাহ কায়সারের ছোটভাই জাকারিয়া হাবিব অন্যান্য লোকজন সহ আমরা যাই তার বাড়ী। বাসায় পাইনি তাকে।" তাদের এই অনুসন্ধান কার্য থেকে এ কথা কি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না যে, তারাই আমাকে গ্রেফতারের পর উঠিয়েছে তাদের বাড়ীতে। আর ঠিক এ কারণেই টি, আই প্যারেডে আমাকে সেনাখত করতে পেরেছে অতি সহজ ভাবেই তারা।

এখানে আরো একটি রহস্য আছে, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এই সাক্ষীটিই বললো–"বাইশে ডিসেম্বর আসামীকে গ্রেফতার করার পর ইন্টেরোগেশনের মাধ্যমে তার কাছে একটি রিভলবার আছে বলে মুক্তি বাহিনীর কাছে সে স্বীকার করে। এবং তা মিট্‌সেফে আছে, বলেও জানায়। ওখান হতেই ওই দিন ৪৪ রাউন্ড বুলেট সহ রিভলবারটি উদ্ধার করে।" অথচ এ সাক্ষীটি একটু পরেই হাকিমের কাছে অন্য এক প্রসঙ্গে আবার বললো–"সতরই ডিসেম্বর তার বাড়ী তাল্লাসী করে 'বুলেটগুলো' আমরা পাই।" মুহূর্তের মধ্যে তাদের এই ধরনের পট পরিবর্তনের কারণ টি, আই, প্যারেড কে বহাল রাখার চেষ্টা ছাড়া আর কি? তারা আমাকে এরেষ্ট করেনি। তাদের বাসায়ও আমাকে নেয়া হয়নি ও বাসায় কেউ আমাকে দেখেনি–ওসব শুধু এ কারণেই। এ না হলে তো আমাকে ফাঁসাবার একটা মোক্ষম পয়েন্ট হাত ছাড়া হয়ে যাবে। কেস হয়ে পড়বে দুর্বল।

আগেই বলেছি আমার বাসা হতে আমর ফটো নিয়েই তারা পরিবেশিত করেছে তেইশে ডিসেম্বরের 'পূর্বদেশ' সহ কোন কোন খবরের কাগজে। আমার বাসায় অনেক

www.pathagar.com

ফটো পাওয়া গিয়েছে একথা স্বীকার করেছে সাক্ষীরাই হাকিমের সামনে। তাদের বর্ণনানুসারে ওই ফটোগুলোর মধ্যে শুধু আমারই ফটো ছিল না। আমার স্ত্রী ও সন্তানদের ফটো ছিল ওখানে। আদালত কক্ষে এই ছিল তাদের দাবী। অথচ আসলে ওখানে শুধু আমারই ফটো ছিল ওদের কারুরই ফটো ছিল না। টি, আই, প্যারডকে ঠিক রাখার জন্যেই জঘন্য মিথ্যার পাঁয়তারা। আমার স্ত্রী ও সন্তানদের না দেখে কি করে তারা বলতে পারলো ওগুলো তাদের ফটো? অথচ এই প্রসঙ্গে আমার উকিলের এক জেরার জবাবে জাকারিয়া হাবিব বললো,–"না ওগুলো তার স্ত্রী ও সন্তাদের ফটো বলে কেউ আমাকে চিনিয়ে দেয়নি।" এসব স্ব-বিরোধী উক্তি হতে একথা কি বুঝা যায় না যে এ সবই তাদের সুবিধার্থে রচিত কতগুলো বানানো ঘটনা। অন্যায়ভাবে একজন লোককে ফাঁসাবার অপ প্রচেষ্টা!

মহামান্য বিচারক তার রায়ের যথার্থতা প্রমান করার জন্যে ৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী লিখিত রায়ের এক জায়গায় বলেছেন,–"All these p.ws are highly educated persons and coming from very respectable family. মনে হয় যেন উচ্চ শিক্ষিত হওয়াটাই একটা মামলার সত্যতা ও অসত্যতা নিরুপণের মানদন্ড। আর এ জন্যেই কোন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ নিরীহ ও মূর্খ লোকের উপর কোন অত্যাচার অবিচার করলেও প্রথম পক্ষ শিক্ষিত হবার কারণে মূর্খ লোকটিকেই অপরাধী বলে সাব্যস্ত করতে হবে। আর মহামান্য হাকীম অভিযোগকারিদের উচ্চ শিক্ষিত হবার প্রমাণও বা পেলো কোথা হতে? তারা তো আর কেউ সার্টিফিকেট নিয়ে উচ্চ শিক্ষিত প্রমাণ করার জন্যে কোর্টে আসেনি। তাহলে কি একথা বুঝা অসঙ্গত হবে যে হাকিমের দৃষ্টিতে অপরাধ করুক আ না-ই করুক অভিযুক্ত হয়েছে বলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে গন্ড মূর্খ ধরে নিতে হবে। নতুবা এ মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিটি অভিযোগকারীদের কোন লোকটি হতে কম শিক্ষিত ছিলো? হাঁ, অবশ্য অভিনয় জগতে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি গন্ডমূর্খই বটে। ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলা, অতি মিথ্যাকে অভিনয়ের কলাকৌশলে সত্যে পরিণত করা। এসব 'অঘটন ঘটন পটিয়সী' বিদ্যায় বাদী পক্ষই ছিলো অতীব পারদর্শী ও খুব পরিপক্ক এবং উচ্চ শিক্ষিত। এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আর ঠিক এ অভিনয় জগতই একটি মুসলিম পরিবার শুধু নয় একটি মাওলানা পরিবারকে Respectable family বলে চিহ্নিত করার জন্যে মহামান্য হাকিমের একটি অখন্ডনিয় যুক্তি।

আমার বিরুদ্ধে ঘটনাটির এরূপ পরিবেশন শুধু রাজনৈতি শত্রুতার জের। আর ঘটনাটিও ঘটেছে দেশের একটা রাজনৈতিক বড় মত-বিরোধের ঘোর যুগসন্ধিক্ষণে। আমার তরফ থেকে বার বার বিজ্ঞ হাকিমকে এ কথাটি বুঝিয়ে বলার পরও মহামান্য হাকিম তার রায়ের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন,–"It is difficult to believe that he has been falsely entangeled in this case by the prosecution wit\.ess" তাদের সাথে ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা আছে-এ মিথ্যা কথাটি আমার তরফ থেকে বানিয়ে না বলাতে, মহামান্য আদালত মিথ্যা মিথ্যিভাবে আমাকে একেসে জড়িয়েছে তা বিশ্বাস করতে পারলেন না।

www.pathagar.com

যেখানে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা শহর শাখার অফিস সেক্রেটারী প্রমাণ করা ছাড়া ঘুর্ণাক্ষরেও আমাকে আল বদর বানাবার কোন প্রমাণ পেশ করতে পারলো না বাদী পক্ষ, সেখানে খোদ হাকিম মহোদয়ই আমাকে আল বদর প্রমাণ করার জন্যে তার রায়ের এক জায়গায় লিখছেন-"P.ws 1 and 2 also proved that many intellectuls like Dr. Rabbi, Alim chowdhury, Prof. Monir Chowdhury and others were killed at that time by the miscreants. They also say that they found the dead bodies of Dr. Rabbi, Alim Chowdhury in a trench of a brick field at Ray bazar" ঠিক একই উদ্দেশ্যে তিনি তার নাতিদীর্ঘ রায়ের আর এক জায়গায় লিখেছেন,-"And there is no metarial contradiction or inconsistancy in there statement except some minor discrepancies which are quite natural. ডাক্তার রাব্বি, আলীম চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী এবং অন্যান্যদের হত্যা প্রমাণিত ও তাদের মৃতদেহ পাওয়া গেলেও আমাকে আল বদর বলে প্রমাণ করলেন মহাহান্য হাকিম সাহেব কি দিয়ে? রায়ের বাজারের ব্রিক ফিল্ডে মৃতদেহ পাওয়া গেলেই কি প্রমাণিত হলো আমি শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করেছি? এসব খোড়া যুক্তির সারবত্তা অনুধাবন করার জন্যে এদের মন মগজকে ওয়েলিং করাতে এদের পাঠাবো কোন দেশে? তা ছাড়া বিচার জগতের একটা বহুল প্রচলিত কথা যা আইন হিসাবেই স্বীকৃত-"Benefite of doubt always goes to the accused person" এর প্রতিক্রিয়া বিপরীতই হলো। এখানে সাক্ষীদের minor descrepcncies & cowtradiction আছে বলে হাকিম স্বয়ং স্বীকার করেও Benefits of doubt কার্যতঃ দান করলেন বাদী পক্ষকেই। বিচারের নামে এসব কি প্রহসন নয়?

এ প্রসঙ্গেই একটু পরে গিয়েই তিনি আবার লিখছেন-

"P.ws 1 and 2 say that they could recognise the accused by face. Admittedly the accused was residing at 47, Agamachi Lane in the same mohallah, The P.ws 4 Hafez Ashrafuddin says that the accused used to say his prayer in the Mohallah mosque. So it is quite natural that the P.ws. 1 & 2 might have seen him in the locality although not talked with him. এসব কথা গুলোও যে আমাকে ফাসাবার ফন্দি তা বিজ্ঞ জাজের যুক্তি হতে বুঝা যায়।

আমাকে তাদের সনাক্তীকরনের যর্থাথতা সমর্থন করে তার রায়ের এক জায়গায় আমার উকিলের যুক্তি খন্ডন করে তিনি লিখেছেন-

"It is argued by the learned counsel for the defence that the fact of recognising the accused by face was not stated in the F.I.R and it was also not disclosed to the other outsiders. It is true that the fact of recognisation by face was not stated in F.I.R in so

www.pathagar.com

many words but the P.ws. stated in their deposition that they told it just after the occurance to their family members and it was fully coroborated by the P.ws. 7 & 8. and i Have already stated the circumstances which caused delay in lodging the F.I.R. So under the omition of stating the recognition by face in the F.I.R. cannot be taken a material discrapensy and according to the law there is no necessity of describing every particulars of an occurance in the F.I.R in my openion.

মাননীয় বিচারকের এ ধরনের খোঁড়া যুক্তির অবতারণা করার পেছনে গূঢ় রহস্য বোধগম্য হলো না কিছুই। এ যেন হাকিমই কলমের জোরে সাক্ষীদের জবানবন্দী হতে কোন এক অজ্ঞাত ভয়ের কারণে টেনে হেঁচড়ে কতগুলো দুর্বল, অতিদুর্বল যুক্তি পেশ করছেন। সাধারণতঃ একটা চাক্ষুস ও সত্য ঘটনার ক্ষেত্রেও তো পুলিশের কাছে জবানবন্দী দেবার সময় খুব বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলা হয়। আর যে কারণেই হোক মিথ্যা-বানোয়াট ঘটনায় তো মিথ্যার রং-এর সীমা পরিসীমা থাকার কথাই নয়, অন্তত এসব চরিত্রহীন নৈতিকতা বিরোধীদের কাছে। সুতরাং আমাকে যদি তারা চিনতোই অথবা আমার সম্বন্ধে তাদের মনে সামান্যতম সন্দেহও জাগতো তাহলে তা অবশ্যই F.I.R এ উল্লেখ করতো। তদন্তকারী টিমের কাছে তা নিশ্চয়ই বলতো। জামায়াতে ইসলামীর লোক বলেই প্রকৃত পক্ষে ফাসানো হয়েছে আমাকে। আর এই কারণেই একটা সম্পূর্ণই মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় একসাথে, একযোগে সব মিথ্যা কথা সংযোজন করতে পারেনি। কাজেই যখন যার কাছে কথা প্রকাশ করা যাবে বলে তারা মনে করেছে। আমাকে ভাল করে জড়াতে পারবে মনে হয়েছে, সে কথাই তারা অকপটে বলেছে, প্রকাশ করেছে। আর পুলিশ বাবুরাও বোধ হয় এসব পয়েন্টের কথাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করে এজাহরে কিংবা তার পরে তদন্ত করার সময় জবানবন্দীতে সন্নিবেশিত করতে ভূল করেছে। আসলে পুলিশ কোন তদন্তই করেনি। কারো জবান বন্দীই নেয়নি।

এ ছাড়াও জনৈক সাক্ষীর জবানবন্দী হতে তো একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছে যে, পুলিশ কেস ফ্রেম করেছে সত্য তবে ষ্টেটমেন্ট তৈরী করার জন্যে সাক্ষীদের কাছে আদতেই যায় নি। নিজ নিজ অফিস কক্ষ অথবা অন্য কোন রঙ্গমঞ্চে বসে বসেই ষড়যন্ত্রের এ চক্রান্তজাল বুনেছে নিশ্চিন্তে। এমন একটা মিথ্যা ও বানানো কেস ফ্রেম করার জন্য বাড়ী বাড়ী ফেরার, দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দেবার প্রয়োজনই বা ছিলো কি? তারা নিশ্চয় জানতো, অভিনয় জগতের এ অভিনব সম্প্রদায় ও পারদর্শী নায়ক-নায়িকারা যে কোন কথা যে কোন সময়ে যে কোন ভাবে যে কোন মঞ্চে মঞ্চস্থ করতে সক্ষম হবে। আদালত কক্ষেও ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে অসুবিধা হবে না তাদের একটুকুও। এতে বোধ হয় তাদের ছিলো পূর্ণ বিশ্বাস। আর মূলতঃ ঘটেছেও তাই। তাদের অনুপম অভিনয় যে, হাকিমকেও প্রভাবিত করেছে, তাঁর রায়েই একথার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি তার রায়ে একজায়গায় উল্লেখ করেছে,-"she further says on checked voice-" I could never for get

www.pathagar.com

his face who dragged and took away my brother." মনোরম অঙ্গভঙ্গীতে অভিনয়ে পারদর্শীরা কত বড় একটা ডাহা মিথ্যা কথাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বলে গেলো। তার বিচার এ দুনিয়ার জাজের দরবারে না হোক সব থেকে বড় জাজের দরবারে তার সুক্ষ্ম বিচারের প্রতীক্ষায় রইলাম। সে দিনের ন্যায়বিচার-ই আমার আজকালকার দুর্দিনের একমাত্র সান্তনা।

এ ধরনের আরো বহু অসঙ্গতিপূর্ণ কথাবার্তা ও খোঁড়া যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে পুরা রায়টিতে। সামান্য মাত্র মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই একথা বুঝতে কারো পক্ষেই অসুবিধা হবার কথা নয়। আসলে যেন এ রায়টা একটা দায়সারা ব্যাপার। মহামান্য হাকিমও যেন একান্তই অপারগ। এ রায়টি যেন পূর্ব নির্ধারিত কারো নির্দেশের ফল মাত্র। জনসমক্ষে বৈধ করার নিমিত্তই পালন করে চলতে হলো বিচারের এ ফরমালিটিগুলো--এই-ই-যা। মহামান্য বিচারক শুধু একটি অবৈধ সন্তানের বৈধ মায়ের স্থানের অধিকারী। সন্তান যারই ঔরসজাত হোক না কেন মায়ের উদর হতে আসার কারণেই এ তারই সন্তান। তাই আমার বিচারটিও যে গোপন হাতের ইশারায়ই হয়ে থাকুক না কেন বিচারকের কলমের আঁক বলেই একে বিচার বলা ছাড়া আর কি উপায় আছে? অন্ততঃ দুনিয়াবাসীকে তো একটা ধোঁকা দেয়া গেলো। বহির্জগতে জানিয়ে দেয়া হলো বিনা বিচারে কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। অন্যান্য সব সুযোগ সহ আত্মপক্ষ সমর্থনের সব সুবিধা দেয়া হয়েছে সকলকেই। প্রকৃত ব্যাপার তো আর জগতবাসীর কানে গিয়ে পৌছতে পারলোনা। আমার ডিফেন্সের জন্যে কত কষ্ট, কত সাধ্য-সাধনা করে একজন উকিল পাওয়া গেলো। তাও জীবনের ভয়ে মন খুলে তিনি কেসটি চালাতে পারেননি- একথা আর কে জানতে পারবে?

ইন্টেলেকচোয়ালদের অপহরণ ও হত্যার বদনাম তো আল বদরদের উপর চাপিয়ে দেয়াহলো কিন্তু আমার আলবদর হবার কোন প্রমাণ তো একটি শব্দ দ্বারাও তারা দিতে সমর্থ হলো না। জামায়াতে ইসলামীর একজন কর্মী হওয়া ছাড়া তো আর কোন প্রমাণ বিজ্ঞ হাকিম কারো কাছে পায়নি। এরপরও সাক্ষীদের পরস্পর বিরোধী বহু বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও মহামান্য আদালত কোন যুক্তির বলে আমাকে দন্ডিত করতে পারলেন তা নিরূপণ করার ভার পাঠকবর্গের হাতে ছেড়ে দিলাম।

অতঃপর ১৯৭২ এর ১৭ই জুলাই, অনুমান ২ ঘটিকার সময় জনাকীর্ণ আদালত কক্ষে উদ্বেগহীন শান্ত সমাহিত অবস্থায় বিচারকের পবিত্র অর্ডার শুনলাম-

That the accused be found guilty u/s 364 BPC, read with clause B of Article II and schedule Part II of Bangladesh collaborators special Tribunal order no. 8 of 1972 and be convicted and sentenced to suffer rigorious imprisonment for 7 (seven) years and also to pay a fine of Taka, 10,000 (Taka ten thousand) and in default to suffer R.I. for one year which would run consequetively. অতি সহজভাবেই গ্রহণ করে নিলাম মহামান্য আদালতের

www.pathagar.com

রায়টি। ন্যায় ও আদর্শ পথের পথিকরা এভাবেই তাদের পুরস্কার গ্রহণ করে থাকে। এ তুচ্ছ রায় শুধু কেন-হাসিমুখে ফাঁসির রায়কেও অম্লান বদনে গ্রহণ করে থাকে তারা। তাই সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও দশ হাজার টাকার জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ বছর শাস্তির কথা শুনেও চিন্তার কণাও উদ্রেক হয়নি মনের কোণে। তাই বোধ হয় 'ইত্তেফাক' মন্তব্য করেছিলো। "জনাকীর্ণ আদালত কক্ষে বিচারকের রায় ঘোষণার পর আসামীর মুখে চিন্তার ছায়া ও চেহারায় ভয়ভীতির কোন লেশ দেখতে পাওয়া যায়নি। সে বোধ হয় অতি সহজভাবেই রায়টিকে মেনে নিয়েছে।" 'সহজ' শব্দটি লাগিয়ে তারা আমার প্রতিক্রিয়ার কদর্থ করে থাকলেও আমি সহজেই মেনে নিয়েছিলাম রায়টিকেও। কারণ ওটি আমার কাছে ছিল অতি নগণ্য।

আজ থেকেই শুরু হলো আমার নব জন্মের আর একটি সোপান-'কয়েদী জীবন'। এক নতুন পৃথিবীর সদ্যপ্রসূত নতুন শিশু সন্তান।

বিশেষ ট্রাইবুনালের রায়

স্পেশাল ট্রাইবুনাল জাজের কোর্ট (৫ম কোর্ট) ঢাকা

উপস্থিঃ-জনাব এফ রহমান

রাষ্ট্র.....বনাম.....এ, বি, এম আব্দুল খালেক

১৯৭২ সনের বাংলাদেশ কলাবোরেটর স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদেশ নং ৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ প্যানাল কোডের ৩৬৪ ধারার অধীন এ মোকদ্দমা উত্থাপিত হয়েছে।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ এ যে, অভিযুক্ত এ, বি, এম, এ, খালেক ওরফে আব্দুল খালেক নটরিয়াস আলবদর বাহিনীর একজন মেম্বার ছিলেন। এছাড়াও তিনি অধুনালুপ্ত জামায়াতে ইসলামীর মেম্বর ও সেক্রেটারী ছিলেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশকে বে-আইনীভাবে ও জোর করে দখলে রাখার জন্য তিনি পাক-সেনাকে সাহায্য সহযোগিতা যুগিয়েছেন। তাই তিনি উপরের বর্ণিত ধারা মতে একজন কলাবোরেটর।

অভিযোগ এই যে-১৪/১২/৭১ সন্ধ্যায় ৬-৩০ এ তার বাহিনীর অন্যান্য সদস্যদেরকে নিয়ে ষ্টেনগান, রিভলবার ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আলবদরের ইউনিফরমে দৈনিক সংবাদের সম্পাদক মিষ্টার শহিদুল্লাহ কায়সারের বাসায় দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে।

অভিযোগ এই যে তাঁর স্ত্রী, ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী এবং বোনের বাধাকে উপেক্ষা করে তাদেরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে শহিদুল্লাহ কায়সারকে তার বেড রুম থেকে ধরে জোর করে নিচের তলায় নামায় এবং হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়। এবং তাকে হত্যা করা হয় কিন্তু তার মরদেহ পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ এই যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ১নং সাক্ষী নাসির আহমদ, ১নং সাক্ষী জাকারিয়া হাবির চেহারায় চিনতে পেরেছে।

www.pathagar.com

অভিযোগ এই যে যেহেতু ওই সময় কারফিউ বিরাজিত ছিলো তাই রাতেই থানায় এজাহার দায়ের করতে পারা যায় নি। তবে ১নং সাক্ষী টেলিফোনে কোতয়ালী থানায় সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ বিভাগ সে সময় সঠিকভাবে কাজ করতে পারছিলো না বলে থানা তড়িৎ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপারগতা প্রকাশ করেছে।

অভিযোগ এই যে সাক্ষীগণ সকলে খুবই দিশেহারা ও মর্মাহত ছিলেন। তাদের একথা বিশ্বাস করারও কারণ ছিলো যে, ভিকটিমকে হত্যার উদ্দেশ্যে আলবদররা নিয়ে গেল। কারণ তারা শুনেছে যে সে সময় অনেক বুদ্ধিজীবিকে আলবদররা ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে। কাজেই তারা তার মৃতদেহ খুঁজার জন্য ব্যস্ত ছিলো। তাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও তারা তার মৃতদেহ পায়নি। কিন্তু তারা অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের মৃতদেহ বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পেয়েছে।

অভিযোগ এই যে এ কারণেই থানায় এজহার দায়ের করতে বিলম্ব হয়েছে এবং ভিকটিমের বোনের স্বামী ১নং সাক্ষী নাসীর আহমদ অবশ্য ২০/১২/৭১ তারিখে থানায় এজহার দিয়েছে। এখান থেকেই মামলা শুরু।

পুলিশ তদন্তের পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ১৯৭২ সনের বাংলাদেশ কলাবোরেটর স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদেশ নং ৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ প্যানাল কোর্ডের ৩৬৪ ধারার অধীন এ মকদ্দমা দায়ের করেছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এ অভিযোগ আমি পড়ে শুনিয়েছি এবং সে নিজকে নির্দোষ দাবী করেছে।

বিবাদীপক্ষ সাক্ষীদের জেরা থেকে যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা হলো যে অভিযুক্ত আবদুল খালেক জামায়াতে ইসলামীর একজন বেতন ভূখ কর্মচারী। তিনি কোন কলাবোরেটন নন। তিনি আলবদর বাহিনীর কোন সদস্য ছিলেন না। তিনি শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ীতে ১৪/১২/৭১ তারিখে বা কোন সময়ে আসেন নাই। এবং তিনি শহিদুল্লাহ কায়সারকে ১৪/১২/৭১ সন্ধ্যায় অপহরণ করেননি। অথবা অন্য কোন সময়ে তাকে মারার বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসেননি।

বিবাদীপক্ষ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে অভিযুক্তকে মিথ্যামিথ্যি ভাবে এ মামলার সাথে জড়িত করা হয়েছে এ ধারনায় যে, জামাতে ইসলামীর কোন কোন লোক পাক সেনাদের সহযোগীতা করে থাকতে পারে।

বিবাদীপক্ষ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে গ্রেফতারের পর অভিযুক্তকে ভিকটিম শহিদুল্লাহ কায়সার ও সকল সাক্ষীদের বাড়ীতে নেয়া হয়েছে। তাই তারা তাকে চোখে দেখার সুযোগ পেয়েছে গ্রেফতারের পরে। তার ফটো পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তাই সাক্ষীগণ সকলে পত্র-পত্রিকায় তার ছবি দেখেছেন। এ কারণেই সাক্ষীগণ তাকে টি আই প্যারেডে সনাক্ত করতে পেরেছেন।

এ পয়েন্টগুলো থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবেঃ-

www.pathagar.com

(১) অভিযুক্ত যে এ, বি, এম, আব্দুল খালেক প্রকৃতই আইনে বর্ণিত ধারা ১৯৭২ সনের বাংলাদেশ কলাবোরেটর স্পেশাল ট্রাইবুনালের ৮ নং আদেশ অনুযায়ী কলাবোরেটর কিনা।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিকটিম শহিদুল্লাহ কায়সারকে মারার জন্য অথবা মেরে ফেলবে একথা জেনে শুনে নিয়ে গেছে কিনা। যদি তাই হয় তাহলে তিনি বর্ণিত আইনের পার্ট ১ ও অ্যার্টিকেল ২ এর অধীন বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৬৪ ধারা অনুযায়ী অপরাধ করেছেন।

(৩) উল্লেখিত আদেশের ২নং অ্যার্টিকেরে 'বি' ক্লজ সিডিউলের I, II, III ও IV এ অনুযায়ী এ ব্যক্তি কোন কাজ করেছেন কিনা। যদি করে থাকে তাহলে তিনি বর্ণিত আদেশের ২ নং অ্যার্টিকেল 'ডি' অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

ফাইন্ডিংস

পয়েন্ট ১-২

আলোচনার সুবিধার জন্য এ দুটি পয়েন্টসকে একসাথে আনা হলো। বাদীপক্ষ ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পেশ করেছেন। আমাদেরকে তাদের কেস প্রমাণ করে দেখতে হবে। এটা স্বীকৃত সত্য এবং সাক্ষীদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ভিকটিম শহিদুল্লাহ কায়সার ঢাকার দৈনিক সংবাদের সম্পাদক ছিলেন। এবং তিনি একজন পরিচিত শিক্ষাবিদ ও বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। ১নং সাক্ষী নাসির আহমদ, ২নং সাক্ষী জাকারিয়া হাবিব, ৭নং সাক্ষী সাইফুন্নাহার, ৮নং সাক্ষী নীলা জাকারিয়া, এবং ৯নং সাক্ষী শাহানা বেগম ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি আরো ৪/৫ জন ইউনিফরমড ও টেনগান, রিভলবারে সজ্জিত বদরবাহিনী নিয়ে ১৪/১২/৭১ সন্ধ্যা- ৬-৩০ এ দরজা ভেঙ্গে তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে। তারা আরো বলে যে ভীত বিহ্বল হয়ে ব্লেক আউট হওয়া সত্বেও তারা বাড়ীর সবগুলো লাইট জ্বেলে দেয়। এরপর তারা আরো যোগ করে বলে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি (কাঠগড়ায় সনাক্ত করা হয়) আরো দুজন সহ তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে। প্রথম এ অভিযুক্ত ব্যক্তি জাকারিয়া হাবিবকে (২নং সাক্ষী) গ্রাউন্ড ফ্লোরেই ধরে ফেলে। তারপর তাকে নিয়ে দোতলায় উঠে এবং শহিদুল্লাহ কায়সারের বেডরুমে যায়। এখানে এ অভিযুক্ত ব্যক্তিটি তার কাছে শহিদুল্লাহ কায়সারের পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। জাকারিয়াকে ছেড়ে দিয়ে তাকে ধরে ফেলে। অতঃপর জাকারিয়াকে সহ শহিদুল্লাহ কায়সারকে নীচে টেনে নিয়ে জাকারিয়াকে চেড়ে দেয় ও শহিদুল্লাহকে ধরে নিয়ে যায়। এ সাক্ষীগণ আরো বলেন যে তারা চীৎকার দেয় ও এদেরে বাধা দেয়, যখন তারা তাকে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। কারণ সাক্ষীরা আগেই শুনেছিলো যে স্বাধীনতা সংগ্রামের বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবি ও সমর্থকদেরকে এভাবে পাকবাহিনীর দালাল ও আলবদররা ধরে নিয়ে মেরে ফেলছে। তাদের রাইফেলের হ্যান্ডলের আঘাতে ৯নং সাক্ষী শাহানা বেগম সিড়িতে পড়ে যায়। তিনি ব্যথিত সুরে বলেন, "যে আমার ভাইকে টেনে হেচড়ে ধরে নিয়ে গেছে তার চেহারা আমি ভুলবো না।" ১নং সাক্ষী নাসির আহমদ ২নং সাক্ষী জাকারিয়া

www.pathagar.com

হাবিব বলেন, তারা অভিযুক্তকে চেহারায় চিনতো। এসব সাক্ষীরা সব উচ্চশিক্ষিত এবং সম্মানিত পরিবারে সদস্য। তাদের সাথে অভিযুক্তের কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা বা আক্রোশ আছে বলে ডিফেন্সের তরফ থেকে কোন সাজেশন পাওয়া যায়নি। অতএব সাক্ষীগণ অভিযুক্তকে মিথ্যামিথ্যি এ মামলার সাথে জড়িত করা হয়েছে বলেও বিশ্বাস করা কঠিন। ১নং ২নং সাক্ষী প্রমাণ করেছে যে ডাক্তার ফজলে রাব্বি, ডাক্তার আলীম চৌধুরী, প্রফেসার মুনির চৌধুরী, প্রফেসার ফজলে মুহিত এর মত আরো অনেক বুদ্ধিজীবিকে তখন হত্যা করা হয়েছে। তারা তাদের মরদেহ ও রায়ের বাজারে একটি ব্রিক ফিল্ডের ট্রেঞ্চে দেখতে পেরেছে ৭/১২/৭১ এ। ডিফেন্সের পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে সাক্ষীগণের ১নং, ২নং, ৭নং, ৮নং ও ৯নং সাক্ষী সরাসরি নিকটাত্মীয়। ১নং সাক্ষী তিকটিমের বোনের স্বামী। ২নং সাক্ষী তার ভাই। ৭নং সাক্ষী স্ত্রী। ৮নং সাক্ষী ভাইয়ের স্ত্রী এবং ৯নং সাক্ষী সহোদর বোন। বর্ণনা খন্ডন করার আগে যেহেতু তারা পরস্পর আত্মীয়, আমাদেরকে বিরাজিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য আরোপ করতে হবে। এটা স্বীকৃত সত্য যে এলাকায় কারফিউ ছিলো। তাই এ সময়ে পাড়া প্রতিবেশীরা দৌড়িয়ে ঘটনাস্থলে আসতে পারে এ কথা আশা করতে পারিনা। এ অবস্থায় সাক্ষীগণই ঘটনাস্থলে থাকা স্বাভাবিক। তারা পরস্পর আত্মীয়-স্বজন বলে তাদের জবান বন্দীকে ফেলে দেয়া যায় না। যেখানে তারা লম্বা জেরার সম্মুখীন হয়েছে এবং কিছু ছোটা ছোট কথা চাড়া তাদের জবানবন্দীতে উল্লেখযোগ্য কোন স্ববিরোধিতা পাওয়া যায়নি। ১নং ও ২নং সাক্ষী বলেছেন যে, তারা অভিযুক্তকে চেহারায় চিনতো। এটাও স্বীকৃত যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ৪৭ নং আগামসি লেনে একই মহল্লায় থাকতো। ৪নং সাক্ষী হাফেজ আশ্রাফুদ্দীন বলেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই মসজিদের নামাজ পড়তো, তাই এটাও খুব স্বাভাবিক যে ১নং, ২নং সাক্ষী আসামীকে দেখে থাকবে যদিও হয়ত কোন সময় তার সাথে কতাবার্তা বলেনি। বিজ্ঞ কাউন্সিল থেকে ডিফেন্সে বলা হয়েছে-"তাকে চেহারায় চিনে" একথা F. I. R এ উল্লেখ নেই। আর একথা বাইরেও কারো কাছে বলেনি। F. I. R এ উল্লেখ নেই সত্য। কিন্তু তারা তাদের জবানবন্দীতে বলেছে যে, ঘটনার পর তারা পরস্পর পরস্পরকে একথা বলেছে। এবং ৭, ৮ ও ৯নং সাক্ষীর সাথে একথা সামঞ্জস্যশীল। আমি আগেই বলেছি যে কোন পরিস্থিতিতে তারা যথা সময়ে এফ, আই, আর দায়ের করতে পারেনি। অতএব এ অবস্থায় একথা বাদ পড়ে যাওয়াটাও খুব বড় একটা দোষ নয়। F. I. R এ ঘটনার সব বর্ণনা আসাও আইনের দৃষ্টিতে অপরিহার্য নয় বলে আমার মত। অভিযুক্তকে চিনার ব্যাপারে টি, আই, প্যারেড হয়েছে-ক্রিমিনাল কোর্ট হাজতে একজন ১ম শ্রেণী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার সলিমউল্লাহ কর্তৃক। ১০নং সাক্ষী হিসাবে তারও জবাবন্দী গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে আইনানুযায়ী প্যারেড করা হয়েছে। এবং সাক্ষীগণ তাকে পরিস্কার চিনতে পেরেছেন। টি, আই প্যারডে কোন রকম অনিয়ম হয়েছে তাও দেখা যায় না। যদিও এ যুক্তি দেখানো হয়েছে যে অভিযুক্তকে ২২/১২/৭১ গ্রেফতার করে তাদের বাসায় আনা হয়েছে এবং তারা সকল সাক্ষী তাকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু সাক্ষীগণ তা সরাসরি অস্বীকার করেছেন। ডিফেন্স তা প্রমাণ করতে পারেনি। এতএব এ যুক্তিও টিকেনি। আরো যুক্তি দেখানো হয়েছে যে গ্রেফতারের পরেরদিন ২৩/১২/৭১ তারিখে সংবাদপত্রে অভিযুক্তের ফটো প্রকাশিত হয়েছে ওই তারিখের পূর্বদেশ ফোইলে

৭—

www.pathagar.com

দাখিল করেছে- এ ফটো তারা দেখেছে ও টি, আই প্যারেডে সেনাক্ত করতে পেরেছে। এ সম্পর্কে ৭, ৮ ও ৯নং সাক্ষী সরলভাবে স্বীকার করেছে যে তারা সাধারণতঃ পত্র-পত্রিকা পড়েন কিন্তু ও সময়ে প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যাথায় খুব মর্মাহত ছিল বলে পত্র-পত্রিকা দেখার মুড তাদের ছিলনা। অতএব তারা কোন পত্র-পত্রিকায় তার ফটো দেখেনি। বিরাজিত অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদেরে অবিশ্বাস করার কান কারণ আমি দেখিনা। লার্নেড কাউন্সিল মামলার ডিফেন্সে টি, আই প্যারেডের সময় অভিযুক্তের পোষাক সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষীর বিভিন্ন বর্ণনার ব্যাপারেও পয়েন্ট আউট করেছেন। আমি মনে করি যখন অভিযুক্তের আইডেন্টিফিকেশন টি আই প্যারডে প্রমাণিত হয়েছে তখন পরিহিত পোশাক সম্পর্কে পার্থক্যজনিত বর্ণনা তেমন একটা কিছু নয়। তাছাড়াও বাদীপক্ষের মামলা প্রমাণের জন্য আমরা ডাইরেক্ট এভিডেন্স তো পেয়েছি। ৪নং সাক্ষী কায়েতুটুলী মসজিদের ইমাম হাফেজ মোহাম্মদ-আশ্রাফুদ্দীন শপথ করে বলেছেন যে ১৪/১২/৭১ তাং বিকালে আসরের নামাজের পর অভিযুক্ত আব্দুল খালেক শহিদুল্লাহ কায়সার তার বাড়ীতে থাকেন কিনা জিজ্ঞেস করেছেন। ঐ দিনই শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করা হয় সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটের সময়। লার্নেড কাউন্সিল ডিফেন্সে ভিক্টিম সম্পর্কে অভিযুক্তের জিজ্ঞাসাবাদের কোন কারণ দর্শাইতে পারেননি। এবং ৪নং সাক্ষীকে আমি অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখতে পাইনা। কারণ অভিযুক্তের সাথে ৪নং সাক্ষীর কোন শত্রুতা বা আক্রোশের কথা বলা হয়নি। ৩নং সাক্ষী প্রায় ৭০ বছরের একজন বেশ বুড়ো লোক। শপথ করে তিনি বলেন যে অভিযুক্ত আব্দুল খালেক ৪৭নং আগামসি লেনে তার বাড়ীতে বাস করতো। তিনি আরো বলেন তার একটি রিভলবারও ছিলো। সে প্রায় স্বাধীনভাবে এমন কি কারফিউতেও হাটাচলা করতো। তিনি আরো বলেন সারেন্ডারের আগের রাত্রে কারফিউ থাকা সত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তি রাত ৯-৩০ মিনিটে তার বাসায় ফিরে। দরজা খুলতে দেরী হওয়াতে সে ভিতরে ঢুকে বুড়ার পেটে পিস্তল উচিয়ে ধরে। তার এ জবানবন্দী অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। এখন প্রশ্ন হলো যদি পাক সেনাদের সাথে তার কোন কলাবোরেশন না থাকবে তাহলে সে কিভাবে কারফিউর সময়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। কারণ দেশের নিয়ন্ত্রণ তখন পাক সেনাদের হাতে। এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন কলাবোটের। আমরা আরো দেখতে পাই যে ১৩/৭/৭১ আর্মি ইস্যুকৃত তার একটি রিভলবার লাইসেন্স ছিলো। লাইসেন্স রেজিষ্টার কোর্টে পেশ করা হয়েছিল। রিভালবারের জন্য ২/৭/৭১ এ যে দরখাস্ত করা হয়েছে তাতে অভিযুক্ত নিজেই স্বীকার করেছে যে সে প্রো-পাকিস্তানী। এবং সে রিভলবার ক্রয়ও করেছে। এ সব প্রমাণ করে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি পাক সেনার একজন কলাবোরেটার।

উপরের বর্ণিত ঘটনা, পরিস্থিতি ও প্রমানাদির দ্বারা আমার এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এ অভিযুক্ত আব্দুল খালেক ও অন্যান্য দুষ্কৃতিকারীরা মিষ্টার শহিদুল্লাহ কায়সারকে মেরে ফেলার জন্য অথবা মারার জন্য খুব বিপদজনক জায়গায় ডিজপোজ করেছে। এবং আমি মনে করি এ দুটো পয়েন্ট (১-২) সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়েছে।

www.pathagar.com

অতএব অভিযুক্তকে ১৯৭২ সনের বাংলাদেশ কলাবোরেটর স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদেশ নং ৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৬৪ ধারায় আমি দোষী মনে করি।

পয়েন্ট ৩ এ অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৯৭২ সনের প্রেসিডেন্ট আদেশ নং ৮, আর্টিকেলে উল্লেখিত কোন ধারায় এমন কোন কাজ করেছে বলে কোন প্রমাণ নেই অথবা অন্য কথায় বাদীগণ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন ঘটনা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব আমি এতে তাকে দোষী মনে করিনা। তাই

অর্ডার

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ১৯৭২ সনের বাংলাদেশ কলাবোরেটর স্পেশাল অর্ডার নং ৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৬৪ ধারায় অপরাধী সাব্যস্ত করে ৭ (সাত) বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান ও দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হলো। উভয় শাস্তি একত্রে চলবে।

আমি রায় দিয়েছি ও সংশোধন করেছি
স্বাক্ষর/এফ, রহমান
স্পেশাল ট্রাইবুনাল জাজ
১৭/৭/৭১

স্বাক্ষর
এফ, রহমান
স্পেশাল ট্রাইবুনাল জাজ
১৭/৭/৭১

AMNESTY INTERNATIONAL-এর প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকার

আমার বিচার চলার কিছু আগ থেকেই শুনে আসছি সিঙ্গাপুরের এককালীন প্রধানন্ত্রী, ক্রিমিনাল 'ল' এর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আইন জীবি Amnesty International-এর তরফ থেকে বাংলাদেশে এসেছেন, কলাবোরেটার এষ্টে গ্রেফতার ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অবস্থা, ট্রাইবুনালে পরিচালনাধীন বিচার কার্যের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করতে। তার আগমন নিছক একটা ফরমালিটি বই কিছু নয়। গতি প্রকৃতির কথা তাকে যা বুঝিয়ে দেয়া হয় তাই তিনি বুঝবেন। তাছাড়া নিরপেক্ষ ব্যাখ্যার অভাবে সঠিক কিছু ধারণা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। সরকার নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় এ মেহমানটি সরকার নিযুক্ত দোভাষী দ্বারাই পরিচালিত হবে। আর দোভাষীর বলে দেয়া ময়না পাখীর গানের মত তেলেসমতি কারবার সুধীজনের জানা থাকারই কথা। প্রায় ক্ষেত্রেই তার কাজ হচ্ছে যা বলা বা করা হয় তার ঠিক বিপরীত বুঝানো। তবুও এই সময়ে তার এই আগমনে ক্ষণিকটা হলেও খুশী হয়ে উঠেছিলাম। অন্ততঃ আন্তর্জাতিক সংস্থার মানবতা-বোধ দেখে। প্রতিপক্ষের জিঘাংসিত মনোভাবের কারণে আমাদেরকে ক্রিমিনাল আইনের আওতাভূক্ত করা হলেও আমরা যে আদপে রাজনৈতিক মত-বিরোধের এক কঠিন শিকারে পরিণত হয়েছি তাদের এই সঠিক

www.pathagar.com

উপলব্ধিটুকুর জন্যে। তাদের এ কার্যক্রম অবস্থার সঙ্গীনতার কারণে নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

৫ই জুলাই '৭২ সন। যথারীতি কোর্টে হাজির করা হলো আমাকে। সাক্ষী শুরু হবার তৃতীয় দিন এটা। পুলিশ বেষ্টিত অবস্থায় একটি বেঞ্চে বসে আছি আমি। তখনো ট্রাইবুনালে কোন পক্ষের আইনজীবি ও বিচারক এসে উপস্থিত হননি। এমতাবস্থায় যতকিঞ্চিত হন্তদন্ত হয়ে বিচার কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন আমার ডিফেন্স 'ল' ইয়ার শাফকাত হোসেন সাহেব। আমার খুব কাছে এসে ছোট স্বরে আমাকে বললেন,-Amnesty international এর তরফা থেকে Mr.....আজ কোর্টে এসেছেন আপনার এই গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর মামলার বিবরণ শুনতে। 'বারে' তাঁর সাথে অনেকক্ষণ ধরেই আলাপ আলোচনা হয়েছে আমার। আমি তাঁকে সব কথাই খুলে বলেছি। এখন তিনি কোর্টে আসবেন। আপনাকে আপনার ডিফেন্সের সুবিধা সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। সবরকম সুবিধা সুযোগই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে আপনাকে দেয়া হয়েছে, তার কাছে-একথা বলাই আপনার জন্যে ভাল হবে বলে আমার ধারণা। কাজেই এ ধরনের উত্তর দেয়ার জন্যেই আমি আপনাকে পরামর্শ জানাবো। আর এছাড়াও জেলে আপনাদের সাথে কেমন আচার আচরণ করা হচ্ছে, থাকা খাওয়া সহ সব সুবিধা সুযোগ দেয়া হয় কিনা এসব ব্যাপারেও আপনাকে প্রশ্ন করতে পারেন। এ ব্যাপারেও আমার পরামর্শ হলো আপনার ভাল মন্তব্য প্রকাশ করা। একটা রাজনৈতিক জটিল মামলায় জড়িত হয়ে পড়েছেন। কাজেই সত্য হলেও সরকারের দুর্নাম হতে পারে এমন কোন মন্তব্য করে সরকারের কোপ দৃষ্টিতে গিয়ে মামলার জটিলতাকে আরো জটিলতর করে লাভ কি? কোন রকমে উতরিয়ে যাওয়া যায় কিনা সে চেষ্টা করাই আমার মতে উত্তম হবে। জেলে আপনাদের থাকা খাওয়ার ব্যাপারে মিষ্টার..... আমাকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি ওই সব চিন্তা করেই উত্তর দিয়েছি- Being a new born and poor country the government is serving the fellows in Jail to its utmost capacity on humanitarian ground আমার আইনজীবির কথা শুনে না হেসে পারলাম না। কথাগুলো বলার তার চমৎকার আর্ট হতেই বুঝা গিয়েছিলো এইগুলো মেকী কথা। প্রকৃত ঘটনার সাথে এর কোন মিলই নেই। তাই আমি হেসে হেসেই উকিল সাহেবকে বললাম- যেখানে এমন একটি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল মামলায় আপনার ক্লায়েন্টকে কোর্টে আসার পূর্বে এক দৃষ্টি দেখতেও পারলেন না-এক বাক্য কথা বলা তো দূরের কথা মামলা সংক্রান্ত কোন পরামর্শ তো বাদই দিলাম, সেখানে এক অজানা অজ্ঞাত জগতের জেল অধিবাসীদের সম্বন্ধে মহামান্য সরকারের সাফাই দিয়ে এমন স্তুতিবাক্য গাইতে পারলেন কি করে? হেসে হেসেই এবার তিনি জবাব দিলেন-"এছাড়া আর উপায় কি?" তার অসহায়তার ভার দেখে নীরব হয়ে গেলাম।

একটু পরেই Amnesty international প্রতিনিধি কোর্টে এসে উপস্থিত হলেন। ছয় ফুটেরও উর্দ্ধের এ দীর্ঘদেহী লোকটিকে নিয়ে একজন বাঙ্গালী বাবু এসে পড়লেন আমাদের কাছে। একজন সুদর্শন বিদেশীকে দেখলে আমাদের দেশের মানুষের যে অবস্থা হয়

www.pathagar.com

এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাকে দেখার জন্যে ঔৎসুক্য জনতা কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে ঘিরে রয়েছে তাকে। আমার উকিল সাহেব তড়িতে উঠে গিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে নিয়ে এলেন আমার কাছে। করিয়ে দিলেন পরিচয়-

He is Mr.A.B.M.A. khaleq majumder, my claient and a prominent accused of so called intellectual murder case.

আর আমার দিকে ইংগিত দিয়ে বললেন ইনি হলেন

Mr.....Ex-prime Minister, Singapur and an internationally reputed criminal lawer, who has kindly visited Bangladesh to observe the conditions and previlages of collaborators given by the government in respect of their health, food, places clothing particularly their defence.

আমি সামান্য এগিয়ে গিয়ে তার সাথে করমর্দন করলাম। অমনি তিনি স্মিত হাস্যে আমার দিকে তাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

-How are you?

-By the grace of All-mighty some how we are passing our days:

-Have you got facilities and previlages for your defence?

-The picture is before your eyes.

-Is there any troubles inside the jail towards the prisoners?

-You see, the containing capacity of the Jail is 1966 only,

-where as near about Thirteen thousand people are living there at persent. From this you could easily imagin the deplorable condition of human being living in the Jail.

আমার উকিল সাহেবের পরামর্শের ভিত্তিতেই প্রত্যক্ষ উত্তরের পাশ কাটিয়ে পরোক্ষভাবেই উত্তর দিতে হলো তার শেষের দু'টি প্রশ্নের। এমতাবস্থায়ই মাননীয় জজ সাহেব এসে পড়লেন। সবাই আপন আপন আসন নিয়ে বসে পড়লেন। আগত মেহমান ও তার দোভাষীকেও আমার ডান পাশে দু'খানা চেয়ার দেয়া হলো। তারাও বসে পড়লেন ওখানে। সেদিন চলছিলো আমার সাক্ষীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী জেরী ৯নং সাক্ষী শহিদুল্লাহ কায়সারের বোন শাহানার। তার এলোপাথাড়ী কথাবার্তায় অযৌক্তিক ও সঙ্গতিহীন প্রলাপ উক্তিতে মাঝে মাঝে মাননীয় হাকিমও চটে উঠতেন। এসব সময়ে মিষ্টার.....দোভাষীকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করতেন-"কি বলছে সাক্ষীটি।" দোভাষী তার সুবিধামত বুঝিয়ে যাচ্ছেন তাঁকে।

অনুমান আধা ঘন্টা পর দোভাষীসহ মিষ্টার.....উঠে চলে গেলেন। কোর্টের বাইরে।

www.pathagar.com

কয়েদী জীবন

১৯৭২ইং ১৭ই জুলাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কারী আমার রাজনৈতিক মামলার বহু জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটলো। সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের কারাদন্ড রায় ঘোষনা হলো। নির্বিকার ভাবে বিচারকের রায় শুনার পর বড় ভাইকে বললাম। এর টাকা পয়সার অপচয়, কষ্ট ও হয়রানীর সম্মুখীন হবেন না। হাইকোর্টে আপীল করার আর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি জবাব দিলেন "ওটা আমাদের বিবেচ্য ব্যাপার, তোমার নয়। তুমি তোমার ভাগ্য নিয়ে চলে যাও। আমরা দেখবো আর কি করা যায়। বিচার এখানেই শেষ নয়"। আমার ডাকসাইটে উকিল রায়ের সময় কোর্টে ছিলেন না। বারে বসে বসেই তিনি রায়ের খবর পেলেন এবং ত্বরা করে বড় ভাই আবদুল আউয়াল মজুমদারকে খবর পাঠালেন হাইকোর্টে আপিল দায়ের করার জন্য। তার বিশ্বাস, এই মামলার রায় এখানে এটা হওয়া স্বাভাবিক। হাইকোর্ট অবশ্যই খালাস দেবে। বড় ভাই বড় আবেগী ও জেদী মানুষ। আমার কথার পাত্তা দিলেন না। আপীল করার ব্যাপারে আমার গররাজী ভাব দেখে একজন অচেনা সাংবাদিক তার সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়ে কোর্ট হাজতে গিয়ে আমাকে আপীল করতে নিষেধ না করার জন্য অনুরোধ করে আসলেন। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাকে আর দেখিনি। চিনিওনি ওনি কে?।

অবশেষে বহু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে বিদায় দিয়ে কোর্ট হাজতে আসলাম বিকাল ৫টার দিকে। নিজের পরণের লুঙ্গি জামা বাদ দিয়ে পুরানো কাপড় চোপড় যা কিছু ছিলো জেল থেকে আসতেই তা নিয়ে এসে ছিলাম। অন্যরা ভেবেছিলো খালাস পাবো আশায় কাপড় চোপড় নিয়ে যাচ্ছে। আমার কিন্তু এ চিন্তা ছিলনা। ভেবেছিলাম ট্রাইবুনাল জাজ নির্দোষ মনে করলেও আমাকে খালাস দিতে পারবেন না। কাজেই আগামী কাল থেকেই তো কয়েদীর পোশাক পরতে হবে। এসব সিভিল কপড় চোপড় সাথে রেখে আর লাভ কি। এ দিন কাউন্সিল মুসলিম লীগের আলহাজ্ব সিরাজুদ্দীন সাহেবকেও কলেবোরেটর এক্টে সম্ভবতঃ আড়াই বছরের শাস্তি দেয়া হয়েছিলো অন্য কোর্টে। তিনি আর আমি কোর্ট হাজতে এসে একত্রিত হলাম। আমার ও তার আত্মীয় স্বজনরা উদ্বেগাকুল। তাঁর ছেলে সফিউদ্দিন ও এক শ্যালক আমাদেরকে আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলো। তাদের আপ্যয়নে আন্তরিকতার ও শ্রদ্ধার যে ভাব মিশ্রিত ছিলো তা আজও মনে জাগে। সিরাজ সাহেবের শান্ত সমাহিত গম্ভীর চেহারা আগেও আমার কাছে ভালো লাগতো। আজকের ট্রাইবুনাল কোর্টে শাস্তি নিয়ে আসার পরও তার স্বভাবজাত চেহারায় কোন পরিবর্তন আসেনি। তাঁকে সাথে পেয়ে যেন আমি একজন বড় ভাইকে সাথে পেলাম। সাহস আরো বেড়ে গেলো। সিভিল কাপড় চোপড় ফেরৎ দিয়ে কোর্ট হাজতে চলে আসার পর আত্মীয় স্বজনরা সজল চোখে এদিক ওদিক ঘুরছে। আমার সে দিকে তেমন খেয়াল নেই। আমি আমার নিজের বাড়ী কারাগারে পৌছার জন্য এখন ব্যস্ত। অনুমান সন্ধ্যা ৭টার দিকে সিরাজ ভাই সহ কোর্ট হাজত থেকে রওনা হয়ে কারাগারের প্রথম গেট পার হলাম। ওখানকার লোকজন ফেরৎ এসেছি দেখে বিস্ময় বিমূঢ়।এখানে গড়ে উঠা সমাজের ছোট ভাইরা দুঃখে ভারাক্রান্ত। এ রাতও কাটালাম পুরান ২০নং সেলের ২নং কক্ষে। ওখান থেকেই গিয়েছিলাম আজ সকালে

www.pathagar.com

কোর্টে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী মামলার রায় শুনতে। এস সৃষ্টিকারী আল-বদর কমান্ডার হিসাবে আমার উপর কড়া নজরের শেষ রজনী আজ।

১৯৭১ এর ১৮ ই জুলাই ভোরে সেলবন্দী জীবন মুক্ত হয়ে কয়েদী জীবনে পদার্পনের নিযুক্তিপত্র লাভের জন্য নিয়ম মাফিক কেস টেবিলে (জেলের ভাষায় কেষ্টো ফাইল) আনা হলো । জনাব কাজী আবদুল আউয়াল তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ডি, আই, জি। অমায়িক ভদ্রলোক। গোটা ডিপার্টমেন্টে সততার সুনামা আছে তাঁর। তিনি এলেন কেস টেবিলে আমাকে কায়েদীর ড্রেস পরিয়ে আনা হলো ওখানে। নাম এনলিষ্ট হলো কয়েদী খাতায়। তিনি আলতো করে মাথা উঠিয়ে একবার তাকালেন আমার দিকে। বললেন, ও, আপনার তো কাল সাজা হয়ে গেছে। খবরের কাগজে সম্ভবতঃ সংবাদ দেখেছেন তিনি। স্মিত হাস্যে বললাম, জি স্যার। জেলার সাহেব ফাঁসি দিতে চেয়েছিলেন। ৭ বছরে সশ্রম কারাদন্ডের বিনিময়ে ফাঁসি থেকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। জেলার নির্মল বাবু ওখানেই। তাছাড়া রয়েছেন ৭/৮ জন ডিপুটি জেলার সহ সুবেদার জমাদার অনেকেই। নির্মল বাবু আমার দিকে একবার তাকলেন। তবে ডি. আই. জি. সাহেবের উপস্থিতিতে তার করার কিছু ছিলনা। যদিও সে সময় অবস্থার পেক্ষিতে ডি. আই. জি সাহেব নিজেও কিছুটা অসহায় ছিলেন। সাহেবেরা সব কাজ সেরে চলে গেলেন। আমি নতুন বেশে অপেক্ষা করছি বিকালের। কারণ সাজা প্রাপ্ত কয়েদীদের সকালে ডি আই. জি কর্তৃক কয়েদী খাতার নাম এন্ট্রি করা হয়।বিকাল বেলা সশ্রম কারাদন্ডের শ্রম জেলার কর্তৃক পাশ করা হয়। বিকালে যথারীতি জেলার সাহেব কেস টেবিলে এলেন। কাজ পাশের জন্য হিষ্ট্রি টিকেট তার সামনে তুলে ধরলেন তৎকালীন সুবেদার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আবদুল কাদের। সাথে সাথে সুবেদার বললো "স্যার উনি তো শিক্ষিত লোক। ভাল একটা জয়গায় কাজ দিলে ভালো হয়।" মাথা উঠিয়ে একবার তাকালেন তিনি আমার দিকে। কারণ সকালে ডি. আই. জি সাহেবের পর ডাক্তারও এসে যথানিয়মে আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে হিষ্ট্রি টিকেটের নিদিষ্ট কলামে ইংরেজী "H" অক্ষরটি লিখে গেছেন। H অর্থ Hard। Hard work দিতে হবে। সেই 'এইচ' টি আমার শরীবের সাথে তিনি মিলিয়ে নিলেন। ঠিক এ সময়ে আমি সুযোগ বুঝে বললাম, আমার মাষ্টার ডিগ্রি আছে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে। লাইব্রেরী সাইন্সেও ডিপ্লমা' করেছি। আমকে ইচ্ছা করলে লাইব্রেরীতেও কাজ দিতে পারেন। আমার ও সুবেদারের কথা উপেক্ষা করে তিনি 'না' সূচক মাথা হেলালেন। এবং সাথে সাথেই আমার হিষ্ট্রি টিকেটে কি জানি লিখে চলে গেলেন।

বর্তমান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ভাই কামারুজ্জামান তখন আমাদের সাথেই ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। কয়েদীর অভাব ছিলো বলে আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার দিয়েই জেলের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কাজ পরিচালনা করা হতো। জনাব কামারুজ্জামান এ সময় কেস টেবিলের চীফ রাইটার। কেস টেবিল ছিলো জেলখানার ভেতরের প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এটাকে জেলখানার ভেতরের কোর্ট বা এজলাস বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবেনা। এতদিন সেলবন্দী। ছিলাম বলে হিষ্ট্রি টিকেটে কাজ পাশের রহস্য তখনও আমি কিছু বুঝতাম না। জেলার চলে যাবার

www.pathagar.com

পর তাড়াতাড়ি কামারুজ্জামান আমার হিষ্ট্রি টিকেট হাতে নিয়ে দেখেলেন। আমি লক্ষ্য করলাম তার মুখটা মলিন হয়ে গেলো। আস্তে আমাকে বললেন,–আপনার কাজ পাশ হয়েছে জেনারেল কিচেনে। অর্থাৎ সাধারণ রন্ধনশালায়। আমার পরিচিত সকলেরই মুখ বিষাদভরা। কিন্তু হায়! উপায় তো কিছু নাই। জেনারেল কিচেন হলো জেলখানার সবচেয়ে কষ্টকর জায়গা। সাধারণতঃ দাইমলী শ্রেণীর (২০ বছর সাজাপ্রাপ্ত খুনের আসামীকে দাইমলী বলে) আসামীকেই এখানে কাজ করতে দেয়া হয়। রাজনৈতিক মর্যাদার কিছুসংখ্যক 'হাইয়ার ক্লাসি ফিকেসন' প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর সব লোকের খাবার দাবার তৈরী হয় এখানে। এখান থেকে সারা জেলখানায় খাবার সরবরাহও করতে হয়। ইত্যকার সব ব্যাপার সহ খুবই ঝামেলার কাজ এটা। সব অসৎ লোকের আড্ডাখানা ওখানে।

পরের দিন ভোরে জেনারেল কিচেনেই (জেলের ভাষায় চৌকা) আমাকে গনতি দিতে হলো। গায়ে ডোরা ডোরা জামা পায়জমা, কোমরে ডোরা গামছা ও মাথায় টুপী পরে জেনারেল কিচেনের একজন বাবুর্চি হিসাবে ফাইলে গনতি দিলাম। পাশাপাশি ৪ জন করে বসে গনতি দেয়াকে জেলের ভাষায় ফাইল বলে। কিচেনের পুরানো ও ডানপিটা কায়েদীরা আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে–একজন ভালো 'বায়লটি' পাওয়া গেলো বলে কানাঘুষা করতে লাগলো। কিচেনের দুই আড়াই মনি ড্রামের মত ডেগের কড়ার ভিতর দিয়ে লম্বা বরাক বাঁশ ঢুকিয়ে যারা ভাত ডালের ডেক উত্যস্ত চুলা হতে কাধে করে উঠা নামা করে তাদেরেই জেলের ভাষায় বলে বায়লটি। কথাটি শুনেছি–ময়মনসিংহের মাজু নামের এক দায়মালি কয়েদীর মুখে। কিন্তু এসব শব্দের তাৎপর্য তখনো বুঝে উঠতে পারেনি। সম্ভবতঃ আমার দু'এক দিন আগে ট্রাইবুনাল কোর্টে ৬মাসের সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিলো কনভেনশন মুসলীম লীগের ঢাকা শহরের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ফয়েজ বকস। তার কাজও পাশ হয়েছিলো জেনারেল কিচেনে। তাকে আজ এখানে পেয়ে আমার একটা ভরসা হলো। ভাবলাম বয়স্ক ও মুরুব্বি মানুষ। এখানে যখন আমার আগে এসেছেন নিশ্চয়ই তার সাহয্য পাবো। গনতির পর তিনি জেনারেল কিচেনের তৎকালীন বিহারী রাইটার ইফতেখার আহমেদের সাথে গোডাউনের দিকে যাচ্ছেন। লক অপের সংখ্যানুযায়ী মানুষের রসদ হিসব করে আনতে। আমিও ফয়েজ সাহেবের সাথে চলালাম। চৌকার সীমা পার হয়ে ৪ খাতার দক্ষিণের পথ ধরে পূর্ব দিকে যাচ্ছি –এ সময়ে চৌকার এক পুরানো কয়েদী আমাকে ও ফয়েজ সাহেবকে ধমক দিয়ে বললো–তোমরা কোথায় যাচ্ছো? থাকো এখানে। ফয়েজ ভাই একটু খেতো ধরনের লোক বলে তার কথায় কর্ণপাত না করে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন গোডাউনের দিকে ইফতেখারের পেছনে পেছনে। আমি একা হলে হয়ত যেতাম না। ইফতেখারের কোন দিকে লক্ষ্য নেই। সে সোজা গিয়ে গেট থেকে লকআপ সংখ্যাটা নিলো। গোডাউনে গিয়ে একটা গোল টুলে বসে রসদের হিসাব করা শুরু করে দিলো। ফয়েজ সাহেব এখানে এসে একটা চেয়ারে বসলেন। আমি ও তার দেখাদেখি একটা চেয়ারে বসলাম। ইফতেখারের হিসাবের কাজ শেষ হলো। গোডাউন থেকে মালামাল বুঝে নিয়ে চললো আবার চৌকার দিকে। আমরাও তাকে অনুসরণ করলাম। চৌকায় ফিরে আসার পর ফয়েজ সাহেব ও আমি চৌকার মেট সিলেটের চাঁদমিঞা ও ময়মনসিংহের মাজুর

www.pathagar.com

এক গর্জন শুনলাম। তাদের অনুমতি ছাড়া কেন গোড়াউনে গেলাম। বোকার মত ফয়েজ ভাই কথা গুলো শুনে আমতা আমতা করছে। আমি তার পাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে।

খানিক পরেই আমাদের দু'জনের ডাক পড়লো কেসটেবিল থেকে। সুবেদার আবদুল কাদের সাহেব ডাকছেন। উভয়ে গেলাম ওখানে। আমাদের দিকে চোখ ছানাবড়া করে সুবেদার সাহেব বললেন–"আপনারা বাইরে কে কি রাজা মহারাজা ছিলেন তা আমাদের জানার প্রয়োজন নেই। এখানে আপনারা আসামী। আমাদের আইন কানুন মেনে চলতে হবে। চেয়ারে বসতে না বললে এখানে চেয়ারে বসা যাবেনা। আমাদের দুজনের কারুরই ডিভিশন ছিলনা। গোডাউনে চেয়ারে বসেছিলাম বলে গোডাউন ক্লার্ক নোয়াব আলী (বর্তমানে দৈনিক বাংলার বানীতে চাকুরীরত) সুবেদারের কাছে নালিশ করেছেন। আমি আজ থেকেই সতর্ক হয়ে গেলাম। আর বুঝলাম ফয়েজ সাহেব দ্বারা কোন সাহায্য হবে না। আমার পথ আমাকেই ঠিক করে নিতে হবে। আমার অবস্থা অনুযায়ী আমার চলা ফিরার সীমা পরিসীমা চক আউট করে নিলাম। ফয়েজ সাহেব বেশী দিন এখান থাকতে পারে নি। অন্য কোথাও তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। খুব হিসাব করে চলতে থাকলাম। কারণ ফয়েজ সাহেবের ছয় মাসের শাস্তি। চার মাস খেটে চলে যাবেন। আমাকে কাটাতে হবে আটটি বছর। কাজেই কর্তৃপক্ষের আস্থা উৎপাদনের মাধ্যমেই আমার কারাজীবন অতিবাহিত করা হবে মঙ্গল। ইফতেখারও এ কথাটা একদিন বললো আমাকে। "ফয়েজ সাবের চিন্তা কি? ছয় মাসের মাত্র শাস্তি। আপনার সময় দীর্ঘ। কাজেই আপনাকে কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে জেল খাটতে হবে। আমি তো আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার। চলে যাবো। আপনি হিসাব নিকাশের কাজটা শিখুন। আমার পরে যেন এ কাজ আপনি চালাতে পারেন। " মন, সের থেকে শুরু করে হাজার হাজার লোকের ছটাক কাচ্চার এই ফ্রেকশনের হিসাব শিখতে গিয়ে হিমসিম খেতে শুরু করলাম।

এভাবে কাটলো আরো একদিন। পরের দিন সকালে চৌকায় গিয়ে দেখি পরিস্কার পরিচ্ছন্নের এক ভীষণ ধুম। ড্রেন থেকে শুরু করে সব কিছু মাজাঘসা চলছে। শুনলাম আজ চৌকায় ডি. আই. জি সাহেবের ফাইল। পরিদর্শন করাকেও জেলের ভাষায় ফাইল বলে। তখনও কাজী আবদুল আউয়াল সাহেব ছিলেন ডি. আই. জি। তিনি আসবেন সরেজমীনে চৌকা পরিদর্শন করতে। যথা সময়ে এলেন তিনি। আমি কয়েদী ড্রেসের পুরা ইউনিফরমে সুসজ্জিত। কিন্তুএ ড্রেসে আজ ডি. আই. জি সাহেবের সামনে যেতে আমার দ্বিধাবোধ হলো। তাই তার দৃষ্টির আড়ালে থেকে থেকে একটা দুরুত্ব বজায় রেখে আমি চৌকা পরিদর্শনের সময়টা কাটালাম। তিনি বেরিয়ে অফিসের দিকে চলে গেলেন দেখে আমি কিছুটা সহজ হয়ে উঠলাম। কোমরে বাঁধা গামছা খুলে ফেললাম। এমন সময়ে শুনছি সেই ডাক সেটে মেট মাজু আমাকে ডাকছে, "ও খালেক ভাই! ও খালেক ভাই! আপনাকে বড় সাহেব ডাকছেন।" আমি হতভম্ব হয়ে গেটের দিকে তাকাতেই দেখি ডি, আই, জি সাহেব আবার চৌকার দিকে আসছেন। তার সাথে জেলার সহ সব ডিপুটি জেলার সার্জেন্ট–সুবেদার জমাদার ও উপরের দিকে উঠছেন। অগত্যা এ অবস্থায়ই আমি তাঁর দিকে এগুলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, "ও আপনার কাজ পাশ হয়েছে এখানে? উত্তরে

www.pathagar.com

বললাম, জি স্যার। এসময়েই জেলার নির্মল বাবু পেছন থেকে ডি. আই. জি সাহেবের পাশাপাশি এসে আমাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, আপনি রাইটারের সাথে গোডাউনে যাবেন। রসদের হিসাব নিকাশটা বুঝে নেবেন। কিচেনে আমার কাজ পাশ হওয়াটা ডি, আই. জি. সাহেব বোধ হয় পসন্দ করেন নি একথা ভেবেই জেলার নির্মল বাবু ঝট করে আমকে ওই কথাটা বললেন। আমি তার প্রতি এমনিতেই বিক্ষুব্ধ। তাই ডি.আই. জি সাহেবের দিকে নজর রেখেই তার কথার উত্তরে বললাম-Yes. I am trying my label best, তাঁরা চলে গেলেন। মেট মাজু চীৎকার দিয়ে এবার মেট চাঁদ মিঞাকে বলতে লাগলো-বুঝলা চাঁদভাই। আজ থেকে খালেক ভাই চৌকার পরিচালক-বড় সাহেব এ কথা বলে গেলেন। জানিনা, আজও জানিনা, বের হয়ে গিয়ে ডি, আই. জি সাহেব অবার কেন চৌকায় ফিরে এলেন। কেন এ কথা জিজ্ঞেস করলেন। আর মাজুও বা কি বুঝলো। কিন্তু অল্লাহর গায়েবী কুদরতে এদিন থেকে সত্যি সত্যি আমি গোটা জেলখানার খাবার দাবারের গোটা জেনারেল কিচেনের দায়িত্বশীল বলে পরিগণিত হলাম। খাবার দাবারের কারণে এ জায়গা জেলখানার সকলেরই দৃষ্টির বস্তু ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ১৯৭৬ এর ৩রা মে হাইকোর্টের রায়ে আমার রিলিজের মুহূর্ত পর্যন্ত স্বশ্রম কারাদন্ডোর শ্রম হিসাবে জেনারেল কিচেনেই কারাজীবন শেষ করলাম।

কিছু স্মরনীয় ঘটনা

কাজ তো পাশ হলো। দিনে জেনারেল কিচনে কাজ। রাতে এসে থাকি ১/২ খাতার জেনারেল ওয়ার্ডে। থাকার স্থানকে খাতা বলা হয়। এটাকে আমদানী খাতাও বলা হতো। এখানে আমরা সম-মনা ভাই অনেকেই রাত কাটাই। ভাই কামরুজ্জামান, ময়মনসিংহের ছোট ভাই মনির, চৌদ্দগ্রামের আবুল হাশেম ভূঞা, চাঁদপুরের রৌশন, আবদুল মতিন, আদমজীর আবদুর রহমান কটকী, সৈয়দ নুরুল হক সহ অনেকেই। অনেকের নামই আজ আর মনে নেই। সে সময় সকলের মনে যে কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিরাজ করতো। পরস্পরে কি যে আত্মীয়তা। বিভিন্ন জেলার লোক অথচ পরস্পরে কি আন্তরিকতা কি 'ভ্রাতৃত্ব' কি বন্ধুত্ব। একজনের ব্যথায় একই দেহের মত যেন সবাই একত্রে ব্যথিত হয়ে উঠতো। রাতে এশার নামাজ আদায় করে খাওয়া দাওয়ার কাজ শেষ। শুরু কুরআন তিলাওয়াত, জিকির আজকার। শেষ রাতে শুরু হতো তাহাজ্জুতের নামাজ। যদি নামাজের জন্য কেউ সজাগ না হতো তাহলে তার নিকটবর্তী ভাই তাকে সরাসরি ডাকাডাকি করে সজাগ না করে পাশে বসে তার হাত পা বেশ মোলায়েম ভাবে টিপে দিতো। তাতেই সে সজাগ হয়ে নামাজ পড়ার জন্য হন্তদন্ত হয়ে উঠে যেতো। অবশ্য আমার মত দু'একজন ছাড়া আর বাকীদের জন্য আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করা ব্যতীত আর কোন কাজ ছিলনা ওখানে। সারা জেলখানা জুড়েই কলাবোরেটর এ্যাক্টে গ্রেফতারকৃত লোকজন। সেল এরিয়ার ওল্ড টুয়েন্টি, নিউ টুয়েন্টি, ৭সেল ৬ সেল সবগুলোতে কল্যাবোরেটরস। আর এরা সকলেই কারাগারে আসার আগে অন্ততঃ নাস্তিক ছিলেন না। এ ঘোর বিপদে পড়ে আজ সকলেই যেন একাত্ম হয়ে গেছেন। কম বেশ সকলেই একই কারণে জেলে এসেছেন।

www.pathagar.com

তৎকালে জেলের বিরাজিত মনোভাব থেকে অন্ততঃ আমার মনে হতো রাজনীতির ক্ষেত্রে বোধ হয় এদের আর কেউ মুক্তি পাবার পর আল্লাহর এ জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন সূত্রে একত্রিত হবেনা। তবে মুসলীম লীগের নেতা এ এন এম ইউসুফ সাহেবের মত দু'একজন এ দেশে সামাজতন্ত্র ছাড়া ইসলামের নামে কাজ করা আর সম্ভব হবে না বলে ধারণা করতেন। আলাপ আলোচনায় তাদের এ মনোভাব ব্যক্ত হতো। অবশ্য ইবাদত বন্দেগীর বেলায় তাদেরও কোন কসুর ছিলনা। ১/২ খাতার নীচের তলায় সবচেয়ে পূর্বের রুমটি ছিলো সিকিউরিটি ওয়ার্ড। কলাবোরেটার এ্যাক্টে আটক বন্দীদের যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে পরিচিত এবং তারা তখনো জেলখানায় ডিভিশন পান নি, তাদেরকে বিভিন্ন সেল হ'তে এনে এ সিকিউরিটি ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। যেমন মুসলিম লীগের জনাব এডভোকেট এ এন এম ইউসুফ বরিশালের জনাব সুলতান মাহমুদ, N.S.F. নেতা জনাব জমীর আলী প্রমুখ। জামায়াতে ইসলামীর এডভোকেট আনোয়ার হোসেন, জামাল পুরের মরহুম ফজলুর রহমান, মাওলানা ফয়জুল্লাহ সহ অনেকে। প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ, ও মোফাসসেরে কুরআন বিখ্যাত আলেমেদ্বীন মাওলানা মাছুম সাহেবও ছিলেন ওখানে। তার ইমামতিতেই নামাজ হতো। সুরালা কণ্ঠে আযান দিতেন জনাব জমির আলী। তাদের ২৪ ঘন্টারই রুটিন ছিলো। ফজরের নামাজের পর নাস্তা। নাস্তার পর শুরু হতো খতমে খাজেগান, খতমে ইউনুস শরীফ ইত্যাদি। এর পর বিরতি গোসল, দুপুরের খাওয়া দাওয়া, জোহরের নামাজ। আসর পর্যন্ত বিশ্রাম। আবার দোয়া ও আলাপ আলোচনা। মাগরেবের নামাজের আগেই প্রায় সব খানে লক আপ হয়ে যেতো। আবার আলাপ আলোচনা, ঈশার নামাজ ইত্যাদি। শেষ রাতে আবার শুরু হতো তাহাজ্জুদের প্রস্তুতি পেশাব -পায়খানা ও অজুর মিছিল। সে কি দৃশ্য, সে কি পবিত্র মনোভাব। জনাব জমীর আলী মাঝে মাঝে গান, গজল পরিবেশন করে সিকিউরিটিকে সজীব করে রাখতেন। জনাব জমীর আলী সহ অনেকেরই তৎকালীন মনোভাব ও কার্যক্রমের দ্বারা ভবিষ্যতে আল্লার দ্বীনের খেদমত হবে বলে আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু --।

এসব ওয়ার্ড ছাড়াও জেল এ্যারিয়ার দশ সেল সমগ্র সেল এরিয়া, বিশেষ করে ৩ খাতা ৪ খাতা ও ৫ খাতায় সাধারণ লোকেরা বাস করতো তাদের সংখ্যা ছিলো বিপুল। তারাও বেশ ইবাদাত বন্দেগীতে সময় কাটাতো। বিশেষ করে লক আপ হবার পর রাতে তাদের জিকির আজকার ও ইবাদত বন্দেগী, আল্লার দরবারে হাত উঠায়ে কাঁদার দৃশ্য নজীর বিহীন। তৎকালীন আটক বন্দীদের রাতের এ আহাজারী দেখে অনেক সিপাহী জমাদারকে মন্তব্য করতে শুনা যেতো- "এদের সাথে খারাপ ব্যবহার করিস না। বলা যায় না কি হয়। দেখসনা তারা কিভাবে কাঁদছে। খোদাকে ডাকছে। জেলখানায় কোনদিন তো ইবাদত বন্দেগী এভাবে হতে দেখিনি।" বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও তৎকালীন মন্ত্রীগণ জেলখানায় আসার সাথে সাথেই যেহেতু ডিভিশন পেয়ে গিয়েছিলেন তাই তাদেরকে সেল এ্যারিয়ায় রাখা হয়েছিল।

আমাদের নেতা জনাব আব্বাস আলী খান ও জনাব মাওলানা এ কে এম ইউসুফ সে সময় থাকতেন সেল এ্যারিয়ার নতুন বিশ নম্বর সেলে ডিভিশন সহকারে। তাদের প্রতি কড়া

www.pathagar.com

নজর ছিলো বলে প্রথম দিকে তারা আমাদের সাথে বেশী যোগাযোগ রাখতে পারেননি। তবে তারা খোজ খবর পেতেন। আমরাও খোঁজ খবর পেতাম। আমি শুনেছি তাদেরকে জেলখানায় আনা হয়েছিল ক্যান্টনমেন্ট থেকে। এবং সে সময় জেলার নির্মলেন্দু রায় তাদের সাথেও করেছিলেন ঐদ্ধত্বপূর্ণ আচরণ। নিয়ম কানুনের ব্যাপারে প্রশাসনিক কড়া কড়িকে খারাপ মনে করা যায় না। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দের সাথে রাজনৈতিক সুলভ আচরণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি অপরাধ কিছু হয়, বিচার তো জেলখানার আওতাভুক্ত নয়। এখানেই শুধু আপত্তি।

শুনেছি জনাব আব্বাস আলী খান একবার খাবার দাবারের ন্যায্য হিসসা পাচ্ছেন না বলে জেলার নির্মল বাবুর কাছে অভিযোগ করেছেন। তখন ডিভিশন প্রাপ্ত লোকজনের খাবার হিসাব করে নেয়ার দায়ীত্বে নিয়োজিত ছিলেন একটি রাজনৈতিক দলের জনৈক নেতা। তিনি সকলের প্রাপ্য ঠিকমত পৌছাচ্ছেন না বলে ছিলো অভিযোগ। রায় বাবু এর কোন প্রতিকার না করে জনাব খান সাহেবকে অন্য সেলে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন। অথচ এর কিছু দিন পরেই উক্ত নেতা জেলখানার ডিভিশন প্রিজনারদেরকে তাদের হিসসা কম দিয়ে দিয়ে জমা করা চা চিনি, মাখন ও দুধের পট গেট দিয়ে স্ত্রী কন্যার নিকট পাচার করার সময় জেলের সি, আই, ডি, জমাদারের নিকট হাতে নাতে ধরা পড়েন। ডি, আই জি কাজী আব্দুল আউয়াল সাহেবের ভদ্রতা ও উদারতার জন্য তিনি রক্ষা পেয়ে যান।

এ ভাবে অনেক ছোট বড় ঘটনার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে চলেছে দিন। এর মধ্যে একদিন সিকিউরিটি ওয়ার্ডে সি আই ডি যথারীতি তল্লাস চালায়ে মাওলানা মাসুম সাহেবের কোন বইতে একটি টাকা পেলেন এ ধরনের টাকা পয়সা পাওয়াকে জেল স্মাগলিং বলা হয়। এ অপরাধে জেলার নির্মলবাবু মাওলানা মাসুমকে এখান থেকে সেল এ্যারিয়ায় ট্রান্সফার করার অর্ডার দিলেন। সব রাজনৈতিক নেতারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন।তিনি একজন প্রখ্যাত আলেম ছাড়াও সে সময় সিকিউরিটি ওয়ার্ডের একটি বড় জামায়াতের ইমাম। জেলার রায় বাবু সব প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই তার হুকুম বহাল করলেন। অবশ্য ডি, আই, জি আউয়াল সাহেবের হস্তক্ষেপে একদিন পর মাওলানা মাসুমকে আবার সিকিউরিটি ওয়ার্ডে ফেরৎ আনতে বাধ্য হন রায় বাবু। ঠিক এ দিনই জেলার নির্মল বাবুর বদলীর অর্ডার এসে পৌছে অফিসে

ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আমার ও সরকারের আপীল

১৯৭২ এর ১৭ জুলাই ট্রাইবুনালে ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড নিয়ে আসার সময় বড় ভাইকে বলে এসেছিলাম হাইকোর্টে আপীল করে টাকা পয়সা খরচ না করার জন্য। 'এটা এখন আমাদের ব্যাপার' বলে তিনি আমার মতামতকে উপেক্ষা করলেন। সে সময় একজন অচেনা

www.pathagar.com

সাংবাদিকও আমার কথাটি শুনেছিলেন। তিনি কোর্ট হাজতের পথে আমাকে খুব সংক্ষেপে হাইকোর্টে আপীল করতে বারণ না করার জন্য বলে গেলেন। আমি কারাগারে চলে এলাম। আপীল করা হলো কি হলোনা এসব ব্যাপারে আমার মাথা ব্যাথা নেই। এক ধ্যানে চলেছে দিনগুলো। কারাদন্ডের অংশ হিসাবে যে শ্রম আমার জন্য বরাদ্ধ হয়েছে তা সুচারু রূপে পালন করে চলার মধ্যেই আমি মশগুল। শুনেছি এর পরও বড় ভাই ট্রাইবুনাল কোর্টের রায়ের বিরুদ্দে হাইকোর্টে আপীল করেছেন। আরো শুনেছি পত্র পত্রিকায় আমার শাস্তি কম হয়ে গেছে বলে বেশ প্রচারণা চলছে। এমন কি জাতীয় সংসদেও আলোচনা হয়েছে আমার শাস্তি প্রসঙ্গে।

প্রকাশ থাকে যে এ সময়ে কলাবোরেটর এ্যাক্টে অনেকেরই শাস্তি দুই মাস আড়াই মাস করে হতে শুরু করেছে। অতঃপর সংসদে বিল পাশ হলো কলাবোরেটর এ্যাক্ট দোষী প্রণামিত হলেই সর্বনিম্ন শাস্তি আড়াই বছর হতে হবে। আর ৩৬৪ ধারায় দোষী প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি বা জরিমানা সহ যাৎবজীবন কারাদন্ড পর্যন্তও হতে পারবে। আগে এধারার সর্বচ্চ শাস্তি ছিলো ১০ বছর। আর বিল পাশ হবার পূর্বে যাদের শাস্তি ঘোষণা হয়ে গেছে, সরকার ইচ্ছা করলে তাদের বিরুদ্ধে রেট্রোসফেকটিভ এ্যাফেক্ট দিয়ে শাস্তি বাড়াবার জন্য হাইকোর্টে আপীল করতে পারবে। বলাবাহুল্য আমার শাস্তি হয়েছিল ৩৬৪ ধারায় অপহরণ মামলায়।

জেলের বাইরের জগতের প্রতি আমার খেয়াল ছিল না। জেল ভুবনে আছি এক ঘোর নিশায় লিপ্ত। এমনি সময় ২৯/১১/৭২ তারিখে জেল অফিস থেকে 'অফিস কল' নামে একখানা স্লিপ পেলাম। গেলাম জেল অফিসে। ডিপুটি জেলার জনাব আবদুল গফুর বেশ বেদনা ভারাক্রান্ত মনে ডিপুটি জেলার আবদুর রউফের দস্তখতে ভেতরে নেবার জন্য পাশ করা হাইকোর্টের এক খানা নোটিশ আমার হাতে তুলে দিলেন। তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমি নোটিশটির উপর চোখ বুলিয়ে চলছি। ক্ষনিকের মধ্যেই গফুর সাহেব ফিরে এলেন। পিছে পিছে এলেন নির্মল বাবুর পরবর্তী জেলার সামসুর রহমান সাহেব। গফুর সাহেবকে তিনি বলে গেলেন দেখো, তাকে কোন সাহায্য করতে পার কিনা। তখনো আমি কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন সে সময়ে জেলে ডিউটিরত এস, বি ইনস্পেক্টর মোজাম্মেল হক সাহেব। গফুর সাহেব হাইকোর্টের নোটিশটি আমার বড় ভাইয়ের নিকট পৌছাবার জন্য লোক তালাশ করছেন। এ অবস্থা দেখে মোজাম্মেল সাহেব নিজে মোহাম্মদ পুর টাউন হলের কাছে আমার ভাইয়ের নিকট হাইকোর্টের এ নোটিশটি পৌছিয়ে দিয়ে আসতে প্রস্তাব দিলেন। আমি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলাম। পরমাত্মীয়ের মত তিনি কাজটি করে ফিরে এসে আমাকে খবর জানালেন। এ নোটিশটির সারমর্মই হলো –সরকার ১৭/৭/৭২ তারিখে ট্রাইবুনাল কোর্টের দেয়া রায়ে সন্তুষ্ট নয়। অসন্তুষ্টির নানা কারণ বর্ণনা করে সরকার ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ কলারোটেরস (স্পেশাল ট্রাইবুনাল) অর্ডার এর তৃতীয় এমেন্ডমেন্ট অনুযায়ী দন্ডপ্রাপ্ত আসামী এ বি এম এ খালেক ওরফে আবদুল খালেকের ট্রাইবুনাল কোর্টের লঘু শাস্তিকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি অথবা জরিমানা সহ যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হোক। রেকর্ড সংরক্ষণ ও ঐৎসুক্য

www.pathagar.com

পাঠকেদের সঠিক অবগতির জন্য হাইকোর্টের নোটিশ সহ ক্রিমিনাল রিভিশন নং ২২০, ১৯৭২, শাস্তি বাড়াবার এ আপীলটি বাংলা উদ্ধৃত করা হলো।

শাস্তি বাড়ানোর জন্য সরকারের আপীল

হাই কোর্ট অব বাংলাদেশ

ক্রিমিনাল রিভিশনাল জুরিসডিকসন

ঢাকা ১৯৭২

ক্রিমিনাল রিভিশন নং ২২০, ১৯৭২

প্রতি,

সুপারিনটেনডেন্ট এন্ড রিমেবারেন্স অব লিগেল এফেয়ারস

গভর্ণমেন্ট অব বাংলাদেশ ঢাকা ---------আবেদন কারী

বনাম

এ বি এম আবদুল খালেক ----------অপোজিট পার্টি

প্রতি

এ বি এম এ খালেক ----------অপজিট পার্টি

এতদ্বারা আপনাকে জানানো হচ্ছে যে উপরোল্লিখিত আবেদন কারীর তরফ থেকে একটি এফিডেভিট সহকারে এই কোর্টে একটি আবেদন দাখিল হয়েছে। এই আবেদনের শুনানী হবে ১৯৭২ সনের ১৪ ই ডিসেম্বর অথবা কোর্টের সুবিধা মতো অচিরেই তা শুনানী হবে।

অতএব আপনি এই কোর্টের একজন এডভোকেটের মাধ্যমে ওই দিন উপস্থিত হয়ে কারন দর্শান যে কেন আপনার বিরুদ্ধে এই আবেদন গ্রহণ করা হবেনা।

হাইকোর্টের নির্দেশ বলে

স্বাক্ষর অস্পষ্ট

সেকেন্ড এসিসট্যান্ট রেজিষ্টার

ইন দি হাই কোর্ট অব বাংলাদেশ

ক্রিমিনাল রিভিশনাস জুরিসডিকসন

১৫ নভেম্বর ১৯৭২ ইং

উপস্থিত

মিষ্টার জার্সিস আহসান উদ্দিন চৌধুরী

ও

মিষ্টার জাসিস বি এইচ চৌধুরী

www.pathagar.com

ক্রিমিনাল রিভিশন নং ২২০ অর ১৯৭২

দি সুপারিন্টেনডেন্ট এন্ড রিমেমবারেন্স অব লিগাল এফেয়ারস

অব্ বাংলাদেশ ঢাকা ..... পিটিশনাব

এ বি এম আবদুল খালেক বিবাদী অপোজিট পার্টি

পিটিশনারের পক্ষে মিষ্টার এ বি এম মাসুদ ডিপুটি এটর্নি জেনারেল

অর্ডার

একটি রুল ইস্যু হবার কারণে রেকর্ড পাঠানো হোক এবং ডিপুটি কমিশনার ঢাকা ও বিবাদী অপোজিট পার্টিকে কারণ দর্শাইতে বলা হোক যে, কেন ঢাকার ৫ নং স্পোশাল ট্রাইবুনাল জাজ ও স্পেশাল ট্রাইবুনাল নং ৫ মিষ্টার এফ রহমান দেয়া শাস্তি বাড়ানো উচিৎ নয় অথবা এ ধরণের অন্য কাজ অথবা অতিরিক্ত নির্দেশ যা এ কোর্ট উপযুক্ত ও সঠিক মনে করে।

অনুলিপি আহসান উদ্দিন চৌধুরী

সুপারিন্টেনডেন্ট, ঢাকা জিলা বদরুল হায়দার চৌধুরী

ইন দি হাই কোর্ট অর বাংলাদেশ

ক্রিমিনাল রিভিশনাল জুরিসডিকশন

ক্রিমিনাল রিভিশান রিভিশন নং ২২০ অব্ ১৯৭২

এ বিষয়ে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর রেড উইথ আর্টিকেল ১৬ ক্লজ (৫) অব বাংলাদেশ কলোবোরেটরস স্পেশাল ট্রাইবুনালস (থার্ড এমন্ডমেন্ট) অর্ডার ১৯৭২, ৪৩৫ ও ৪৩১ ধারায় শাস্তি বাড়াবার আবেদন করা হয়েছে। এ ব্যাপারটিতে সুপারিন্টেনডেন্ট এন্ড রিমেম্বারেন্স লিগাল এফেয়ারস গভর্ণমেন্ট অব বাংলাদেশ ঢাকা পিটিশানার

বনাম

এ বি এম আবদুল খালেক পিতা মৌলভী আবদুল মজিদ মজুমদার গ্রাম ধড্ডা থানা হাজীগঞ্জ কুমিল্লা, --------বিবাদী অপোজিট পাটি এখন জেলে।

এ মামলায় গত ১৭/৭/৭২ তারিখে স্পেশাল ট্রাইবুনাল জজ স্পেশাল ট্রাইবুনাল নং ৫ ঢাকা এর মিষ্টার এফ রহমান বিবাদী আপোজিট পার্টিকে ৩৬৪ বি পি সি ধারায় সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ প্রদান করেন।

প্রতি

মিষ্টার জাষ্টিস অব্ সাদাত মোঃ সায়েম চীফ জাষ্টিস ও একই কোর্টে তার সাথী গণ আবেদন কারীর বিনীত

www.pathagar.com

১। আরজ এই যে, বিবাদী অপোজিট পাটি দুর্ধর্ষ আলবদর পার্টির সদস্য ও অধুনা লুপ্ত জামায়াতে ইসলামীর সদস্য ও ঢাকার অফিস সেক্রেটারী ছিলো। তিনি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশকে দখলে রাখার জন্য পাক বাহিনীকে সাহয্য ও সমর্থন করেছেন। সুতরাং তিনি প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৮ অব ১৯৭২ অনুযায়ী একজন কলাবোরেটর।

২। আরজ এই যে, ১৪/১২/৭১ তারিখে তিনি তার দলের আরো সঙ্গী সাথী নিয়ে টেনগান রিভলবারে স্বসস্ত্র হয়ে দৈনিক সংবাদের সম্পাদক শহিদুল্লাহ কায়সারকে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে বিকাল ৬-৩০ এ টেনে হেছড়াইয়া তাহার বেড রুম দোতালা হতে হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়। এবং ফলে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। বিবাদী খালেক মজুমদারকে বাড়ীর লোকজন সেনাখত করেছে।

৩। আরজ এইযে পুলিশ ৩৬৪ বি.পি.সি রেড উইথ আর্টিকেল ২ ক্লজ (বি) সিডিউল পার্ট ২ তবদি কলাবোরেটস অর্ডার ১৯৭২ ধারায় তদন্ত করে বিবাদীর বিরুদ্দে স্পেশাল ট্রাইবুনালে চার্জসিট দায়ের করে।

৪। আরজ এই যে চার্জসীটের ধারা বিবরণী তাকে পড়ে শুনানো হলে তিনি নিজকে নির্দোশ বলে দাবী করেন।

৫। আরজ এই যে ডিফেন্স লইয়ার জেরার দ্বারা নিশ্চিত হতে পেরেছে যে বিবাদী জামায়াত ইসলামী দলের বেতনভূক সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি আলবদর বাহিনীর সদস্য ছিলেন না। তিনি কখনো শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ীতে১৪.১২.৭১ তাকে মারার উদ্দেশ্যে আসেননি। তাকে মিথ্যা মিথ্যি ভাবে এ মামলায় জড়ানো হয়েছে, এ ধারণায় যে জামায়াতের কোন কোন সদস্য পাক বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করেছে। গ্রেফতারের পর তাকে শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ীতে আনা হয়েছে। সকল সাক্ষীরা তাকে দেখেছে। প্রত্রিকায় তার প্রকাশিত ফটো দেখেছে। এই কারণে টি আই প্যারডে তাকে সেনাঘত করতে পেরেছে। তিনি প্রকৃত পক্ষে নির্দোষ।

৬। আরজ এই যে বাদী পক্ষ ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন করেছে। আর বিবাদী পক্ষ ১ জনের ও সাক্ষী গ্রহণ করেনি।

৭। আরজ এই যে এসব ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং রেকর্ডের প্রমান অনুযায়ী স্পেশাল ট্রাইবুনাল ৩৬৪ বি পি সি রেড উইথ ক্লজ বি অব আর্টিকেল ২ এন্ড সিডিউল পার্ট ২ অব বাংলাদেশ কলাবেরটর, স্পেশাল ট্রাইবুনাল অর্ডার ১৯৭২ , বিবাদী অপোজিট পার্টিকে দোষী ও অপরাধী সাব্যস্ত করেছে এবং ১৭/৭/৭২ এর আদেশে ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ বছর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেছে যা একত্রে চলবে। ট্রাইবুনাল কোর্ট, অবশ্য ক্লজ ডি অব আর্টিকেল II রেড উইথ পার্ট IV ধারায় তাকে দোষী মনে করেনি।

৮। আরজ এই যে, ধারা ৩৬৪ বি. পি. সি. আদত গতভাবে পার্ট ২ অব দি সিডিউল অব দি বাংলাদেশ কলাবোরেটরস অর্ডার ১৯৭২। এবং এই ধারার সর্বোচ্চ শাস্তি আর্টিকেল

www.pathagar.com

২ ক্লজ (ডি) বর্ণিত অর্ডারে ছিলো এমন একটি সময় যা ফাইন সহ ১০ বছরের অধিক হবেনা।

৯। আরজ এই যে ২৯/৮/৭২ তারিকে বাংলাদেশ কলাবোরেটরস স্পেশাল ট্রাইবুনাল) অর্ডার ১৯৭২ পরিবর্তন করা হয়েছে। এবং ৩৬৪ বি. পি. সি. ধারার অপরাধকে এ অর্ডারের পার্ট অব দি সিডিউল এর অধীনে আনা হয়েছে। যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড অথবা ফাইন সহ যাবৎজীবনকারাদন্ড সাব্যস্ত হয়েছে।

১০। আরজ এই যে, এই এমেন্ডমেন্ট এই প্রভিশনও রেখেছে যে এই আইন রচিত ও বলবৎ হবার আগে যে সব মামলায় শাস্তি হয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে সরকার ইচ্ছা করলে কোর্টে যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে রিভিশন মামলা দায়ের করতে পারবে।

১১। বিনীত আরজ এই যে বিজ্ঞ স্পেশাল ট্রাইবুনাল নং ৫ ঢাকা স্পেশাল ট্রাইবুনাল নং ৮ অব ১৯৭২ এর ১৭/৭/৭২ তারিখের অর্ডারে যে সাজা ও কারাদন্ড দেয়া হয়েছে তা বাংলাদেশ কালবোবেটরস স্পেশাল (ট্রাইবুনাল) ১৯৭২ এর থার্ড এমেন্ডমেন্ট অনুযায়ী হয়নি।

১২। আরজ এই যে বিজ্ঞ স্পেশাল ট্রাইবুনালের নির্দেশিত শাস্তিতে আবেদন কারী অসন্তুষ্ট হয়ে আপনার লর্ডশীপে নিম্ন লিখিত কারণে এই মামলা দায়ের করছে যে

১। বিবাদী অপোজিট পার্টিকে পাক আর্মির কলাবোরেটর হিসাবে চিহ্নিত করার পরও। বিজ্ঞ ট্রাইবুনাল জাজ তাকে ক্লজ ডি অব আর্টিকেল II রেড উইথ পার্ট IV(B) অব বাংলাদেশ কলাবোরেটরস (স্পেশাল ট্রাইবুনাল) অর্ডার ৭২ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত না করা আইনের ভুল ব্যাখ্যার শামিল। এবং এতে সুবিচার প্রাপ্তিতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

২। বিবাদী অপোজিট পার্টি তার আরো ৪/৫জন সঙ্গী নিয়ে রিভলভার সহ স্বসস্ত্র হয়ে শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ীতে আলবদরের ইউনিফরম পরে ঢুকতে দেখা গেছে এবং এটাও দেখা গেছে যে সে পাক আর্মির কলাবোরেটর ছিলো। এ অবস্থায় বিজ্ঞ ট্রাইবুনাল আইনের চোখে তাকে ক্লজ (বি) এর আর্টিকেল ২ অব দি প্রেসিডেন্টস অর্ডার নং ৮ অব ১৯৭২ অধীনে তার কোন দোষ না দেখে ভুল করেছেন।

৩। বাংলাদেশ কলাবোরেটরস (স্পেশাল ট্রাইবুনাল) অর্ডার ১৯৭২ এর এমন্ডেমেন্ট অনুযায়ী বিবাদী অপোজিট পার্টির উপর আরোপিত কারাদন্ড ও শাস্তি পুনরারোপ করা প্রয়োজন এবং এর সাথে সাথে বর্ণিত অর্ডারের যাজ এমেন্ডমেন্ট অনুযায়ী তার উপর শাস্তি বর্ধিত করা আইন আরোপ করা প্রয়োজন।

৪। শাস্তি বৃদ্ধি করার এটাও একটা কারণ যে ওই শাস্তি খুবই কম ও নরম হয়েছে।

অতএব আবেদন কারী বিনীতভাবে আবেদন জানাচ্ছে যে আপনার লর্ডশীপ দয়া করে এই কেসের রেকর্ড পত্র কল করে বিবাদী অপোজিট পার্টির উপর রুল জারি করবেন যে স্পেশাল ট্রাইবুনাল কেস নং ৮ অব ১৯৭২ এর মিস্টার এফ, রহমান স্পেশাল ট্রাইবুনাল জাজ, ট্রাইবুনাল নং ৫ ঢাকার ১৭-৭-৭২ তে দেয়া শাস্তি কেন বর্দ্ধিত করা হবেনা আইন

www.pathagar.com

অপূযায়ী ও রেকর্ড পত্র অনুযায়ী ২ পক্ষের উকিলের শুনানীর পর কারন দর্শাও নোটিশ অথবা এ ধরনের কোন নির্দেশ যা আপনি সঠিক ও ফিট মনে করেন জারী করে বাধিত করিবেন।

আপনার এ ধরণের দয়ার জন্য আবেদন কারী আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমি প্রত্যায়ন করিতেছি যে আবেদনে বর্ণীত ঘটনা সব ই রেকর্ড থেকে গ্রীহিত। অতএব আর কোন এফিডোভিটের প্রয়োজন নেই ।

এ হাসিব এডভোকেট ।

শাস্তি বাড়াবার জন্য সরকারের রিভিশন কেস ও ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আমার আপীল কেস হাই কোর্টে দায়ের হলো। এ উভয় কেসের রায়ের জন্য আমরা হাইকোর্টের প্রতি তাকিয়ে রইলাম।

এক দিনের ঘটনা

আগেই বলেছি জেনারেল কিচেনে স্বশ্রম কারাদন্ডের দন্ড হিসাবে আমার কাজ পাশ হয়েছে।

জেল খানার গোডাউনের সাথে কিচেনের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জেনারেল কিচনে আমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও গোডাউনে কেরানী নোয়াব আলীর নিকট কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পরিষ্কার মুখ, কালো ফ্রেমের প্রাচীন–চশমা চোখে। মাথায় সাদা চুলের মাঝে দু'একটা কালো চুল ও কদাচিত দেখা যায়। মুখে হাসি নেই। পাঞ্জাবী পায়জামা থাকতো সব সময় পরণে। কিন্তু এরপরও নিচের দিকে নজর না গেলে কেন জানি তাকে আমার ধুতি পরা বলে মনে হতো। শেখ মনি পরো যখন জেলে ছিলেন শুনেছি, তখন তাদের অনেক সেবা যত্ন করেছেন তিনি। এ জন্যই বোধ হয় চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর বাংলার বাণীতেই তার চাকুরী হয়েছে। সাত সকালে গোডাউনে এসে গোটা জেলখানার যাবতীয় রসদ সরবরাহ করা তার কাজ। এসেই একখানা টেবিলের পূর্ব পাশে পশ্চিম মুখী হয়ে বসে গম্ভীরভাবে হিসাবের কাজ করে যান তিনি। ওই দিনের লক আপের সংখ্যা অনুযায়ী নিদিস্ট রেটে হিসাবের কাজ করতে হয়। গোডাউন ও কিচেনে উভয় পক্ষ থেকেই রসদের হিসাবের কাজ করতে হয়। গোডাউন ও কিচেন উভয়ের পক্ষ থেকেই রসদের হিসাব শুরু হয় ভিন্ন ভিন্ন হিসাবের খাতায়। হিসাবটি ছিল খুবই সূক্ষ্ম। আমাকে প্রথম প্রথম ধরতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। এরপর অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

এ সময়ের একদিনের একটি ঘটনা। আজও মনে হলে দুঃখে ভরে উঠে মন। তখনো কষ্টের সীমা পরিসীমা পার হয়ে যায়নি। যে হারে জেলকোর্ড এখানে মালপত্র সরবরাহ করার নিয়ম বানিয়েছে অবিকল এই হারে, ও এ কোয়ালিটি সম্পন্ন মাল সরবরাহ করলে মোটামুটি চলে যায়। কিন্তু এ হারে এ বর্ণিত মানে মালপত্র গোডাউন থেকে আনা যায় না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা একটা নতুন অধ্যায়ে বলার আশা করি। সেদিন বিকালে জেনারেল কিচেনের অবশিষ্ট জ্বালানী কাঠ আনার জন্য যা সকালে একসাথে সব নিয়ে আসা

www.pathagar.com

হয়নি, কিছু কাজের লোক সাথে করে গোডাউনে গেলাম। আমার হাতে উর্দু একখানা বই। কাজের তদারকীর ফাঁকে ফাঁকে পড়ি। রসদ গুদামে গিয়ে পশ্চিম ভিটির একটা পূর্বমুখী গোডাউনের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই খানা পড়ছি। জেনারেল কিচেনের জ্বালানী কাঠ আনার জন্য আমার সাথে যাওয়া লোকগুলো গোডাউনের লোকজন থেকে খড়ি মেপে বুঝে নিচ্ছে। কেউ মাপা খড়ি মাথায় করে কিচেনের দিকে রওনা দিয়েছে। আমি কিন্তু বই পড়ায় বিভোর–এমন সময় হঠাৎ কেরানী সাহেবের গর্জনের শব্দ কানে ভেসে এলো।

প্রথমতঃ আমি বুঝতেইপারছিলামনা কাকে লক্ষ্য করে গর্জ'ন করতে করতে তিনি তার চেয়ার থেকে এভাবে তেড়ে আসছেন। বই পড়ার তন্ময়তা ভাঙ্গার সাথে সাথে বুঝতে পারলাম আমিই তার গর্জনের টার্গেট। অকথ্য গাল ঝরছে তার মুখ থেকে–"হারামজাদা শালা, তুই বাইরে কি করছিস আমি জানিনা? তুই ছিলি আলবদর কমান্ডার। হাজার হাজার লোককে খুন করে জেলে আইছছ। তোরে চেলি (কাঠ) দিয়ে পিটিয়ে এখনই আমি খুন করে ফেলবো। তোরা তোদের খড়ির সাথে গোডউনের খড়িও কেন নিয়ে যাস। ব্যাপারটি তখনো আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কেরানীর লাল চোখ, বিকট মুর্তির মুখ নিঃসৃত বাক্যগুলো কোন ভদ্রলোকের মুখ থেকে কি করে আর একজন ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে বেরুতে পারে–তাই আমার সজাগ সচেতন মন তখনো ভেবে চলেছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি থামুশ হয়ে অপলক নেত্রে।

জেলখানার প্রশাসন ব্যবস্থার অবস্থা অনুযায়ী চুপ করে থাকা ও নীরবে সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। কিন্তু দু'চোখের দুকুল বয়ে বাঁধভাঙ্গা স্রোত বয়ে চলতে শুরু করলো। এতক্ষণে মিনতি জানালাম আল্লার দরবারে? 'হে রাব্বুল আলামীন! কি জন্য আমাকে এত অশ্রাব্য গালাগাল দেয়া হলো তা এখনো আমি জানি না। এখানে এ ধরণের গালাগাল যারা খায় আমি তো তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। যদিও ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে আমি রাজনৈতিক অপরাধের শিকার হয়েছি ও সশ্রম কারাদন্ড ভুগছি। রাজনৈতিক অপরাধের স্বীকৃতি পাইনি, কোন ষ্টেটাস পাইনি। সাধারণ কয়েদীদের সাথে মিশে একজন সাধারণ কায়েদী হিসাবে বসবাস করছি। কিন্তু তুমি তো আমার সব অবস্থা জানো–তুমিই এর বিচার করো। বিচারকের মালিক তুমি।' আমার সাথে আসা কিচেনের লোকজনও হতবাক। আমাকে তারা অনুরোধ করে তাদের সাথে নিয়ে গেলো। পথে ওদের জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার। কেরানী সাহেব এত অশ্রাব্য গালাগাল করলো কেন? উত্তরে তারা বললো–খুব সম্ভব কেরানী সাহেব মনে করেছেন আমরা তার গোডাউনের ষ্টকের জ্বালানি কাঠ নিয়ে যাচ্ছি। আমরা যে সকালে রেখে যাওয়া আমাদের অবশিষ্ট জ্বালানি কাঠ নিয়ে নিচ্ছি তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। আমার মনোকষ্ট দুর করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে এ ধরণের নানা ব্যাখ্যা প্রদান করলো। তারা আমাকে সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে থাকলেও সাধারণ কায়েদী মনে করতোনা। এ সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সে সময় সমীচীন মনে করেনি। এমন কি এ কথা অন্তরঙ্গ ভাইদের কারো কাছেও প্রকাশ করিনি।

ওখানে অবশ্য চোরের আড্ডাই বেশী। গোডাউনে গেলে সুযোগ পেলেই ওসব চোরেরা চিনি, চা, তেল, মরিচ পেয়াজ, গুড় ইত্যাদি চুরি করে। কোন লোককেই বিশ্বাস

www.pathagar.com

করতে পারা যেতোনা । তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ উঠিয়ে চশমার উপর দিয়ে চারদিকে দৃষ্টি রাখতেন কেরানী সাহেব।

ঘটনার পরের দিন থেকেই চৌকার কাজের লোকজন নিয়ে আমি গোডাউনে যাই। নীরব নিশ্চুপ ভাবে লকআপ ফিগার নিয়ে হিসাবপত্র শেষ করি। কথাবার্তা অবশ্য আগেও কমই বলতাম। কেরানী সাহেবের সাথে আমার হিসাব মিলিয়ে চৌকার মালপত্র নিয়ে চলে আসি। তার সাথে একটু টু শব্দও করিনা। দুচার দিন পর কেরানী সাবের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তিনি মাঝে মাঝেই দুএকটা কথা বলতে শুরু করলেন। আমি সামান্য কথায় উত্তর দিয়ে ক্ষান্ত হতাম।

গোডাউন ক্লার্ককে, ভোরের রাউন্ড শেষে অফিসে বসে জেলার সাহেব মাঝে মাঝে ডাকতেন। আগে এ ধরনের খবর আসলে তিনি গোডাউন থেকে সকলকে বের করে দিয়ে তালা মেরে অফিসে চলে যেতেন। তার আবার ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা বেকার বাইরে অপেক্ষা করতাম।আজকাল কেন জানিনা, কেরানী সাহেবের এ অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করলো। এখন থেকে জেলার সাহেব ডাকলে তিনি আমাকে ভিতরে রেখে সকলকে বের করে দিয়ে বাহির থেকে তালা লাগিয়ে দিতেন। যাবার সময় বলে যেতেন আপনি হিসাবটা শেষ করে ফেলুন। চৌকার মালামাল নিতে যেন দেরী না হয় আমি পরে হিসাব মিলিয়ে নেবো। আমি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আল্লাহকে স্মরণ করে মনে মনে বলতাম, এমন কি ঘটে গেলো হে আল্লাহ! যে কেরানী সাহেব কিছুদিন আগে এমন অকথ্য গালিগালাজ করলেন। আমাকে চোর পর্যন্ত বললেন। আজ কি কারণে আমিই তার কাছে একমাত্র বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলাম! আর সব অবিশ্বস্ত। শুকুর তোমার দরবারে সব পাওনার জন্য।

১৯৭৩ এর এপ্রিলের শেষের দিকে ৫ খাতায় একদিন আমি ফজরের নামাজের জামায়াতে দাঁড়ানো থেকে পড়ে যাই। তখন আমরা ও খাতায় থাকতাম। কিছুক্ষনের মধ্যে কয়েক বার পায়খানাও হলো। দু'একঘন্টা পর জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। ওখানে রাতে অনেকবার পায়খানা হলো। রক্ত আমাশয় রূপ নিলো রোগ। কেস্টেইন নামে পরিচিত এক চামার ডাক্তার আমাশয় ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন। ঘন ঘন পায়খানায় কারণে খুবই দুর্বল হয়ে গেছি। তার পরও আমাকে সুচিকিৎসার জন্য তার সুমতি হয়নি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কতবার পায়খানা হয়েছে। উত্তরে আমি বললাম অনেকবার। বিদ্রুপ করে তিনি বললেন পঁচিশ'বার? পঞ্চাশ'বার? একশতবার? হাজার বার? ২ হাজার বার? আমি তার বিদ্রুপের কারণ বুঝে কোন কথা বললাম না। তার চিকিৎসাও গ্রহণ করলাম না। এ ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলো পাবনার ছোট ভাই বেলাল হোসেন। আগেও অনেক ছোট ভাই চাইতো আমি মাঝে মাঝে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করি। প্রয়োজন হয়নি বলে কোনদিন যাইনি। তাছাড়া কাজে ডুবে থাকতেই মন চাইতো। আজ অসুখের কারণে হাসপাতালে আসাতে তারা খুশী ও সেবা-শুশ্রূষার প্রতি খুবই যত্নশীল হলো। ডাক্তারের ওই ব্যবহারে তারা অসন্তুষ্ট। কাজেই বিকালে তারা কৌশলে কম্পাউন্ডারকে হাসপাতালে

www.pathagar.com

ডেকে এনে সুচিকিৎসার জন্য আমাকে মহাখালী কলেরা হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলো।

কম্পাউন্ডার সাহেব ছিলেন খুব ডাকসাইটে।নামে যা-ই হোক কাজে কোন অবস্থাতেই তার ক্ষমতা ডাক্তারদের চেয়ে কম ছিলনা। পরের দিন ভোরে একজন পরিচিত সিপাহী মিনিউট অনুযায়ী মহাখালীতে কলেরা হাসপাতালে নিয়ে গেলো আমাকে। জেল খানার ডোরাকাটা পোষাকের আসামী বলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার আমাকে দেখে হাসপাতালে ভর্তি করে নিলেন। সিপাহীটির ভদ্রতা বিশ্বস্ততা আজো আমার মনে জাগে। প্রতিটি নামাজের সময় অনেক বছর পর কয়েদী হয়েও একা একা গিয়ে জামায়াতে নামায় পড়ে আসি। মাঝে মাঝে মসজিদে নামাজের পর শুয়ে গড়াগড়ি করি। আবার হাসপাতালে ফিরে আসি সিপাহীটির কাছে। যেন আমি একজন প্রভূ ভক্ত শিকারী কয়েদী।

এ অবস্থায় রাতে ঘটলো এক বিপত্তি। এ সিপাহীটিকে রিলিজ দেবার জন্য যখন রাতের প্রহরী সিপাহী জেলখানা থেকে আসলো। তার কাছে আমি অপরিচিত। আগের সিপাহীটি আমাকে এ ভাবে শৃংখলমুক্ত রাখাতে সে আশ্চর্য হলো। অবশ্য সে বলে গেলো আমার নিকট তিনি বিশ্বাস্য ব্যক্তি-খুব ভাল মানুষ। আমি তাকে মুক্ত রেখেছি। এখন তোমার ইচ্ছা। তখন আমি ডোরাকাটা পোশাকের উপর হাসপাতালের পোশাকে আচ্ছাদিত। এ সিপাহীটি আমাকে হ্যান্ডকাপ না পরায়ে স্বস্তি পাচ্ছে না। আমি তাকে বললাম, আমি কোন অবস্থাতেই পালাবো না। তবে আপনি হ্যান্ডকাপ লাগালেও আমার কোন আপত্তি থাকবে না। আমার কথা শুনে যেন তাঁর দ্বিদাগ্রস্থতা কাটালোনা। নিঃসংকোচ সিপাহীটি আমার বাম হাতের কব্জিতে হ্যান্ডকাপ পরায়ে একটু লম্বা করে খাটের পায়ার সাথে বেঁধে রাখলোন। রাত এভাবেই কাটলো শান্তভাবে। এতে আমার মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। এ সবই আল্লার জন্য-এ ভাবই আমার মনে জাগতো। পরের দিন সকাল ৭টার দিকে আবার কালকের সেই প্রথম সিপাহীটিই ডিউটিতে এলো। রাতের প্রহারায় নিয়োজিত সিপাইটির কাছ থেকে আমাকে বুঝে নিয়ে তার সামনেই আমাকে হ্যান্ডক্যাপ মুক্ত করে দিলো। আমি স্বাভাবিক ভাবেই এটাকে গ্রহণ করলাম। মানসিকভাবে খুশী হলেও তা প্রকাশ করলাম না। আমার পাশে তখন কবি শুকান্তের একটি কবিতার বই। রাতে ডিউটিরত ও দিনের ডিউটিতে আগত ডাক্তাররা ডিউটি বুঝে নেবার এক পর্যায়ে আমার পাশে একত্রিত হলেন। আমার গায়ে ডোরাকাটা পোষাকের জন্য তাদের ঔৎসুক্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো আমার উপর। জেল হতে প্রেরিত মিনিউটের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমাকে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন তারা। আমি অকপটে আমার প্রত্যেকটি ইতিহাস তাদেরে বলে শুনালাম। একজন ডাক্তার কবি শুকান্তের বইটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা আবার এসব বইও পড়েন? দেখতেই তো পাচ্ছেন। আমাদের কাছে মার্ক্সের কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো থেকে শুরু করে দাস ক্যাপিটাল-সহ কমিউনিজমের উপর লিখা সব বই আছে। আগত ডাক্তার সহ আমার ঔষধ পত্র সম্পর্কে কিছু কথা বলে তারা চলে গেলেন। এদের কথোকথনের সময় পাশেই দাঁড়ানো ছিলো কর্তব্যরত একটি বাগাড়ম্বর মহিলা নার্স। তারা চলে যাবার পর এ নার্সটি ঔষধ দিতে এসে আমাকে নতুন করে কিছু কথা জিজ্ঞেস করে। তখন বাজারে চালের দাম

www.pathagar.com

আগুন। সারা দেশের মানুষ আটা নির্ভর। আমার ইতিহাস ও শান্তির কথা শুনে মহিলা নার্সটি সিপাহীটির সামনে বলে উঠলো, "আপনি এখানো শুয়ে আছেন কেন? জানালা তো একেবারে খোলাই আছে। লাফ দিয়ে পড়ে চলে যান। অনাহুত এত কষ্ট করবেন। মাসীমার বদৌলতে দেশ স্বাধীন করে আজ খেতে পাইনা। দু'এক পা চালের ব্যবস্থা হলে বাচ্চাদের ভাত পাকিয়ে খাইয়ে দেই। নিজেরা রুটি। আর যে দিন চালের ব্যবস্থা হয় না সে দিন বাচ্চাদের করুন অবস্থা দেখলে বুক ফেটে কান্না আসে। আমি হেসে বললাম এতে আমার কোন মন্তব্য নেই। জেলে কোন রকমে আমাদের কেটে যায়। বাচ্চাদের কান্না-কাটা দেখার সুযোগ আমাদের হয়না বলে এ দুঃখ অনুভব করিনা। তবে আমরা কোন আইন অমান্য করি না। এই মিয়াসাব (জেলে সিপাহীকে মিয়াসাব বলে) যদি আমাকে নিয়ে জেলে ফিরে যাবার সময় কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে মরে যায় আর আমি বেঁচে যাই হলে আমি পালাবার সুযোগ না নিয়ে জেল গেটে ফিরে গিয়ে আমার পরিচয় দিয়ে সিপাহীদের দুর্ঘটনার খবর দেবো ও নিজে আমার নিবাস স্থল কারাগারে ঢুকবো। আমার কথা শুনে মনে হলো নার্সটি আশ্চর্য হয়েছে।

দ্বিতীয় দিন থেকেই পরের সিফ্‌টের সিপাহীটি আর হ্যান্ডকাপ পরায়নি। এরা দু'জনেই আমাকে পালাক্রমে পাহারা দিতো। এভাবে দীর্ঘ চারদিন যাবৎ কয়েদী আসামী হয়েও যে মুক্ত মানুষের মত মসজিদে যেতাম, নামাজ পড়তাম মাঝে মাঝে আশে পাশে একটু বেড়িয়ে আবার সিপাহীর কাছে চলে আসতাম। এ সময় এ হাসপাতালে কোন কোন সময় আমার মনে জাগতো যদি আমার আপন জনদের কেউ এখানে দেখতে আসতো তবে কতইনা স্বাধীনভাবে মন খুলে খুলে কথা বলতে পারতাম। জেলে তো এত সুযোগ নেই। জেল থেকে আসতে ছোট ভাইরা বলে দিয়েছিলো আপনি যান। আমরা বাইরে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। খবর তারা পাঠাইয়েছিল কিনা জানিনা কিন্তু মহাখালীর হাসপাতালে সে সময় কোন আপনজনকে দেখার খুশী মনে লয়ে করাগারে ফিরে আসতে পারিনি। এজন্য কোন দিন কারো উপর আমার কোন অভিমান জাগেনি।

চার দিন পর মহাখালী কলেরা হাসপাতাল থেকে জেল হাসপাতালে ফিরে আসি। পরের দিন দুপুরের দিকে গোডাউনের কেরানী নওয়াব আলীকে হাসপাতালের আমার ওয়ার্ডে হন্নে হয়ে কাউকে খুজতে দেখি। আমি ওয়ার্ডের এক কোনে একটু অন্ধকার থেকে তাকে লক্ষ্য করছি। আমার ধারণা ছিলো বাহির থেকে নতুন আসা তার কোন নিজস্ব লোককে খুজছেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই কেরানী সাহেব ঘুরে ঘুরে আমার সিটে এসে বসলেন। আমি কিছুটা বিস্মিত। আমি কিছু বলার আগেই অমাকে বলতে শুরু করলেন, "আমি পরে শুনেছি, আপনি অসুস্থ হয়ে মহাখালী হাসপাতালে চলে গেছেন। সময় সুযোগ করে উঠতে পারিনি। নতুবা ওখানে গিয়ে আপনাকে একবার দেখে আসতাম। আজ আবার শুনলাম আপনি মহাখালী থেকে ফিরে এসেছেন। তাই দেখতে এলাম। বলুন তো আপনি এখন কেমন? পথ্য কি? কি খেতে মন চায়? যা দরকার আমার কাছে বলুন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।বিনীত ভাবে বললাম আমি, "আমার তো কিছুর প্রয়োজন নেই। যা দরকার তা হাসপাতল থেকেই পাই। আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন এতেই আমি

www.pathagar.com

খুশী।" কেরানী সাহেব ধারণা করছেন আমি গোডাউনের সেই অপ্রীতিকর ঘটনা ভুলতে পারিনি। তাই আবারো আগের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন।

এই সময় মূলতঃ আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭০ এর নির্বাচনী প্রচার প্রপাগান্ডায় ওয়াদাকৃতে ২০.০০ টাকা মণ দরের চাল খাওয়ানোতো দূরের কথা ২০.০০ টাকা সের দরেও চাল সরবরাহ করতে পারছিলনা। জেলখানায় তো চাল সরবরাহ বন্ধই করে দিয়েছিলো। মেডিকেল গ্রাউন্ড না থাকলে প্রত্যেককে ৩ বেলাই আটা খেতে হতো। আর আমি নিজেও ৩ বেলা আটা খাবার শিকারে পরিণত হয়েই রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে কলেরা হাসপাতালে যাই। কলেরা হাসপাতালের ডাক্তার মেডিকেল গ্রাউন্ডে আটা না খেয়ে কিছু দিন চাল খাবার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলো। কেরানী সাহেবের পীড়াপীড়ি দেখে তাকে এ কথাটাই বললাম। শুনে তিনি খুশী হয়ে বললেন–"ঠিক আছে যে করেই হোক জেলখানার ডাক্তার দিয়ে আপনার হিস্ট্রি টিকেটে বাইরের ডাক্তারের অর্ডারটি লিখিয়ে নেবেন। আমি গোডাউন থেকে চাল দেবার ব্যবস্থা করবো। আমি বললাম, ৫/৬ হাজার লোকের জন্য তৈরী হয় রুটি। এতবড় একটা রন্ধনশালায় আমি একজন লোকের জন্য ১০ ছটাক চাল নিয়ে কি করবো? কোথায় রাঁধবো? কিভাবে খাবো? " উত্তরে তিনি বললেন, সব ব্যবস্থা করে দেবো আমিই। এবার তাঁর অনুকম্পা প্রত্যাখ্যান করতে পারা গেলোনা। হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ হয়ে যখন বেরুলাম জেলার শামসুর রহমান সাহেব আবারও আমার কাজ পাশ করলেন জেনারেল কিচেনেই। কর্মরত জায়গা হতে অসুখ বিসুখ ইত্যাদি কারণে একবার সরে গেলে নতুন করে কাজ পাশ করতে হয়। এক জায়গায় সাধারণত দ্বিতীয়বার কাজ পাশ হয় না।

সাধারণ রন্ধনশালার দায়িত্বশীল হিসাবে কয়েকদিন পরে এক সোনালী সকালে গোডাউনে গেলাম মালপত্র হিসাব করে আনতে। আমাকে দেখে কেরানী সাহেব খুব খুশী হলেন। এবার বসার বিশেষ ব্যবস্থা করে দিলেন। হাসপাতালে কোন কোন রোগীর জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ভাত রান্না করা হয়। হাসপাতালের রন্ধনশালা আলাদা। সেখানকার দায়িত্বে নিয়োজিত মেটকে (কনভিকট ওভারশিয়ার) ডেকে কেরানী সাব আমার দু'বেলা খাবারের জন্য১০ ছটাক চাল দিয়ে বলে দিলেন, "রোগীদের রান্নার সাথে এ ১০ ছটাক চালের ভাত খালেক সাহেবকে ২ বেলা পাঠিয়ে দিও। কোন অসুবিধার সৃষ্টি হলে সাথে সাথে আমাকে এসে জানাবে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে মেটটি চলে গেলো।' ৭৩ এর মে থেকে ১৯৭৬ সনের মে'র ৩ তারিখ অর্থাৎ আমার মুক্তি পর্যন্ত এ ১০ ছটাক চাল আমি পৃথকভাবে পেতাম। তবে শেষের দিকে যারা খাওয়া দাওয়ায় কষ্ট পেতো তারা এর থেকে উপকৃত হতো। আমার রিলিজের পর এ চালের সুযোগটা ট্রেলফার করে আসি ছোট ভাই ৪০ বছরের সাজা প্রাপ্ত খলকার আমিনুল হকের কাছে। সব ক্ষেত্রেই শুরুর সব কষ্ট পরিশেষে আল্লাহ এভাবে সহজ ও তাঁর খাস রহমত দ্বারা পরিবেষ্টিত করে দেন। আল্লার শুকুর আদায় করার ভাষা আমার কাছে নেই।

www.pathagar.com

জেল খানার প্রশাসন

মানুষের বসবাস যেখানে সেখানেই একটা সমাজ গড়ে উঠে। যেখানে সমাজ গড়ে উঠে সেখানেই একটা নিয়ম শৃংখলার প্রয়োজন হয়। আর এ নিয়ম শৃংখলা রক্ষা করার জন্য বিধি বিধান প্রয়োজন। বিধি বিধানের প্রয়োগের জন্য প্রশাসন প্রয়োজন। জেলখানাও একটা জগত একটা সমাজ। এখানেও প্রশাসন আছে। আইন শৃংখলা ঠিক রাখা ও অপরাধিদের শাস্তি বিধান কার্যকর করার জন্য কারাগারের সৃষ্টি অতি প্রাচীন কালীন ব্যবস্থা। নবী রাসূলদের ইতিহাস বিশেষ করে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবন ইতিহাসে কারাগারের পরিচয় আমরা পাই। আরব দেশে খিলাফত আমলে ও কারাগার ব্যবস্থার আভাষ মিলে। ইমাম আবু হানীফা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সহ বেশ কিছু মনিষী কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন। পাক-ভারত বাংলা দেশীয় উপমহাদেশে কারাগারে প্রথম রূপ কবে কেমন করে শুরু হয়, সে ইতিহাস আমার অজানা। তবে কারাগারের বর্তমান সিস্টেম, খাওয়া দাওয়ার একটা নির্দিষ্ট হার, চলা ফিরার নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি, ওখানে কোন আইন শৃংখলা অমান্য করলে এর প্রতি বিধান কি, এসব কিছুর বোধ হয় উদ্ভাবক ও আইন রচয়িতা হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ। আর এ বিধানটাকে বৃটিশ আমল থেকে চলে আসা 'জেল কোড' বলা হয়।

এখানে যে সব সময়ই দুষ্ট ও দোষী অপরাধী মানুষই আসে এমনও নয়। ভাগ্যের ফেরে মানুষের চক্রান্তে ও ষড়যন্ত্রের ফলে সব সময়ই কিছু কিছু ভালও সৎ এবং নির্দোষ নিরপরাধ মানুষও কারার এ লৌহ যবনিকার অন্তপুরীর মধ্যে বাস করেন। এমন কি কোন কোন সময় নির্দোষ নিরপরাধী ব্যক্তির ফাঁসি পর্যন্তও হয়ে যায়। তবে এ কথা অস্বীকার করার যো নেই যে দোষী অপরাধীই এখানে বেশী। আবার এ অপরাধও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। রাজনৈতিক কারণে আটক এমন কি শাস্তি প্রাপ্ত অনেক লোকও রাজরোষের শিকার হয়ে এখানে আসেন। সংশোধন ও সৎ চরিত্রবান বানাবার কোন ব্যবস্থা জেলখানায় না থাকার কারণ সহ আরো কিছু কারণের জন্য এখানে এসে আছে চরিত্রও হারিয়ে ফেলে মানুষ। ফলে এখানে আরো নানা অনাচারের সৃষ্টি হয়।

জেল কোড্ অনুযায়ী জেলখানায় টাকা পয়সা (কারিন্সি) রাখা অচল ও বেআইনী। এখানে প্রয়োজনীয় সব জিনিস-খাওয়া-দাওয়া, ঔষধ-পত্র, শাস্তি প্রাপ্তদের কাপড় চোপড় সবই নির্দিষ্ট হারে ,পাওয়া যায়। তবে জেল অফিসে আটক ও শাস্তি প্রাপ্ত আসামীদের পি, সিতে, ('প্রাইভেট ক্যাশ') বাহির থেকে পাঠানো টাকা জমা হতে পারে। অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন হলে পি.সির টাকায় সে দায়িত্বে নিয়োজিত সিপাহী দ্বারা বাজার থেকে তা কিনে আনতে পারে। এখানে অনুমোদিত চিঠি ছাড়া কোন চিঠি বাহিরে যেতেও পারেনা। আবার ভিতরে আসতেও পারেনা। কার্যত এ নিয়মের কোনটাই ওখানে পালিত হয় না। কোন টাকা ওখানে কারো কাছে পাওয়া গেলে একে জেল স্লাপলিং বলে। এর শাস্তি আছে। কিন্তু জেলে কোন বাজ এমন নেই যা টাকার বিনিময়ে করা যায় না। সিপাহী, জমাদার সুবেদার, সার্জেন্ট, ডিপুটি জেলার, জেলার এমনকি ডি, আই, জি, এবং আই , জি, ও এখানকার

www.pathagar.com

অনেক দুর্নীতির সাথে জড়িত। জেলখানার বহু খাবার জিনিস এদের বাসায় বাসায়ও চলে যায়। অবশ্য দু এক জন ব্যতিক্রমও আছে। ঘুষ দিয়ে এখানে এমন কোন কাজ নেই যা করা যায় না। এমন কোন চিঠি নেই যা এখান থেকে বাইরে, পাঠানো যায় না–রাষ্ট্রদ্রোহীতা মূলক চিঠিও। বেশী গুরুত্বপূর্ণ চিঠি হলে তা জেল অফিসার দিয়েও আনা নেয়া করা যায়। আমরা কিংবদন্তীর মত শুনেছি এখানকার একজন ডাকসাইটে কমপাউন্ডার পাকিস্তানের সময়ে জেলখানা হতে শেখ মুজিবের চিঠি পত্র বাইরে ও বাইর হতে ভেতরে আদান প্রদান করতেন। এমনকি এও শুনেছি যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে নিহত ও খন্দকার মোস্তাকের ক্ষমতায় আসার এবং খালেদ মোশারফের কু'র আগেও পরে শেখ মনির বন্ধু একজন জেলারের মাধ্যমেই করাগারে নিহত চার নেতা তাজুদ্দীন আহমদ মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও কামরুজ্জমান নিহত হবার আগ পর্যন্ত বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে। বাইরের জগতের সব ষড়যন্ত্র এইখানেও আছে। উৎকোচ দিয়ে ষযন্ত্রের মাধ্যমে এখানে মানুষকে বিপদে ফেলার একটা চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করার লোভ হজম করতে পারলামনা।

সাজা প্রাপ্ত হয়ে আমি সেলের কঠিন নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে কারাগারের প্রসস্ত এলাকার মুক্ত বাতাস সেবন করার সাধ পেয়েছি কয়েক মাস হলো। জেনারেল কিচেনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবার কারণে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী অবাধ ঘুরা ফিরা করার সুযোগ আমার ছিলো। আর আমিই ছিলাম তখন জেলে আমাদে লোকদের মধ্যে বয়সে বড়। এ কারণেই ভাইদের ছাত্র–অছাত্র সকলে আমাকে মুরুব্বি মানতো। তাদের সে সময়কার মমত্ব বোধ শ্রদ্ধা ভুলার নয়। কাজে কাজেই ছোট খাট কোন ঘটনা ঘটলে আমাকেই এর ফয়সালা করে দিতে হতো। এমনি একটি অভিযোগ বলার জন্য নোয়াখালীর বয়ো কনিষ্ঠ ছোট ভাই শাহজাহান জেল হাসপাতালের চৌহর্দি বেরিয়ে ১/২ খাতায় কেস টেবিলের কাছে আমার নিকট এলো। ও স্বভাবেই একটু বেপরোয়া ও স্পষ্টবাদী। কোন কোন সময় তার বয়সের তুলনায় কথার ওজন হয়ে যেতো বেশী। হাসপাতালে আবার অন্যরা এদেরে হিংসা করতো। বিপদে ফেলার সুযোগ খুঁজতো। এ দিন সে বেআইনীভাবে অনেক গেট ডিঙ্গিয়ে ১/২ খাতায় চলে আসার অপরাধ এবং মেডিকেল থেকে ঔষধ চুরি করে নিয়ে এসেছে এ অভিযোগে তৎকালীন, সি, আই, ডি জমাদার ইনসার্জ নানু ও জনৈক সিলেটি ম্যাট ওয়ার্ড হতে বের করে নিয়ে কেস টেবিলের নিকট তার শরীর তল্লাশী করছে। লুঙ্গি খুলে ঝাড়া দেবার সাথে সাথে ফুর ফুর করে কিছু টেবলেট পড়া শুরু করলো। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে ঘটনাটি দেখছি। কোন টেবলেট সে সাথে করে আনেনি অথচ লুঙ্গি খোলার সাতে সাথে ঝর ঝর করে টেবলেট পড়ছে দেখে শাহাজাহান বিস্ময় বিস্তরিত চোখে চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলো–"তোমরা কোরআন ধরে বলো, কোরআন হাতে নিয়ে বলো, আমি টেবলেট এনেছি। ঘুষ খেয়ে আমাকে মিথ্যা কেসে ফাঁসাবার ষড়যন্ত করছো। আল্লাহ সাক্ষী আমি কোন টেবলেট হাসপাতাল থেকে আনিনি। এই ম্যাট পয়সা খেয়ে হাতে করে টেবলেট এনে আমাকে হাসপাতাল থেকে সরাবার ষড়যন্ত্র করছে। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে চললো শাহাজাহান। সি, আই, ডি, জমাদার নানু শাহাজানের এ বেপরোয়া কথাগুলো শুনে এক

www.pathagar.com

শাহাজাহান। সি, আই, ডি, জমাদার নানু শাহাজানের এ বেপরোয়া কথাগুলো শুনে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। তার সাথে সে সময় আমার সম্পর্ক মোটামোটি ভাল। আমি তার কাছে ব্যাপারটা কি জানতে চাইলে সে মুচকি হেসে এক দিকে চলে গেলো। আমার আর বুঝতে বাকী রইলো না ঘটনাটা কি। শাহাজাহানের বেপরোয়া কথাগুলোর জন্য সে জঘন্য ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচলো বটে। আর নানু ও ছিল অপেক্ষাকৃত ভদ্র। নতুবা এ ধরনের ষড়যন্ত্রেমূলক ঘটনায় ওখানে ঘুষের ছড়াছড়ি হয়ে বেশ অনেকদূর গড়ায়।

যদি কারাগারের এ পরিবেশে শিক্ষার মাধ্যমে চর্চার মাধ্যমে, মানুষের ম.ধ্য নৈতিকতা বোধ জাগাবার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে দোষী অপরাধীর চরিত্রের বেশ সংশোধন ঘটতো। অপরাধী দোষী ব্যক্তি নয় বরং কারাগার থেকে একজন ভাল মানুষ হয়ে বের হতে পারতো। কিন্তু প্রশাসনিক অসততা অনিচ্ছা, অব্যবস্থা, দূর্বলতা ও ম্যাল প্রেকটিসের জন্য দোষী অপরাধী ব্যক্তি দোষ ও অপরাধের ক্ষেত্রে আরো অনেক শক্তিশালী অপরাধ প্রবণতার প্রশিক্ষণ নিয়ে জেল থেকে বের হয়। এতে অপরাধীর সংখ্যা যেমন বাড়ে তেমনি অপরাধের নৃশংসতা ও হিংস্রতাও বেড়ে যায়। অপরাধের শাস্তি বিধান ও ত্রুটিপূর্ণ। এমন শাস্তি বিধানের কি স্বার্থকতা, যদি বিধান মতো শাস্তি ভোগার পরও একই অপরাধ একই ব্যক্তি বার বার করে চলে।

জেলখানার গাইড্‌লাইন 'জেলকোড' ইংরেজ আমলের। এর পরও জেলকোডের নির্দেশনা অনুযায়ী যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার নিয়ে কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ না ক.র চলতে পারতো। কারাগারের অধিবাসীদের থাকা খাওয়ার তেমন কোন অসুবিধা হতোনা। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সেখানে অন্য রকম। প্রভাব খাটিয়ে, পুলিশকে হাত করে, ম্যাটদেরকে টাকা দিয়ে, জেল খানার করিন্দি-বিড়ি সিগারেট দিয়ে কিছু লোককে ঠকিয়ে না খাইয়ে রেখে কিছু লোক আবার পরম সুখে বাস করে। সাধারণ সন্ধনশালা মাল গুদাম কারাগারের দুই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এ দুটুর উৎসমুখ দিয়ে ইনমেটস রিপ্রেজেন্টেটিভ ও জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবহমান কাল থেকে হাজার হাজার লোকের খাদ্য সরবরাহ হয়ে থাকে। এ দুজায়গায় যে কত রকমের করাপশন আছে অভিজ্ঞতা সিক্তি ব্যক্তিরা ছাড়া তার হিসাব দেয়া দুস্কর। এ প্রসঙ্গে আমি সাধারণ কয়েদী হাজতী লোকদের জেলকোড অনুযায়ী মাথা পিছু দৈনিক খাবারের রেটটা উল্লেখ করলাম।

তৃতীয় শ্রেণীর খাবারের রেট

		প্রতি হাজতী	প্রতি কয়েদী
১।	চাল বা আটা (বেঙ্গল ডায়েট) ৩ বেলা	১০ ছটাক	১২ ছটাক
২।	ডাল "		
৩।	তরকারী (সব্জী)	৪ ১/২ " (এলাউন্সসহ)	৪ ১/২ " (এলাউন্সসহ)

www.pathagar.com

৪।	মাছ/গোশ্‌ত $\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}=$	$\frac{৩}{৪}$ বর্তমানে $১\frac{১}{২}$	$\frac{৩}{৪}$ "
৫।	জ্বালানী কাঠ	১০ "	১০ "
৬।	তেল	$\frac{৫}{১৬}$ "	$\frac{৫}{১৬}$ "
৭।	লবণ	$\frac{১}{২}$ "	$\frac{১}{২}$ "
৮।	মরিচ	$\frac{১}{৩২}$ "	$\frac{১}{৩২}$ "
৯।	হলুদ	$\frac{১}{৬৪}$ "	$\frac{১}{৬৪}$ "
১০।	ধনিয়া	$\frac{১}{১২৮}$ "	$\frac{১}{১২৮}$ "
১১।	পেয়াজ	$\frac{৯}{১২৮}$ "	$\frac{৯}{১২৮}$ "
১২।	তেতুল	$\frac{১}{৮}$ "	$\frac{১}{৮}$ "
১৩।	চিনি/গুড়	$\frac{১}{১২}$ "	$\frac{১}{১২}$ "

তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হাজতীদের এ হলো খাবারের রেট। ২য় ও ১ম শ্রেণীর কয়েদী হাজতীদের রেট অবশ্য আলাদা। যেহেতু তাদের সংখ্যা খুব কম, কাজেই সে ব্যাপারে আমি কিছু আলোচনা করলাম না। তবে সে সব বিভাগও দুর্নীতিমুক্ত নয়। উপরে বর্ণিত হার অনুসারে জেনারেল কিচেনের হিসাব পত্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে মালগুদাম থেকে মালপত্র হিসাব করে আনতে হয়। জেল কর্তৃপক্ষের রেজিষ্টারে এ হিসাবের কাচ্চা পরিমাণও ভুল হয় না। কিন্তু উল্লেখিত রেটে যে পরিমাণ মাল হিসাবে এলো, গোডাউন থেকে তা বুঝে নেয়াই হলো কঠিন ব্যাপার। কারণ যে মাল কনট্রাকদারদের মাধ্যমে যে পরিমাণে বাহির থেকে আমদানী হয়, তাই দৈনিক ষ্টক রেজিষ্টারে যোগ হয়। যে মাল দৈনিক সাধারণ রন্ধন-শালা সহ সকল রন্ধনমালায় যায় তা-ই দৈনিক ষ্টক রেজিষ্টার হতে বাদ যায়। হিসাবের ব্যতিক্রম করার কোন উপায় নেই। কিন্তু চোরাগুপ্তা পথে দৈনিকই যে মাল জেলের সেপাহীদের বড় বড় দুই পকেট পুরে, ব্যাগ পুরে বাইরে যায়। যায় জমাদার সুবেদার, কেরানীকুলসহ, ডিপুটি জেলার, জেলার এমন কি সুপারিন্টেডেন্ট, ডি, আই, জি ও আই জির বাসায়, সেগুলুর হিসাব লিখার তো কোন ষ্টক রেজিষ্টার নেই। সেগুলো আসবে কোথেকে? এ কারণেই সাধারণ কয়েদী হাজতীদের কিসমত মেরে শত শত লোককে অর্দ্ধাহারে অনাহারে

www.pathagar.com

রেখে, মাপে কম দিয়ে সেগুলো পাঠানো হয় বড় সাহেবদের বাসায় বাসায়। আর এসব করতে জেনারেল কিচেনের হিসাব রক্ষক রাইটারকে দেড় টাকা দামের এক প্যাকেট 'স্টার' বা 'রমনা' সিগারেট দেয়াই যথেষ্ট। নীতিবান সৎ লোকের ওখানে বড্ড অভাব। আর সাধারণতঃ দাগী আসামীরাই নিয়োজিত থাকতো এসব দায়িত্বে।

মরণ চাদের দই, রসগোল্লা ও ডিম সরবরাহ

জেলখানায় সাধারণভাবে একটু পরিচিত হয়ে উঠার পর একবার একটা ঘটনা ঘটলো। ১৯৭৩ এর প্রথম দিকে সম্ভবতঃ, গোডাউনে গিয়ে শুনি ষ্টকে ডাল নেই। বাইর থেকে ডাল সাপ্লাই হচ্ছেনা। জানিয়ে দেয়া হলো আজ জেনারেল কিচেনে ডাল যাবেনা। এত লোকের খাবার ডাল ছাড়া কি ভাবে চলবে? ১২/১৩ মণ ডাল লাগতো তখন দৈনিক। কেরানী সাহেবকে চাপ দিলে তিনি বললেন, যতদিন ডাল সাপ্লাই না হবে ততদিন ডালের পরিবর্তে বেশী করে তরকারী দিয়ে দেবো। এ দিয়েই কোন রকমে চালিয়ে দিতে হবে। চললোও বেশ কয়দিন এভাবে। আমি একজন ভদ্রলোকের মত হিসাব রাখছি দৈনিক কতমণ ডাল জেলারেল কিচেনে কম যাচ্ছে আর এ পরিবর্তে কতমণ তরকারী বেশী আসছে। যখন ডাল সাপ্লাই শুরু হলো ও অতিরিক্ত তরকারী সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলো। আমি একটা হিসাব দাঁড় করালাম। এতদিন পর্যন্ত না নেয়া ডালের মোট পরিমাণের কনট্রাক্টরেট হিসাবে মোট মূল্য কত। বেশী দেয়া তরকারীর মূল্যটাও বের করে ডালের মূল্য থেকে বাদ দিলে ডালের অবশিষ্ট মূল্যের বিনিময় চেয়ে বসলাম।

স্বভাবে একটু গম্ভীর লোক কেরানী সাহেব। তিনি চোখ না উঠিয়েই উত্তর দিলেন, যা দিয়েছি তাতেই হবে। ওইসব হিসাব নিকাশ এখন কোথায় পাওয়া যাবে? "আমার কাছে হিসাব আছে"–সুন্দর করে বলে দিলাম আমি। চোখ ছানা বড়া করে এবার তিনি আমার দিকে থাকালেন। বললেন, "হিসাব রেখেছেন?" "দেখি!" দেখালাম হিসাবটি তাকে। আর কোন কথা বললেন না কেরানী সাহেব। একদিন অপেক্ষা করে সুবেদার আবদুল কাদেরের মাধ্যমে জেলার শামসুর রহমান সাহেবকে ব্যাপারটি জানালাম। তাৎক্ষণিকভাবে শামসুর রহমান আমাকে ডাকলেন। আমি তাকে ব্যাপারটি খুলে বললাম। তিনি জানালেন ডি, আই,জি, জনাব কাজী আবদুল আউয়ালকে। তিনি ও আমাকে ডেকে খবরটি জানলেন। সাথে সাথেই ডি, আই, জি, সাহেব কেরানী সাহেবকে ডেকে এনে হুকুম দিয়ে দিলেন– জেল ইনমেটদের ডালের পাওনার মূল্য সমান তাদের অভিরুচি অনুযায়ীএকটা কিছু খাবার দিয়ে দিন।" কিন্তু এ হুকুম পালনের আগেই তিনি অবসর গ্রহণ করলেন চাকুরী হতে। আমি পরবর্তী কেরানী জনাব আবদুল মজিদ সাহেবকে আগে থেকেই ব্যাপারটি অবগত করিয়ে রাখলাম। তিনি ছিলেন একজন অতি ভদ্র ও চরিত্রবান ব্যক্তি। ডি, আই, জি, কাজী আবদুল আউয়াল সাহেবের সততা, ভদ্রতা ও উদারতার ইতিহাস তার কাছেই শুনেচি বেশী। মজিদ সাহেবের বাড়ী ছিল ঢাকার গজরিয়া এলাকায়। ডি. আই, জি, সাহেবের অনুমতিক্রমে তিনি

www.pathagar.com

আমাকে এ ব্যাপার সহ সকল ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন অপরিসীম। অফিসে আমার সম্পর্কে তাঁর আলাপ চারিতায় বোধ হয় আমার অনেক প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেছে।

এর পর থেকে জেলখানায় ইনমেটদের পাওনা থেকেই তাদের অতিরিক্ত খাবার ব্যবস্থা হলো। ফলে মরণ চাঁদের মিষ্টি, দধি কয়দিন পর পর মাথাপিছু একটা করে ডিম, পায়াস, গুলগুলা ইত্যাদি তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী আসামীরা পেতে শুরু করলো। এসবই ছিল ওখানে সাধারণ কয়েদীদের জন্য অভাবিত জিনিস।

চিনির অপচয় রোধ

জেল কোড অনুযায়ী জেলখানায় খাদ্য সরবরাহ তালিকায় ৮জনে ১ ছটাক করে তেতুল ১২ জনে এক ছটাক করে চিনি বা গুড় পেতো। তেতুল গুলিয়ে এতে চিনি বা গুড় মিশিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু চিনি বা গুড় মিশ্রিত তেতুল কেই খেতোনা। দিনের শেষে ড্রাম ভর্তি চিনিমেশানো তেতুল ড্রেনে ফেলে দেয়া হতো। তেতুলের জন্য তেমন মায়া না হলেও চিনির জন্য আমার বড্ড, মায়া লাগতো। চিনির পরিমান ২৭/২৮ সের হতো । এ বাহুল্য খরচটা কেন ঘাড়ে নিলো জেলকোর্ড তা নিয়ে আমি ভাবতাম। তথানুসন্ধানে বুঝলাম খরচটা বাহুল্য নয়। এত লোক এক সাথে একটা বদ্ধ জায়গায় থাকলে ভিটামিন সি' ও ডি'র অভাব পড়ে। ফলে স্কাবিজের অর্থাৎ খুজলী পাঁচড়ার মহামারী দেখা দেয়।

এত লোককে এত ভিটামিন 'সি' বা 'ডি' ঔষধ সাপ্লাই করা মুশকিল। তাই সহজলভ্য ও কম মূল্যের তেতুল সাপ্লাই করে বৃটিশ কারাগারে এই ভিটামিন 'সি'র অভাব পূরণ করার ব্যবস্থা রাখে জেল কোডে। তেতুলে চিনি মিশিয়ে টকের মাত্রা কমিয়ে নেয়া হতো। কিন্তু জেল কোডের এ উদ্দেশ্যের উল্টা ব্যাখ্যা প্রচারিত ছিলো জেলখানায়। গুজব ছিলো, ইংরেজরা তেতুল খাওয়ায়ে ভারতবাসীদেরকে পুরুষত্বহীন করার জন্য এ ব্যবস্থা করেছিলো। এ ভয়ে কেউ তেতুলের কাছ দিয়েও ঘেষতোনা। ফলে এ অপচয় ঘটতো। আর এ ব্যবস্থা অনুযায়ী তেতুল স্পর্শ না করার ফলে 'ভিটামিন' সির অভাব পূরণ হতোনা। আর বিকল্প ব্যবস্থাও সম্ভব ছিলনা বলে কারাগারে "স্কাবিজ ওয়ার্ড" নামে একটা বড় ওয়ার্ডের সৃষ্টি হলো। সে সময় তিন নম্বর খাতার পশ্চিম দিকের দুইটা বেশ লম্বা রুম জুড়ে ছিল এ ওয়ার্ড। খুজলী পাঁচড়ায় আক্রান্ত হলেই এখানে নিয়ে আসা হতো। আর এখানে আসলেই দেখা যেতো সকলেই শরীর চুলকাচ্ছে। চুলকানী আর চুলকানী চলতো অবিরাম গতিতে। চুলকাতে চুলকাতে কেউর পরনের কাপড় ছিড়ে হাটু পর্যন্ত এসে পৌঁছতো। কেউর তারও উপরে। কিন্তু চুলকানীর জ্বালায় তাদের কাছে কোন লোকজন এসে দাঁড়ালেও সেদিকে কারো লক্ষ্য থাকতো না। তাদের কাজেই তারা ব্যস্ত । কোন কথাবার্তা নেই মুখে। এ ওয়ার্ডের অনেকেই আধা পাগল, পুরা পাগল হয়ে যেতো। চাঁদপুরের রৌশন কামালের চাচা হাসান এ ওয়ার্ড থেকেই পাগল হয়ে বেরিয়েছে। আজও সে পাগল বদ্ধ পাগল মাঝে মাঝে ঢাকার রাজপথে তাকে দেখা যায়।

তেতুল ও চিনি এভাবে অপচয় হচ্ছে দেখে আমি কেরানী আব্দুল মজিদ সাহেবের সাথে পরামর্শ করে তেতুল চিনির দাম জমা করে সমপরিমাণ মূল্যের অতিরিক্ত খাবার দেয়া

www.pathagar.com

শুরু করলাম। এসব ব্যাপারে মজিদ সাহেবের সহযোগিতা আমি ভুলতে পারবনা। এ সময় বেশী লাভের উদ্দেশ্যে কোন কোন কনট্রাক্টর সরবরাহের নিমিত্ত তাদের বরাদ্দ মাল জেলখানায় সাপ্লাই দিতে চাইতো। যেমন চিনি দিয়ে পায়াস করা হতো। কারণ সে সময় চিনির চেয়ে গুড়ের কনট্রাক্ট রেট ছিলো বেশী। আর বাজারে গুড়ের দাম ছিল খুবই কম। কাজেই গুড়ের কনট্রাক্টর গুড় সাপ্লাই করার জন্য তদবির চালাতে লাগলো। এক পর্যায়ে সে কেরানী মজিদ সাহেবকে ধরলেন। তিনি জানালেন জেল ইনমেটদের ইনসার্জ গুড় সাপ্লাই না নিলে জেল-কর্তৃপক্ষের তা দিবার তো উপায় নেই। আর এখন যিনি জেনারেল কিচেনের ইনচার্জ তাকে তো কিনবার উপায় নেই। এখানে কেরানী সাহেব আমাকে প্রভাবিত করতে পারলে নিজেও উপকৃত হতে পারতেন। কিন্তু এ অশুভ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা তিনি করলেন না। এভাবে মাঝে মাঝে মাথাপিছু ১টি করে ডিমও দেয়া হতো জেলবাসীদেরকে।

সাধারন ক্ষমা

দিনে থাকি কাজ কাম নিয়ে ব্যস্ত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরিচিত ভাইদের সাথে দেখা সাক্ষাত আলাপ আলোচনায় প্রশান্তিতে ভরে থাকে মন। রাতে লক আপের পর বিভিন্ন গ্রোগ্রামে মগ্ন থাকি। কারাগারে আছি বলে মনে কোন দুঃখ নেই। বাইরের জগত সম্পর্কে নেই তেমন কোন উৎসাহ। তখন ১৯৭৩ সন বয়ে শেষ হয়ে আসছে। রাজনীতি সজাগ সিপাহী জমাদার সুবেদারদের সাথে তখন আলাপ জমতো অন্তরঙ্গভাবে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ধারা সম্পর্কে। সুবেদার আবদুল ওয়াহেদ মৃধা জমাদার ইনচার্জ ইসহাক সহ অনেকেই তখন শেখ মুজিবের "সাধারণ ক্ষমার" কথা বলতেন। তারা নীতিগতভাবেই শেখ মুজবিবের ভক্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর উদারতার দৃষ্টান্ত দিয়ে কলারোটের এ্যাটে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত লোকদের ছেড়ে দেবার কথা তারা আন্দাজ অনুমান করে বলতেন।

সম্ভবতঃ ১৯৭৩ সনের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে একদিন সকালে জমাদার ইনসার্জ ইসহাক ভিউটিতে এসে খুবই উদ্দীপনা সহকারে সকালের খবরে প্রচারিত শেখ মুজিবের 'সাধারণ ক্ষমা, প্রদর্শনের ঘোষণার কথা শুনালেন। জেলখানায় তখন আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার সহ সাজাপ্রাপ্তদের অধিকাংশই ছিলেন কলাবোরেটর এ্যাটে অভিযুক্ত লোক। মূহুর্তের মধ্যে গোটা কারাগারে ছড়িয়ে পড়লো খবর। মৃদু গুঞ্জরণ শুরু হয়েছে চারিদিকে। জেল গেটে অফিসে গিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করেও তাই শুনা গেলো। সকাল ১০ টার দিকে সংবাদ পত্রের মাধ্যমেও খবরের সত্যতা সম্পর্কে নিসন্দেহ হওয়া গেলো। এদিকে আটক বন্দীদের আত্মীয় স্বজনের ভীড়ও জমতে লাগলো জেল গেটের ভিতরেও বাইরে। তারাও নিজ নিজ লোকদের নিকট সাধারণ ক্ষমার শুভ সংবাদ পাঠাতে লাগলো। সব 'ধারা' ক্ষমায় পড়েনি সেগুলো ব্যতিক্রম হিসাবে পত্রিকায় উল্লেখ করে দিলো। ম্যান্টাল এরিয়ার দশ সেলে তখন থাকতেন পতর্ণর মালেক সহ ৯ মাসের মন্ত্রি সভার প্রায় সব কয়জন মন্ত্রী। জনাব আব্বাস আলী খান ছাড়া জনাব মাওলানা এ, কে, এম ইউসুফ জনাব

www.pathagar.com

এ, এস, এম, সোলায়েমান ও জনাব তথ্যমন্ত্রী এডভোকেট মুজিবুর রহমান সহ সকলেই থাকতেন হাইয়ার ক্লাশিফিকেশন নিয়ে এ সেলে। তাদের সাথে দেখা করলাম।হর্ষোৎফুল্য চেহারা সকলেরই। সকলের মুখে একই কথা একই আলোচনা। খবরের কাগজে প্রকাশিত ক্ষমাকৃত ধারার মধ্যে ৩৬৪ ধারাও সন্নিবেশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে আমার শাস্তি হয়েছিল এ ধারায়ই। কিন্তু আমার মনে কেন জানি একটা সন্দেই সংশয়ের ভাব জেগে উঠে। আমার শাস্তি বাড়িয়ে ফাঁসি অথবা যাবৎজীবনের বিল জাতীয় সংসদে পাশ করে হাইকোর্টে রিভিশন কেস দায়ের করা হয়েছে। এমন জঘন্য কেসের ধারা সাধারণ ক্ষমার আওতায় অন্ততঃ আমার কারণে পড়তে পারে না বলে আমার মনে সন্দেহ আস্তে আস্তে ঘনীভূত হতে লাগলো। কারণ আমার মত একজন নগণ্য নির্দোষ লোককে ফাঁসাবার জন্য কত ছল চাতুরী, বাহানা সহ জাতীয় সংসদে আলোচনা এমন কি বিলও পাশ হলো। আমি আমার মনের গোপন সন্দেহটা শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের কাছে প্রকাশ করলাম। তিনি একজন আইনজ্ঞ। তাছাড়াও আত্মীয় সূত্রে 'নানা সম্পর্ক। নানা-নাতি হিসাবে কি না অন্য কারণে জানিনা তিনি একটু আদরও করতেন আমাকে। আমার কথা শুনে তিনি তেড়ে উঠলেন। বললেন, "মাওলানা! এত সন্দেহ প্রবণ হওয়া ঠিক নয়। ধারা উল্লেখ করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকা সহ সব প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আর সন্দেহ প্রকাশের কি কারণ থাকতে পারে?" ধমক খেয়ে আমি খামুশ হয়ে গেলাম। এ কথার বিপক্ষে দাঁড় করাবার মত কোন যুক্তি আমার কাছে নেই। কিন্তু এরপরও সন্দেহ রয়েই গেলো আমার মনে। এ অব্যক্ত সন্দেহ মনে নিয়ে একজন জেলখানা রাইটারের প্রতীক-জেনারেল কিচেনের হিসাবের খাতাটা বোগলদাবা করে, মেন্টাল এ্যারিয়ার দশ সেলের এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। আসতে জনাব মাওলানা এ, কে, এম ইউসুফের সাথেও ওই দশ সেলের অন্য রুমে দেখা করে আসলাম । কিন্তু তাঁর নিকট মনের গোপন সন্দেহের কথা প্রকাশ করলামনা।

ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই সাধারণ ক্ষামার ঘোষণা অনুযায়ী কিছু কিছু লোককে মুক্তি দেয়া শুরু হলো। দেখতে দেখতে বেশ কিছু লোক বেরিয়ে গেলো। এমন কি আমার শাস্তি প্রাপ্ত ৩৬৪ ধারার ও কিছু লোক মুক্তি পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে গেলো। আমার নিজস্ব লোকদের পাঠানো কিছু সংবাদও এমন পাওয়া গেলো। বুঝা গেলো, আমরা 'সাধারণ ক্ষমার' আওতাভুক্ত হয়ে মুক্তি পাচ্ছি। তখন মনে উত্থিত সন্দেহের নিরসন ঘটে। এবার কারার অক্টোপাশ থেকে মুক্ত হতে যাচ্ছি; মনে এমন ভাবের উদয় হলো।

ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে বিজয় দিবসের আগে আগে ক্ষমা প্রাপ্তদের ছেড়ে দেয়া হবে। দলমত নির্বিশেষে সব লোকই যেন এবারকার বিজয় উল্লাসে যোগ দিতে পারে-এমন ধরনের প্রচারণা। বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ সহ মালেক কেবিটেনের প্রায় সকল মন্ত্রীই মুক্তি পেয়ে গেছেন। এ সময় যে সব ধারার অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনের আওতাভুক্ত করা হয়নি, একই সাথে তাদেরও মুক্তির দাবী জানিয়ে সরকারে নিকট একটি স্মারক লিপি পেশ করার জন্য অনেকেই নেতৃবৃন্দের নিকট অনুরোধ জানায়। কলাবোরেটর এ্যাক্টে বিচারাধীন বন্দী ও

www.pathagar.com

সাজা প্রাপ্তদের সকলকে একত্রে ক্ষমা না করলে ও মুক্তি না দিলে দল নেতারা কারাগার থেকে বের হবেন না 'সাধারণ ক্ষমা' গ্রহণ করবেন না এ ছিল অনুরোধের সারমর্ম। ধারনা ছিলো এমন দাবী যদি নেতৃবৃন্দ বুকের পাটা শক্ত করে পেশ করতে পারেন, তাহলে সরকার হয়ত আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে মুখ রক্ষা করার জন্য তা মেনে নিতেও পারেন। কিন্তু এ পরামর্শের প্রতি কেউ লক্ষ্য আরোপ করার সুযোগ পাননি। বরং ডি, সির অফিসে নিজ নিজ লোকদেরকে পাঠিয়ে তদবির করিয়ে বন্ড সেই করে কার আগে কে বের হবেন সে গোপন প্রতিযোগিতাই চললো শান্তভাবে। জনৈক নেতাতো আমাদের প্রস্তাবের পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন করে বললেন, "আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়েই বরং বাকীদের মুক্তির ব্যাপারে তদবির চালাতে পারবো।" মুক্তির পর তাদের কাউকে এ তদবীর করা তো দূরের কথা কোন খোঁজ খবর নিতেও দেখা যায়নি।

১৬ ই ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত নেতৃবন্দের আর কেউ জেলখানায় অবশিষ্ট রইলেন না। রয়েছেন তারা যারা নেতাদের হুকুম পালন করে কাজ করে, রাজনৈতিক মর্যাদা হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন জেলখানায় বিভিন্ন জঘন্য ও মিথ্যা ধারায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে। এদের ক্ষমার আওতায় ফেলা হয়নি। আর এমন কিছু লোকও রয়ে গেলেন যাঁরা পূর্ব ঘোষনা অনুযায়ী ক্ষমার আওতায় পড়েছেন, কিন্তু তারা মুক্তির আদেশ পাননি।কোর্ট থেকে আদেশ আসবে এ আশায় আশায় তারা সকলেই জেল গেটের দিকে তাকিয়ে ছিলো। বিকালের পর শুনা গেলো, কে, কে, এখনো রিলিজ পাননি তা সরে জমীনে তদারক করার জন্য কোর্ট থেকে লোক আসবেন। এবার সে আশায় প্রহর গনা হচ্ছে। এলেনও কোর্ট থেকে কয়েকজন ম্যাজিষ্ট্রেট সহ তৎকালীন স্পেশাল পি পি জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন। ট্রাইবুনাল কোর্টে আমার বিপক্ষ দলীয় উকিল (পি পি)। তারা সর্ব শেষ বারের মত ক্ষমাপ্রাপ্ত আরো কিছু লোক রিলিজ দিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যার দিকে তারা যখন চলে যাচ্ছিলেন একজন ম্যাজিষ্ট্রেট সহ পি, পি সাহেবকে আমার পরিচয় দিয়ে ৩৬৪ ধারার অভিযুক্ত ও অপরাধীদের 'ললাট লিখন' সম্পর্কে জিজ্ঞেন করলাম। কারণ এ ধারার তখনো অনেক লোক জেলে রয়ে গেছে। অথচ এ ধারাটিও ক্ষমা অন্তর্ভূক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অত্যন্ত ধরা গলায় বললেন, "এ ধারার ব্যাপারে" সরকার Stayorder (আদেশ রহিত) করে দিয়েছেন। পি, পি সাহেব মৃদু হেসে বললেন, এসব রাজনৈতিক ব্যাপার। তবে আগ-পর আপনারা সকলেই একদিন বেরিয়ে যাবেন। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এ ধারার অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত বেশ কিছু লোক তো এ কয়দিনে বেরিয়ে গেছে। জবাব দিলেন যারা বের হতে পারেননি ----- আদেশ রহিত করার প্রেক্ষিতে আবার বিবেচনা করার আগে আর কেউ বেরুতে পারবেনা।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভাগ্যের কথা ভাবলাম। খুবই মনোপীড়া অনুভত করলাম। এ রাতটি আমার বিনিদ্র কাটলো। বলতে গেলে জেল জীবনে এ রাতটির মতো কঠিন রাত আমার আর কোনদিন কাটেনি। ক্ষমা ঘোষণার পর থেকে উত্থিত আমার মনের সন্দেহেরই বাস্তবায়ন ঘটলো। তখন জনাব এডভোকেট মুজিবুর রহমান-আমার নানা সাহেব জেলে ছিলেন না। তাই তার কাছে মনের কোন ক্ষোভও প্রকাশ করতে পারিনি। আসলে

www.pathagar.com

তাড়াতাড়ি জেল থেকে বেরুতে পারবোনা–এ ধারণা পোষণ করেই শান্ত সমাহিতভাবে এক ধারায় জেল খেটে যাচ্ছিলাম এ ধারার ছেদ ঘটালো 'ক্ষমা ঘোষণা'। সন্দেহ ছিল ৩৬৪ ধারা বোধহয় আমার জন্যই রহিত হয়ে যাবে। তাতেও মুরব্বিরা রাগ করলেন আমার সন্দেহ প্রবনতা দেখে। এখন আমার সন্দেহই ঠিক হলো। অভিমান হলো আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর। তারা যদি রিলিজের জন্য তদবির করতেন তাহলে তো হুকুম রহিত হবার আগেই বেরুতে পারতাম। কিন্তু পরে তাদের তরফ থেকে ব্যাখ্যা এলো–আগ থেকে এ মামলাটির প্রতি সরকারের কোপ দৃষ্টি অনুভব করেই আমরা রিলিজ তাড়াতাড়ি করার তদবিরে হাত দেইনি। পাছে আবার কোন কিছু ঘটে যায়। মানুষ ভাবে এক আল্লাহ করেন আর এক। সেদিন রিলিজ হয়নি। হয়েছি আরো আড়াই বছর পর হাই কোর্টের আদেশে বেকসুর খালাস পেয়ে।

একটি চিঠি নিয়ে হুলস্থুল

জেলার শামসুর রহমান সাহেব খুব ধার্মিক লোক ছিলেন না। কিন্তু দোষের কথাও তার শুনা যেতো। জেলে আমার প্রথম এ্যারেষ্টের সময় তার কিছু ভ্রুকুটি পূর্ণ কথাও শুনেছি। আর তখন এটা স্বাভাবিকও ছিলো। তখন তিনি ডিপুটি জেলার। ১৯৭২ এর সম্ভবতঃ অগাষ্টের দিকে পদোন্নতি পেয়ে এখানেই তিনি জেলার হলেন। তার মধ্যে মানবতা ও উদারতা ছিল।। সততা ভঙ্গের কোন কথা আমি কখনো শুনিনি। কয়েদী জীবনের প্রথম থেকে তার সহযোগিতা পাওয়া গেছে। ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে তৎকালীন কুমিল্লার আমীর (বর্তমানে গাজীপুর) শেখ নুরুদ্দীনকে লিখা আমার একটা লম্বা চিঠির রাফ কপি সাপ্তাহিক চেকিং এর দিন সি, আই ডি, মনিরের হাতে ধরা পড়লো। ১/২ খাতার (ওয়ার্ড) দোতালায় ৩নং রুম চেক করতে গিয়ে নোয়াখালীর আবুল হোসেন মাহমুদের একটি বইয়ের ভিতর থেকে তারা তা উদ্ধার করে। ফেয়ার কপি পোষ্ট করার জন্য তাড়াহুড়া করে চলে যাই। রাফ কফিটা নষ্ট করে ফেলার জন্য ছোট ভাই আবুল হোসেনের হাতে দিয়ে যাই। চিঠিটি নাকি নষ্ট করতে তার মন সায় দেয়নি। তাই–এ বিপাক। দীর্ঘ চিঠিটি ছিলো কোরআন হাদিসের আনেক উদ্ধৃতি সম্বলিত। এর ফেয়ার কপি বাইরে বহু আগে চলে গিয়ে থাকলেও রাফ কফিটি নিয়ে জেলখানায় সৃষ্টি হলো বড় চাঞ্চল্যের। উদ্ধৃতি গুলো জেল কর্তৃপক্ষের মনকে সন্দিগ্ধ করে তুললো বেশী। কিন্তু চিঠির মালিকানা কেউ স্বীকার করলো না। বইয়ের মালিকানা কেউ স্বীকার করেনি বলে নির্দিষ্ট করে কাউকে চিঠির জন্য অভিযুক্ত করতে পারা গেলোনা। মর্ম উদ্ধারের জন্য বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। সন্দেহ করে করে প্রতিদিন বিকালে জেল খানায় বিভিন্ন বিভাগ থেকে কিছু কিছু লোককে ডেকে এনে কেস টেবিলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। যাদেরে আনা হয় তারা সবই আমাদের লোক। মূল ব্যাপারটি জানা থাকলেও তারা যে চিঠি লিখেনি এ কথা তো সত্য। এদের মধ্যে আবুল হোসেন, কাপাসিয়ার প্রফেসার কামরুজ্জামান (তখন ছাত্র) সহ অনেককে জড়িত করা হয়। প্রত্যেক দিন বিকালে কেস টেবিলে তাদের এ হয়রানি দেখে কাউকে কিছু না বলে আমি সুবেদার আব্দুল কাদেরকে ব্যাপারটি খুলে বলালাম। এমন একটি রজস্যজনক চিঠির সূত্র উদ্ধার হওয়াতে সুবেদার

www.pathagar.com

আব্দুল কাদের আনন্দে জেলারকে জানাবার জন্য অফিসে চলে গেলো। সাথে সাথে ডাক পড়লো আমার। গেলাম শামসুর রহমান সাহেবের অফিসে। আমি স্বীকার করলাম চিঠির কথা। যে সব অংশ তারা পড়তে ও বুঝতে পারেনি আমাকে দিয়ে পড়িয়ে বুঝে নিলেন। ২/৩ জন ডিপুটি জেলার তখন এখানে উপস্থিত। জেলার সাহেব আমাকে নিয়ে ডি, আই, জি আব্দুল আউয়াল সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলেন। "জানালেন স্যার, খালেক সাব স্বীকার করেছেন এ চিঠিটা তার। " তিনি মুচকী হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি দরকার এসব চিঠি লেখার। শিক্ষা মূলক যে সব কাজ করছেন তা তো ভালো। বাইরে লিখে এসব জানিয়ে লাভ কি?" হেসে হেসে আমি বললাম. "তাতেও আছে একটা তৃপ্তি। আমার হিট্টি টিকেটটা নিয়ে ডি. আই, জি, সাহেব লিখছেন আর আমাকে বলছেন,-"যান ৭দিন সেলে থেকে লেখাপড়া করে আসুন। আপনারা তো পড়ুয়া লোক। সেলের বাইরে লেখাপড়ার সুযোগ কম।" মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। আমাকে সাথে করে বেরিয়ে আসতে আসতে জেলার সাহেব বললেন-সুন্দর ভাবে কাজ কর্ম করে খুথলি জেল খেটে যান। আমার সাহায্য পাবেন। অভ্যন্তরীন অপরাধের প্রথম শাস্তি ৭দিন ২৭ সেলের এক প্রকোষ্টে কাটিয়ে আসলাম। এখানেই একদিন নন্ধ্যায় নতুন ভর্তি সিপাহী টাঙ্গাইলের আশ্বাসের সাথে সন্ধ্যায় লকআপের পর প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়েই তার সহযোগিতার আভাষ পাই। যতদিন জেলে ছিলাম তার সহযোগিতা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চায়েত প্রথা

১৯৭৫ সনে সেপ্টেম্বরের দিকে শেখ মুজিবের এক দলীয় শাসন প্রর্বতন ও তা পাকাপোক্ত করার জন্য ৬১ জন গভর্ণর যখন নিযুক্তির ব্যবস্থা করছিলেন তখনকার দিনের কথা। জেলার শামসুর রহমান সাহেব সুপারিন্টেনডেন্ট হয়ে সিলেট বদলী হয়ে গেলেন। এখানে এলেন জেলার আমিনুর রহমান সাহেব। তিনি খুবই ধার্মিক। জমাদার ইনসার্জ ইসহাক মিঞা আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন-এবার জামায়াতে ইসলামীর জেলার এসেছেন। তার সাথে এখনো আমার পরিচয় হয়নি। খবর শুনে খুশী হলাম। পাঁচ বেলা জামায়াতে চক মসজিদে নামাজ আদায় করেন। এমন কি চক মসজিদে জামায়াতে ফজরের নামজ আদায় করে টুপি মাথায় সকালের রাউন্ডে জেলে ঢুকতেন। বন্দীদেরকে নামাজ পড়ার জন্য বলতেন। কায়মনো বাক্যে নামাজ পড়লে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে আশ্বাস দিতেন। বড় চুলওয়ালা, গোঁপওয়ালা লোক দেখলে নাপিত ডেকে কেস টেবিলে চুল কেটে দিতেন। সকালে চুলের টিপি বনে যেতো কেস টেবিলে। একদিন বিকালে রসদ গুদামে তার সাথে প্রথম দেখা। জেলখানার সিষ্টাচার অনুযায়ী কোন অফিসারকে দেখলে ও 'এটেনশন' শব্দ শুনলে সকলকে বসে যেতে হয়। জেলার সাহেবকে নিয়ে ঢুকার সময় সুবাদার মৃধার এটেনশন শব্দ শুনে একটা টেবিলে বসা হতে নেমে দাঁড়িয়ে রইলাম। মৃধার নিকট আমার পরিচয় নিলেন তিনি। শুনলাম মৃধা বলছেন, "উনি জেনারেল কিচেনের রাইটার; ভাল মানুষ।" জেলার সাহেব বললেন, আমার "ভালো মানুষের দরকার নেই। চৌকা থেকে তাকে সরিয়ে দিন।" মৃধা আবারও বললেন, 'স্যার ডি, আই, জি সাহেব ওনাকে চৌকায়

www.pathagar.com

রেখেছেন। চৌকা খুব সুন্দর চলে।" এসব কথা বলতে বলতে তারা ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকলেন। আমরা কাজ সেরে ফিমেল ওয়ার্ডের পাশ দিয়ে যাবার সময় আবার তাদের সাথে আমার মুখো মুখি দেখা। সে সময় আমার মাথায় চুল দাঁড়ি বেশ বড় বড় ছিলো। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন,–আপনার মাথায় চুল এতবড় কেন? জবাবে বললাম, "স্যার এগুলো হাইজাকার লাইক চুল নয়। বাবরী চুল।" আর কিছু তখন বললেন না তিনি।

পরের দিন রশদ গুদামে যাবার পর কথাচ্ছলে গোডাউন ক্লার্ক মজিদ সাহেব বললেন,–কি খালেক সাহেব আমাদের জেলার সাহেব আপনার উপর খ্যাপা কেন? কথাগুলো বলে তিনি মুচকি মুচকি হাসছেন। সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে বললাম, আমি তো কিছু জানি না। গতকাল বিকালেই তো মাত্র তার সাথে দেখা। কালকের কথাগুলো তাকে শুনালাম।"

এর দুই তিন দিন পর সকালে চৌকার নির্দ্ধারিত কাজ সেরে কেস টিবিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছি ২৬ সেলের দিকে –আমার নিবাসস্থল। মরহুম মশিয়ুর রহমান যাদু মিঞা, জনাব অলি আহাদ, মাওলানা আবদুল মতিন , মেজর জয়নুল আবেদীন, জাতীয় শ্রমিক লীগ ও লাল বাহিনী প্রধান আব্দুল মান্নান,জাসদের রুহুল আমীন ভুঞা,ডক্টর আখলাকুর রহমান, নগর সভাপতি মেসবাহ উদ্দিন, প্রখ্যাত ব্যাংকার খায়রুল কবির, সেভেন মার্ডার কেসের ইমতেয়াজ কোরাইশী, রঞ্জু, নোয়াখালী জিলায় আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল হক, সি এস পি, এইচ, টি ইমাম সি, এস পি, আসাদুজ্জামান, নুরুদ্দীন প্রমুখদের সাথে তখন থাকতাম এ সেলে।

আমার ডিভিশন না থাকলেও এ সব নেতারা ডি, আই, জি সাহেবকে বলে আমাকে আন অফিসিয়াল ষ্টেটাস দিয়ে ২৬ সেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এ সময়ে আমাকে বেশী কাজ করতে হতো না। লেখা পড়াসহ রাজনৈতিক দাওয়াত হতো বেশী। লেখা পড়ার উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ ১১টার দিকে যাচ্ছি ওদিকে, এমন সময় কেস টেবিল থেকে ডাক দিলেন সুবেদার মৃধা সাহেব। গেলাম তার কাছে। বললেন, ডি, আই, জি, সাহেব সহ সব অফিসাররা ভেতরে আসছেন। আজ পঞ্চায়েতী নির্বাচন হবে আপনি যাবেন না।"

পঞ্চায়েত প্রথা কি জানতাম না। তিনি বুঝালেন, "স্বাধীনতার সময় কারাগার থেকে সব লোকজন চলে যাবার পর এ প্রথার অবলুপ্তি ঘটে। আর এখন পর্যন্ত তা চালু হয়নি। আজ ডি, আই, জি সাহেব পঞ্চায়েত প্রথা চালুর জন্য নির্বাচন ঘোষণা করেছেন।" কয়েদীরাই শুধু ভোটার। তাদের ভোটে যিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন, সাধারণ রন্ধনশালা সহ ইনমেটদের তরফ থেকে সব কিছুর দেখা শুনার দায়ীত্ব তারই থাকবে।

তৈরী হয়ে আসি বলে ২৬ সেলে চলে গেলাম। গোটা জেলখানায় যাই যাই রব। অল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ বন্ধ করে কনভিকটেড আসামীরা কেস টিবিলের সামনে ১/২ খাতার প্রসস্ত বারান্দায় এসে জড়ো হলো। ডি, আই, জি, কাজী আব্দুল আউয়াল সাহেব ডি, এস,জেলার ডিপুটি জেলারের দলবল সহ কেস টেবিলে এসে পৌছলেন। আমিও কেস টেবিলের পশ্চিমে পেছনের দিকে এসে দাঁড়ালাম। শুধু ডি, আই, জি, সাহেব, বসা।

www.pathagar.com

যেহেতু চেয়ার একখানা। ৪ জনের সারি ধরে বসা কয়েদীরা সামনে। ডি, আই, জি, সাহেব বক্তৃতা করছেন। পঞ্চায়েত সিষ্টেম কি, কি এর দায়িত্ব। কি এর উপকারিতা। কিভাবে এ দায়িত্ব চালাতে হবে। কোন ধরনের লোককে নির্বাচিত করতে হবে–এর উপর এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। তাঁর বক্তৃতার একটি অংশ আজও আমার মনে আছে। কোন ধরনের লোককে নির্বাচিত করতে হবে এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন,–"আপনাদের মূল সমস্যা খাদ্যের সমস্যা। এ প্রথায় যে ব্যক্তি পঞ্চায়েত কমিটির চেয়াম্যান নির্বাচিত হবেন তাকে এ সম্যস্যার উপর গুরুত্ব দিতে হবে বেশী। আপনারা ভোট দেবেন একজন সৎ মানুষকে। যিনি শিক্ষিত হবেন। হিসাবপত্র বুঝবেন। রাজনৈতিক দিক দিয়ে সজাগ সচেতন হবেন–কিন্তু জেলখানায় রাজনীতি করবেন না।" তাঁর বক্তৃতা শেষে জেলার আমিনুর রহমান সাহেব আরো উচ্চস্বরে বড় সাহেবের বক্তৃতার ব্যাখ্যা করে পঞ্চায়েত প্রথা বুঝায়ে দিলেন। এর পর ডি. আই, জি, সাহেব বলেলেন "আজ শুধু চেয়াম্যান নির্বাচন হবে। কমিটি হবে পরে। কাজেই কোন প্যানেল পেশ না করে আপনারা প্রস্তাব সমর্থনের মাধ্যমে সংক্ষেপে কাজ সেরে নিতে পারেন। আপনারা আমার বর্ণনা অনুযায়ী আপনাদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যানের জন্য একজন সৎ ও যোগ্য লোকের নাম প্রস্তাব করতে পারেন।"

এ কথা শুনে শেরপুরের কনষ্টিকটেড আসামী নায়েব সাহেব যিনি প্রখ্যাত রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মরহুম আবুল মনসুর সাহেবের আত্মীয়, দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি পঞ্চায়েত কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে জনাব মাওলানা আব্দুল খালেক মজুমদারের নাম প্রস্তাব করছি।" ডি, আই, জি, সাহেব তখন আর কোন পাল্টা প্রস্তাব আছে কি না জানতে চাইলেন। কোন প্রস্তাব এলো না। ক্ষণিক চুপ থাকার পর তিনি আবার উচ্চাভাবে জিজ্ঞেস করলেন "এ প্রস্তাবিত নামের বিপক্ষে কারো কোন মতামত আছে কিনা।" তাতেও কেউ কোন কথা বললো না। এবার তিনি চেয়ারে একবার নেড়েচেড়ে বসে বললেন–"যদি আপনাদের আর কোন প্রস্তাব না থাকে তাহলে প্রস্তাবিত ব্যক্তির পক্ষে আপনারা হাত উঁচিয়ে আপনাদের সমর্থন ব্যক্ত করুন।"

উপস্থিত কনষ্টিকটেড ভোটাররা সকলে দুই হাত উচু করে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করলেন। এবার ডি, আই, জি, সাহেব ঘোষণা দিলেন , তাঁহলে আপনাদের প্রস্তাব ও সমর্থনের প্রেক্ষিতে 'জেল কোড' অনুযায়ী পঞ্চায়েত কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন মাওলানা আব্দুল খালেক। আজ থেকে তিনি আপনাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাকে সকল প্রকার সহযোগিতা করা আপনাদের কর্তব্য। নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আপনাদের সুযোগ সুবিধা ও অধিকার আদায়ের দায়িত্ব তার। যদি এ দায়িত্ব পালনে তার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে তাহলে আমাকে জানাবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।" আজ এখানেই আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হলো।

অনুষ্ঠান শেষ হবার ঘোষণার সাথে সাথে হেট্রিক প্রাপ্ত খেলোয়াড়ের মত আমাকে কাঁধে করে কয়েকজন কয়েদী ১/২ খাতা হতে জেনারেল কিচেন পর্যন্ত ঘুরায়ে আনলো। আমি লজ্জায় মাথা নত। আল্লার হাজার শুকর আদায় করলাম। যাবার সময় জেলার সাহেব ডি, আই, জি সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, স্যার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিয়োগ

www.pathagar.com

করলেন ৬১ জন গভর্ণর। আর আমরা নিয়োগ করলাম ১ জন গভর্ণর। এর পর থেকে জেলার আমিনুল রহমান সাহেবের সহযোগিতায় আর কোন অভাব ঘটেনি। বরং পাওনার চেয়েও তিনি বেশী সহযোগিতা করেছেন আমাকে। শ্রদ্ধা করতেন ভালবাসতেন যথেষ্ট।

অবলুপ্ত এ পঞ্চায়েত প্রথা আবার কেন চালু করতে গেলেন ডি, আই জি, সাহেব তার প্রকৃত কারণ জানি না। নির্বাচিত হবার আগেও তো এ কাজই আমি করেছি। একথা প্রসঙ্গে কেরানী আব্দুল মজিদ সাহেব একদিন বলেছেন, "এতদিন যা করেছেন খান-অথারাইজলি করেছেন। যে কোন সময়ই এ কাজ থেকে আপনাকে সরায়ে দেবার সুযোগ ছিলো। নির্বাচনের পর অথারাইজড হয়ে গেলেন। নির্বাচন ছাড়া আপনাকে আর কেউ সরাতে সুযোগ পাবেনা। সাজা প্রাপ্ত হয়ে ১৯৭২ এর জুলাই মাসে জেনারেল কিচেনে কাজ পাশ হবার পরও এভাবে একদিন আল্লার অপার করুণায় ডি, আই, জি, আউয়াল সাহেবের অপ্রত্যাশিত ও অভাবিত হস্তক্ষেপের কারণে জেলের সবচেয়ে কষ্টদায়ক জেনারেল কিচেনকে আল্লাহ্ আমার জন্য গুলজার বানিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সনের ১৫ আগষ্টের পট পরিবর্তনের পর খন্দকার মোশতাক আহমদ এলেন ক্ষমতায়। আওয়ামী লীগের চার নেতাসহ অনেকেই নিক্ষিপ্ত হলেন জেলে। আবার জেনারেল খালেদ মোশাররফ করলেন অভ্যুত্থান। আওয়ামী চার নেতা নিহত হলেন জেলে। সিপাহী জনতার সম্মিলিত বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান এলেন ক্ষমতায়। এ ডামাডোলের মধ্যে কর্তৃপক্ষের কোন রোষের শিকারে পরিণত হলেন জেলার আমিনুর রহমান সাহেব। ১৯৭৬ সনের প্রথম দিকে কোন এক সন্ধ্যায় তাৎক্ষণিক ভাবে চার্জ বুঝিয়ে দিতে হলো তাকে অন্যের কাছে।

তিনি বদলী হলেন দূর দূরান্তরে দিনাজপুরে। পরের দিন ভোরে লক আপ খোলার আগেই একজন সিপাহী জেলার সাহেব ডাকছেন বলে আমাকে নিয়ে গেলেন অফিসে। দেখি আমিনুর রহমান সাহেব লুঙ্গী পরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে উঠলেন, আমাকে ষ্টেভবাই বদলী করে দেয়া হয়েছে। কাল রাতেই চার্জ বুঝে নেয়া হয়েছে। দোয়া করবেন যেন পরিবার পরিজন নিয়ে আল্লাহ্ মান ইজ্জত সহকারে আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁর জন্য আমারও দুঃখ হলো। দোয়ার আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়ে তার থেকে বিদায় হলাম। তাঁর সাথে আর দেখা হয়নি।

ধর্মের প্রতি অনুরাগ স্বভাবজাত

এ দেশের মাটি বিশ্বের যে কোন দেশ হতেই ধর্ম-উর্বর। কাজ করুক আর না করুক তারা বিশ্বাসী। ধর্মের বিরুদ্ধে কোন অসম্মানজনক কথা কোন মুসলমানই সহ্য করতে পারেনা। যদিও ধর্ম নিরপেক্ষতা সহ চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির দাবীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি। এ নিয়ে আন্দোলনও চলেনি। তবু বাংলাদেশ অস্তিত্বে আসার পর ধর্মদ্রোহীরা পরিবেশ পরিস্থিতিগত কারনে আশকারা পেয়ে যায় বেশী। এ সুযোগে ধর্মের বিরুদ্ধে রাসূলের বিরুদ্ধে তারা নানা কুৎসা রটাতে লাগলো। যারা সোচ্চার হতো, প্রতিবাদ করতো

www.pathagar.com

তাঁরা পলাতক। আর যারা সমাজ দেহের মাঝেই আছেন অথচ ধর্মদ্রোহীতাকে ঘৃণা করেন তারা ধর্ম দ্রোহীদের আস্ফালনের সামনে লাচার। সহায় সম্বলহীন। এ সুযোগে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বিশেষ করে ১৯৭৩-৭৪ এর দিকে আত্মপ্রকাশ ঘটলো কিছু ধর্মদ্রোহী বেঈমানের। যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে অপমানজনক মিথ্যা লেখালেখি শুরু করে দিলো। ধৈর্যেরও সীমা আছে। এদের আস্ফালন যখন ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন এ লাচারের দলেরাও সোচ্চার হয়ে উঠলো। কুখ্যাত প্রফেসার এনামুল হক, মুসলিম নামের কবি দাউদ হায়দারা আল্লাহ্ রাসূলের বিরুদ্ধে কলম ধরলো ও কবিতা লিখা শুরু করলো। তখন বাংলাদেশের আপামর মুসলিম জনসাধারন ও দামাল ছেলেরা এ অপমান সহ্য করতে পারেনি। রুদ্র রোষে তারা ফেটে পড়েছে সর্বত্র। প্রতিবাদ করে নেমে পড়েছে ঘর থেকে পথে ঘাটে হাটে মাঠে ময়দানে। আল্লাহ্ ও রাসূলের ব্যাপারে সব সংকির্ণতার উর্দ্ধে উঠে দলমত নির্বিশেষে (সমাজতন্ত্রীরা ছাড়া) সব হয়েছে এক দেহে লীন। জেলের আমরা এখবর পেতে থাকলাম।

মুসলিম জনতার এ রুদ্র রোষে বাধ্য হয়ে তাদেরই লালনকারী সরকার শেখ মুজিব তাদের কারাগারের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সেখানেও তারা নিরাপদ আশ্রয় পায়নি। জেলে প্রবেশ করার সাথে সাথেই সাধারন কয়েদী হাজতীরা দাউদ হায়দার ও এনামুল হকের নামে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে। পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আগেই ঘটনা জানা জানি হয়ে গিয়েছিলো কারাগারে। কেস টেবিলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক থেকে লোকজন এসে ঘিরে ফেললো তাদেরে। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে হায়দার-এনাম। তোদের আজ নিস্তার নেই" গর্জে উঠলো একজন। আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলা। রাসূলকে 'তুখ্‌খোর বদমাশ বলা। (নাউজুবিল্লাহ) এখানে থাকতে এসেছিস? আমাদের জীবন থাকতে তোমাদেরে বাঁচতে দেবোনা। প্রমাদ গনলো জেল কর্তপক্ষ। তাড়াতাড়ি দৌড়িয়ে আসলেন জেলার, ডিপুটি জেলার। সরায়ে ফেললেন, লুকায়ে ফেললেন তাদের মানুষের চোখের অন্তরালে সেগ্রিগেসন সেলে। খাবারের সময় ছাড়া সাধারন মানুষ সেখানে যেতে পারেনা। বাঁচলো তারা জনতার রুদ্র রোষ থেকে। দুএকজন ছাড়া এদের অনেকেই নামাজও পড়েনা রোজাও রাখেনা। অথচ ধর্মের বিরোধিতা সহ্য করতে পারেনা। তবে তারা এসব না করার জন্য নিজেদেরদে অপরাধী, গুনাহ্গার বলে স্বীকার করে।

এর পর কোন এক অন্ধকার রাতে লৌহ কারার প্রাচীর ডিঙ্গায়ে জনগনের অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে তাদের লালনকারী সরকার তাদের পাচার করে প্রতিবেশী সতীর্থ ভুমিতে। খোদাদ্রোহী-প্রবন্ধ রচনা ও কবিতা লিখার স্বাধীনতার ছাড়পত্র নিয়ে তারা আজ মুক্ত বিহঙ্গ। 'রঙ্গিলা রাসুল' লেখকের পাওনা 'ভাগ্য' বরনের সুযোগ তারা পেলোনা।

সাহিয়েদ নেসার নোমানী

এ প্রসঙ্গেই মনে পড়ে আর একটি ঘটনা। ১৯৭৪ এর নভেম্বরের প্রথম দিকে হবে সম্ভবত ঘটনাটি। একদিন খুব ভোরে উঠে কেস টেবিলের পাশ দিয়ে জেনারেল কিচেনের দিক যাচ্ছি। কেস টেবিলের দিকে উচ্চসস্বরের কথা শুনা যাচ্ছে। তখনও জেল নিরব।

www.pathagar.com

তাকালাম–দেখলাম একজন এক হারা গড়নের লম্বা মানুষ। মাথায় টুপী। গায়ে চাদর। চাদরের নীচে কল্লিদার জামা তার পাশে কিছু বিছানা পত্র। লোকটিকে চেনা চেনা বলে মনে হলো। এগিয়ে গেলাম তার দিকে। তার কোনদিকে লক্ষ্য নেই। চেচাচ্ছেন কেবল। বলছেন, "নিয়ে আয় দেখিয়ে দেই আল্লাহ্ কাকে বলে। আমাকে একা পেয়ে ভেবেছ আমি ভয় পাবো। আমি ভয় পাবার পাত্র?তোরা এক'শ আমি একজন । আমার সামনে আল্লার বিরুদ্ধে কথা বলবি। কই তোদের দাউদ দায়দার এনামুল হক? আল্লার বিরুদ্ধে কথা বলে তো একদিনও থাকতে পারলনা বাইরে।" আমি ততক্ষনে চিনে ফেলেছি তাকে। অনেক দিন নয় শুধু, অনেক বছর পর দেখেছি তাই চিনতে বিলম্ব। অমনি আবার চীৎকার "আমি নোমানী! জাননা। আমি কাউকে ভয় করিনা।" আমার চিনার সত্যায়ন হয়ে গেলো। তাকে হতবাক করে দিয়ে আমি বলে উঠলাম, "আরে নোমানী ভাই আপনি! এখানে! কি হয়েছে।" বেচারা চীৎকার বন্ধ করে নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। জগন্নাথ কলেজের আমরা একই সেশনের ছাত্র। তার বোধ হয় আমার কথা মনে নেই। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি বুঝতে পারলেন ও আমাকে একটা অবলম্বন পেলেন।

এবার আরো সাহসিকতার সাথে জোরালো ভাষায় চিৎকার করতে আরম্ভ করলেন। বেঈমান দাউদ হায়দার এনামুল হকরা আল্লাহ্ রসুলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে মুসলমানের দেশে তাদের এত স্পর্ধা। বাংলাদেশের মানুষ এ বেঈমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে রাস্তায় নেমে পড়েছে। প্রতিবাদ মিছিল করে বঙ্গভবন ঘেরাও করেছে। আমার মত হাজার হাজার যুবক রাস্তায় নেমে পড়েছে। আমিও অংশ গ্রহন করেছি। আল্লাহর আর রসুলের বিরুদ্দে এ অপমান সহ্য করতে পারিনি। আর এ অপরাধে মুজিব সরকার আমাকে গ্রেফতার করেছে। কাল রাতে জেলে এসেছি। সিকিউরিটি ওয়ার্ডে আমাকে থাকতে দেয়া হয়েছে। আমি রাতে নামাজ পড়ছি আর কমিউনিস্টের বাচ্চারা আমাকে টিটকারী দিচ্ছে। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে–তোদের আল্লাহকে সিকিউরিটি ওয়ার্ডে বন্ধ করেছি। দেখি ছুটিয়ে নাও। যে লোকটি বলেছে সেও কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পরিচিত লোক। তাকে আমি চিনি। আমি অনেক্ষন চুপ করেই থাকলাম। কিন্তু টিটকারী চলতেই থাকলো। আমি আর বরদাস্ত করতে পারলামনা। হংকার ছেড়ে বললাম–কে বলছিস এ উদ্ধত্যপূর্ন কথা? সাহস থাকে তো আমার সামনে এসে বল । আমার চীৎকারে জমাদার সিপাহীরা জড় হয়ে গেলো। বেঈমানের বাচ্চারা খামুশ হয়ে গেছে। ভোর হতে না হতে আমাকে লক আপ খুলে এখানে নিয়ে এসেছে।" সুবেদারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম তাকে সেল এ্যারিয়ায় দেয়া হবে। পরে অবশ্য আমরা উভয়ে মেন্টাল এ্যারিয়ার ১০ সেলে ছিলাম। দিন রাত কথা বার্তা আলাপ আলোচনা করেছি। ইসলামী সাহিত্য পড়েছি। সে সময় তিনি সুফিবাদের প্রতি ঝোকে পড়েছিলেন বেশী। নামায পড়তেন রীতিমত। তাহাজ্জুদ গোজার ছিলেন নিয়মিত।কলেজ জীবনের প্রথম দিকে ছাত্র লীগের সাথে ছিলেন। ছাত্রলীগের নমিনিশনে জগন্নাত কলেজের জি এস নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমরা ছিলাম ছাত্র সংঘের কর্মি। স্ট্রাটিজিকেস কারণে আমরা সে সময় ছাত্র লীগের প্যানেলকে সমর্থন

www.pathagar.com

জানাতাম। পরে অবশ্য তিনি আদর্শগত মত পার্থক্যের কারনে এন, এস, এফ, এ যোগদান করেছিলেন। এর পর বরাবর তার সম্পর্ক ছিলো কনভেনসন মুসলীম লীগের সাথে।

মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই মুসলমান হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এরপর পরিবেশ পরিস্থিতি তাদের বিভিন্ন ধর্মে টেনে নিয়ে যায়। যারা মুসলমানের ঘরে লালিত পালিত তারা ধর্মীয় সব অনুশাসন মেনে না চললেও ধর্মকে অস্বীকার করেনা। আল্লাহকে বিশ্বাস করে। যদি বিশেষ কোন মানব রচিত ইজমে দীক্ষিত পুরুষ না হন। বিশেষ ইজমের ও বহুলোক এমন আছেন যারা অজ্ঞানতার কারনে বিশেষ ইজমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর মার্কস দেয়া দর্শনে বিশ্বাসী। কিন্তু আল্লাতে অবিশ্বাসী নয়। মার্কসবাদীরা প্রকৃতই নাস্তিক। আল্লাহ্ রসূল, আসমানী কিতাব মালায়েকা (ফেরেশতা) পরকাল ও তাকদিরে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য কৌশল হিসাবে তারা নাস্তিকতার দিককে প্রকাশ না করে অর্থনৈতিক সমস্যাকে প্রকট করে তুলে ধরে সমাজতন্ত্রের দাওয়াত দেয়। পুঁজিপতিদের শোষণ নির্যাতনের ফলে সমাজে যে দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে মানুষ সমাজতন্ত্রের এ দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে মার্ক্সের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর মজবুত ঈমান এনে আল্লাহর উপর ঈমান হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যারা এমন চরম অবস্থায় গিয়ে পৌছেনি তারাও বিপদে আপদে নিপতিত হলে আল্লাহর নাম নিতে শুরু করে কায়মন বাক্যে। এমন দৃষ্টান্ত ও জগতে বহু আছে। যেমন জেলে নিহত আওয়ামী লীগের চার নেতা। জমাদার সিপাহীরা এসে আমাদের কাছে হাসতেন আর বলতেন তাজুদ্দীন সাহেব ছাড়া আর তিন নেতা যেভাবে নামাজ পড়েন আর আল্লার নাম ডাকেন, আপনারা তো পিছে পড়ে যাবেন। এক জমাদার বললেন 'নিউ জেলে' সেদিন আমার লক আপ করার দায়িত্ব ছিলো। সব রুমে লকআপ করে মনসুর আলী সাহেবের রুমের কাছে এসে দেখি রুম খালি। আমি ভীত হয়ে এ দিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। দেখি তিনি একটু দুরে বসে কি জানি খুঁজছেন। তাঁকে তাড়াতাড়ি আসার জন্য আমি ডাকছি। আসতে দেরী দেখে এগুলাম তার দিকে। দেখি তিনি পাথর কনা (কংকর) খুঁজছেন।আমি তাড়া করলে তিনি বললেন, জমাদার সাব আরতো কোন কাজ নেই রাতে বসে বসে তসবিহ পড়ি। কতবার তসবিহ পড়লাম গনা রাখতে কষ্ট হয় বলে পাথর নিয়ে যাচ্ছি। হিসাব রাখতে সুবিধা হয়। জামাদার সাব বললেন, "আমি তখন না বলে পারলাম নাযে,বুঝলেন তবে আরো আগে বুঝলে ভাল হতো। এ ভাগ্য বরণ করতে হতো না।" এরশাদ সরকারের মিনিষ্টার ও বর্তমান জাতীয় সংসদের ডিপুটি স্পীকার কোরাবান আলী সাহেব তো নামাজ পড়তে পড়তে দাঁড়ি কাটারও সময় পাননি। ইয়া বড় দাঁড়ি নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে সব সাফ করে দিয়েছেন। গাজী গোলাম মোস্তফা সহ অনেক নেতা উপনেতাই সেদিন আল্লাহকে ডেকে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাই বলেছিলাম বাংলাদেশের মাটি ধর্মের জন্য। অধর্মের জন্য নয়। ধর্মের বীজ বপন এ দেশে যত সহজ অন্য মতবাদের বীজ বপন তত সহজ নয়। বুদ্ধিজীবিদের মাথা ওয়াশ হলেও দেশের সাধারণ মানুসকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মরণ পাগল করে তোলা দুরুহ কিছু নয়।

জেলে নিহত চার নেতা

www.pathagar.com

আল্লাহর কুদরত বুঝা বড় দায়। ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর যখন আওয়ামী লীগের ১ম,২য়, শ্রেণীর নেতারা প্রায় সব কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করলেন তখনই আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান মন্ত্রী মনসুর আলীর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণের কাজ মাত্র শেষ হয়েছে। কারাগারের দক্ষিণ দিক চকবাজার সংলগ্ন বাংলাদেশ আই, জি, অব প্রিজন্সের অফিসকে উত্তর পাশে স্থানান্তরিত করে জেলের সীমা বাড়িয়ে বিরোধী রাজনীতিকদের কারাগারে পুরার জন্য কারাগার সম্প্রসারণ করলেন। সে কারাগারে কোন বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকেই জীবন যাপন করতে হয়নি।কারা কর্তৃপক্ষ সম্প্রসারিত জেলের এ বিরাট অংশের নাম দিয়েছিলেন 'নিউ জেল'। এ দিন জেলে নিহত চার আওয়ামী নেতাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা হলো সে দিনটাও একটা স্মরণীয় দিন। জেল গেটে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর যথা সম্ভব তাড়াতাড়িই তাদেরে ভিতরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হলো। তখন দুপুর বারটার সময়। গোটা কারাগারের সব লোকজনকে বিভিন্ন খাতায় খাতায় ওয়ার্ডে ও সেলে সেলে পুরে লক আপ করে দেয়া হলো। এমনকি জেনারেল কিচেন সহ মেডিকেল বিভাগের জরুরী কাজের লোক ভেতরে রেখে গেট বন্ধ করে দেয়া হলো। গোটা জেলের সব পথ ঘাট লোক শূন্য। জেল অফিস সংলগ্ন ওডহাজতেও সব ভিতরে পুরে লক আপ করে দেয়া হলো। বিভিন্ন দলের কিছু নেতা সহ সেভেন মার্ডার কেসের শফিউল আলম প্রধান ও তার সাথীদের অনেকেই তখন ওখানে থাকতেন। দিন দুপুরে বিশেষ এই ব্যবস্থার কারণও জানাজানি হয়ে গেছে সকলের কাছে। বিশেষ প্রহরায় জেলারসহ কয়েকজন ডিপুটি জেলার, চার নেতা–সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে নিয়ে জেলের প্রধান সড়ক দিয়ে সামনে পশ্চিম দিকে এগুচ্ছেন। আগ থেকেই সেল এ্যারিয়ার ৭নং সেলের লোকজন সরিয়ে খালি করে রাখা হয়েছিলো। সে দিকেই তারা এগুচ্ছেন। দক্ষিন দিকের ওড হাজত পার হবার সময় এখান থেকেই শুরু হলো চীৎকার "দুর'হ" শ্লোগান। আর সাথে সাথেই উত্তর দিকের ১/২ খাতার দক্ষিণের সবগুলো বড় বড় জানালায় দাঁড়ানো ঔৎসুক্য জনতাও শুরু করল একই চীৎকার ধ্বনি "দূরহ"। আর সংক্রামক রোগের মত গোটা জেলখানায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো একই শ্লোগান। দূর থেকে যারা দেখেনি, এ শ্লোগানের শব্দ শুনে তারাও দিতে থাকলো পাল্টা শ্লোগান। গগন বিদারী শব্দে তোলপাড় হয়ে উঠলো গোটা জেলখানা কিছুসময়ের জন্য। শুনতে পেলাম, জানিনা কতটুকু সত্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম নাকি কানে একটু কম শুনতেন। এ বিকট শ্লোগানের মর্ম 'অভ্যর্থনা' মনে করে তিনি দুদিকে হাত নেড়ে 'দুরহ' এর জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাজুদ্দীন আহমদ তাড়াতাড়ি তাকে হাত নাড়তে বারণ করে দিয়ে বললেন–'এ অভ্যর্থনা নয় নজরুল!' জেলারও ডিপুটি জেলারগণ চৌকান্না হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছেন। চারিদিকের ধ্বনী প্রতিধ্বনী হতে মনে হচ্ছিল যেন সব দিক থেকে গেট ভেঙ্গে লোকজন বেরিয়ে আসছে। কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ী করে তাঁদের ৪ জনকে ৭ সেলে পুরে সম্ভবতঃ ডি, আই, জি, কাজী আবদুল আউয়াল সাহেবকে বিষয়টি অবগত করালেন। এদিকে আবার দিন দুপুরে গোসল ও খাবার দাবারের সময় সমস্ত খাতাও সেল গুলো

www.pathagar.com

দীর্ঘক্ষণ ধরে বন্ধ করে রাখার জন্য মানুষ অতীষ্ট হয়েও চীৎকার ও হৈ হল্লা শুরু করে দিয়েছে।

অবস্থা নাজুক পরিস্থিতির দিক মোড় দিলে জনাব ডি, আই, জি, সাহেব সব আফিসার সহ ভেতরে আসলেন। ৪ নেতার নিরাপত্তার জন্য তাদের রাখার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন। দেখা গেলো জেলখানার ঝাড়ু দফার ১৭/১৮জন কে, তাদেরে আটকিয়ে রাখা জায়গা হতে লকআপ খুলে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। নিউ জেলের নির্মাণ কাজ মাত্র শেষ হয়েছিল। ৪ আওয়ামী নেতার নিরাপত্তার জন্য ৭ সেল থেকে বের করে এনে প্রটেকটিভ এ্যারিয়ায় রাখার জন্য এখন মরহুম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মনসুর আলী সাহেবের স্বপ্নের জেলখানাকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ৭ সেল থেকে সরিয়ে ৪ নেতাকে দিয়ে 'নিউ জেল' উদ্বোধন করা হলো। শুনেছি নিউ জেলে প্রবেশ করার সময় মরহুম তাজুদ্দীন সাহেব নাকি মরহুম মনসুর আলী সাহেবকে বলেছিলেন, "মনসুর আলী! তোদের গড়া জেল তোদের দিয়ে আজ উদ্বোধন করা হলো। একেই বলে নিয়তির নির্মম পরিহাস।" এ প্রসঙ্গে তিন বছর আগের একটি ভবিষ্যদ্বানীর কথা মনে পড়ে। ৭২ এর অর্থ মন্ত্রী মরহুম তাজুদ্দিন একবার জেলখানা পরিদর্শন করতে এলে মুসলিম লীগের সভাপতি মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরী ও মরহুমে আবদুস সবুর খান অত্যধিক গরমের কারণে জেলখানায় বিদ্যুৎ পাখা লাগাবার দাবী জানালেন। উত্তরে তাজুদ্দীন সাহেবকে আমতা আমতা করতে দেখে চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন–"বিদুৎ পাখায় আজ আমরা উপকৃত হলেও একদিন তোমাদের কাজে লাগবে। সেদিন হয়তো বেশী দূরে নয়। 'কিন্তু দুর্ভাগ্য মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরী অস্বাভাবিকভাবে জেলকানার নির্মম প্রকোষ্ঠে মৃত্যু বরণ করেন। সচোখে তার ভবিষ্যদ্বানীর ফল দেখে না গেলেও তা ষোল আনাই সত্যে পরিণত হয়েছিলো। আওয়ামী চার প্রায়তঃ নেতার কথাগুলো যখন লেখার ধারায় এসেই পড়লো তখন সে প্রসঙ্গে তাদের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনারও আমার জানা অংশ এখানে উল্লেখ করলাম।

সেদিন ১৯৭৫ সনের ২রা নভেম্বর। তখনো জনাব কাজী আবদুল আউয়াল সাহেব ডি আই জি, এবং জনাব আমিনুর রহমান সাহেব জেলার। আর সেদিন, জেনারেলের কিচেনের বাঁচানো টাকা দিয়ে পরের দিন সকালের নাস্তা রুটির পরিবর্তে পায়াসের ব্যবস্থা। কাজেই বার তের মন চিনি, পনর ষোলটা ডানুর বড় বড় কৌটা আনুপাতিক হারের চালের সাথে জেনারেল কিচেনে সরবরাহ করা হয়েছে। বিকেলে কিচেনে গিয়ে রাতের বাবুর্চি ও ইনসার্জ মেটকে পায়েস পাকাবার সব কথা বুঝিয়ে শুনিয়ে আমার নিশি যাপনের জায়গা ২৬সেলে চলে আসি।

লক আপ হবার কিছু আগে জেলার সাহেব তাঁর সান্ধ্যকালীন রাউন্ডে জেলের ভেতরে আসলেন। জেনারেল কিচেনে প্রবেশ করে আমার তালাশ করলেন। ওখানে আমাকে না পেয়ে সোজা ২৬ সেলে চলে আসেন। তখন ডিউটিরতঃ পুলিশ সেলের দরজাগুলো বন্ধ করে পূর্ব দিকে আসছে। আমার সেল থেকে পূর্ব দিকের সেলগুলি তখনো বন্ধ হয়নি। তখনো খোলা সেলগুলির বাসিন্দারা বারেন্দা দিয়ে দ্রুত পায়চারী করছেন। সারা রাত তো

www.pathagar.com

সেলে বন্ধ থাকতে হবে। কাজেই যে যতটুকু বাইরে হাঁটা চলার সুযোগ পান তার সদ্ব্যবহার করে থাকেন।

আমার রুমের সামনে এসেই জেলার সাহেব বিস্মিত দৃষ্টিতে বললেন, মাওলানা সাব! আপনি এখানে নক আপ হচ্ছেন। কিচেনের পায়েস পাকের ব্যবস্থা কি? আমি বললাম সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছি। রাতের ইনচার্জ মেট সব বুঝে রেখেছে। কোন অসুবিধা হবে না। তিনি আমার কথা মানলেন না। বললেন, না না, আপনাকে জেনারেল কিচেনেই রাতে থাকতে হবে। আমার সিপাহীদের প্যান্টের যে বড় বড় পকেট, আপনি না থাকলে তাদের পকেটে করেই সব চিনি আর দুধ বাইরে চলে যাবে। কষ্ট হলেও আপনাকে রাতে কিচেনেই থাকতে হবে। পালতু দিয়ে আপনার বিছানা পত্র সব ওখানে নিয়ে যান। ওখানেই বিশ্রাম নেবেন, ঘুমাবেন। আপনার উপস্থিতি থাকলেই চুরি হবে না। ২৬ সেলের আমার সাথী মশিহুর রহমান যাদুমিয়া ও জনাব অলি আহাদ ও মেজর জয়নুল আবদীন প্রমুখ জেইলার সাহেবের কথা শুনে আমাকে অনুরোধের সুরে বললেন, যান, আপনি আজ রাতে কিচেনেই থাকেন। জেলার সাহেবের এত বিশ্বাস। তাছাড়া আপনি তো সেবার মনোভাবের মানুষ। সেবাই করে যাচ্ছেন জেলে। কাজেই একটু কষ্ট করুনই। এতগুলো কথার অবশ্য প্রয়োজন ছিলো না। আমি জেলার সাহেবের কথায়ই যেতাম।

পালতুর মাথায় বিছানা পত্র দিয়ে জেলার সাহেবের সাথে সাথেই আমি কিচেনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কিচেনের পশ্চিম পাশের একটি লম্বা উঁচু টেবিলের উপর বিছানা পত্র বিছিয়ে দেয়া হলো। আমি কিচেনে ঢুকে মেট বাবুর্চির সাথে আলাপ করে চিনিতে পানি মিশিয়ে আর দুধ পানিতে গুলিয়ে ড্রাম ভর্তি রেখে দেই। চা, শরবত খাবার সুযোগ ছাড়া তেমন বড় ধরনের চুরির আর সম্ভবনা রইলোনা। অতঃপর আমি আমার বিছানায় গিয়ে এশার নামাজ আদায় করে শুয়ে পড়ি। রাত অনুমান সাড়ে তিনটার সময় হঠাৎ বিকট পাগলা ঘন্টির আওয়াজ শুনতে পাই। নিস্তব্ধ ধরনী। পাগলা ঘন্টির বিকট আওয়াজে সমস্ত জেলখানার মানুষ সজাগ হয়ে গেছে। কিন্তু কারণ সকলের কাছে অজানা। ডিউটিরত সিপাহীরা বাইরে বলাবলি করছে–আই, জি, নুরুজ্জামান সুচতুর লোক। জেল কোডের নিয়মানুযায়ী সিপাহীরা স্ব স্ব স্থানে আছে কিনা এত রাতে পাগলা ঘন্টা বাজিয়ে সিপাহী জমাদার কে কোথায় আছে পরীক্ষা করে দেখেছেন। একটু পরেই ভীষণ গোলা গুলির আওয়াজ এলো। উঁচু উঁচু দালান ও প্রাচীরের কারণে গুলির ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কোন দিক থেকে তা বুঝাই যায় না। মনে হচ্ছিলো এ বুঝি গুলি গায়ে বিধলো এসে। চৌকার ভিতরে নজর করে দেখি সকলে মাটির সাথে মিশে শুয়ে পড়েছে। অগত্যা আমিও টেবিল থেকে ফ্লোরে নেমে শুয়ে পড়লাম। এটা ছিলো সিপাহীদের ডিউটি বদলের সময়। ডিউটি রতদের রিলিজ দেবার জন্য বাইরে থেকে যে সব সিপাহীরা আসছে তারা বাইরে যাবার সিপাহীদেরকে বলছে–"সাবধানে সারিবদ্ধ হয়ে যাও। আই, জি, ডি, আই, জি সহ সব অফিসারাই গেটে আছেন। এভাবে অজানা আশংকায় রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। অজু করে এসে কিছু ইবাদন বন্দেগী করে আল্লাহর নাম জপছি এমন সময় ফজরের আযান পড়লো। ফজরের নামাজ শেষে ওখানেই বসে আছি। এ সময়ে সুবেদার আব্দুল ওয়াহেদ

www.pathagar.com

মৃধা একটি লুঙ্গীর উপর খাকি জামা পড়ে চৌকায় প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করছেন, "মাওলানা সাহেব কোথায়? " শব্দটা আমার কানে যাবার সাথে সাথে আমি চৌকার গেটে এসে জিজ্ঞাসুনেত্রে দাঁড়ালাম। মৃধা শুধু বললেন ৪ আওয়ামী নেতা শেষ। আমি বিস্মিত নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন সৈয়দ নজরুল, তাজুদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে রাতে হত্যা করা হয়েছে। কেবা কারা হত্যা করেছে তা স্পষ্ট করে তিনি বললেন না বটে, তবে কিছু আর্মি সে সময় ভিতরে এসেছে বলে জানালেন। আমাকে সুবেদার আরো বললেন আপনি আমার সাথেই চলুন। আপনাকে ২৬ সেলে পৌঁছিয়ে আসি। যেহেতু আপনিও রাজনীতির সাথে জাড়িত কাজেই আপনার এখন কিচেনে থাকা ঠিক হবে না। পায়াস বিতরণের ব্যবস্থাটা কাউকে বুঝিয়ে দিন।

সুবেদার সাহেবের কথা মতো আমি কিচেন থেকে বেরিয়ে আসি। তখন সকাল হয়ে গেছে। কোথায়ও লকআপ খোলা হয়নি। ২৬ সেলে যাবার পথে সব জায়গায় মানুষদেরকে দরজা জানালায় ঘটনা জানার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। সুবেদার থেকে যা শুনলাম তাই জানিয়ে জানিয়ে আমি ২৬ সেলে গিয়ে পৌঁছলাম। এখানেও লকআপ খোলা হয়নি। যেহেতু 'নিউ জেল' ২৬ সেলের মধ্যে শুধু একটি প্রাচীরের ব্যবধান তাই গুলির শব্দ তাদের কাছে মনে হয়েছে যেন তাদের গায়ে এসে বিদ্ধ হচ্ছে। আমাকে দেখেই সবাই উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমি প্রতি রুমের সামনে গিয়ে গিয়ে সকলকে ৪ নেতার মৃত্যু সংবাদ জানালাম। তারা সকলেই বিশেষ করে লাল বাহিনী প্রধান আবদুল মান্নান ওজু করে নামাজের মসল্লায় আল্লার ধ্যানে মগ্ন। আমি আমার সেলে ঢুকলাম। আর বেরুতে পারলামনা। একাধারে তিন দিন গোটা জেলখানা লকআপ। শুধু জেনারেল কিচেনের বাবুর্চিদেরকে ভোরে লকআপ খুলে বের করে নিয়ে রাঁধার কাজ চালানো হয়েছে। আর এ তৃতীয় শ্রেণীদের খাওয়া দাওয়া দিয়েই ১ম, ২য়, শ্রেণী ও মেডিকেল পেসেন্টদের খাওয়া দাওয়া চালানো হয়েছে। সম্ভবতঃ ৬ নভেম্বর ৪ নেতার লাশ জেল থেকে বের করে দেবার ৩ দিন পর জেলের সব জায়গায় লকআপ খুলে দেওয়া হলো।

পরে জানলাম আই, জি, ও ডি, আই, জি, কে, কে বা কারা ফোন করে জেল গেটে আসার জন্য হুকুম দিয়েছেন। তারা উভয়ে সাথে সাথে গেটে এসে দেখেন কয়জন আর্মি অফিসার ৪নেতাকে একটি রুমে একত্র করার জন্য বলে দিয়ে তারা অফিসে অপেক্ষা করছেন। একটা বড় রুমের সকলকে সরিয়ে নিয়ে ৪ নেতাকে একটি রুমে আনা হলো। জমাদারদের মুখে শুনা কথা, তাজুদ্দীন সাহেবকে তার রুম থেকে বের করে আনার সময় প্রথমত তিনি ঘুম থেকে উঠে আস্তে ধীরে বাথ রুমে গিয়ে কসকো সাবান দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে টার্কিস টাওয়াল দিয়ে হাত মুখ মুছে বাইরে এসেছেন। তাঁর খেয়াল ছিলো তাদেরে খালেদ মোশাররফের মন্ত্রী সভায় যোগদান করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জোহরা তাজুদ্দীনও নাকি ৪ নেতার মৃত্যু সংবাদ শুনে বলেছিলেন, হায় কি শুনেছিলাম। কি হয়ে গেলো।

তাদের এক রুমে আনার পর আর্মি অফিসাররা আই, জি, ও ডি, আই জিকে সাথে করে তাদের উদ্দেশ্যে নিউ জেলের দিকে চলছেন। পথে ডি, আই, জি আবদুল আউয়াল

www.pathagar.com

সাহেব তাদের উদ্দেশ্য বুঝে বলেছিলেন, আমার দীর্ঘ চাকুরীর জীবনে এ ধরনের কোন ঘটনা জেল খানায় ঘটেনি। এমন কিছু করার ইচ্ছা থাকলে জেলের বাইরে নিয়ে গেলেই ভালো হতো। এ কথা শুনে একজন আর্মি অফিসার নাকি হোয়াট? বলে তাঁর বুকে রিভলবার তাক করে ধরে ছিলেন। আই জি, নুরুজ্জমান – আওয়ামী লীগের প্রায়তঃ এম, পি, নুরুল হকের ভাই ছিলেন ধূরন্ধর প্রাকৃতির। তিনি ছিলেন সে সময় খামুশ। খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় চার নেতা নিহত হবার ব্যাপারে একটা তদন্তকমিটি গঠন করেছিলেন। ডি, আই, জি আবদুল আউয়াল ছিলেন এ কমিটির সক্রেটারী। খালেদ মোশারফ হত্যার বিবরণ শুনে ডি, আই, জি আউয়াল সাহেবকে নাকি বলেছিলেন "আপনার ভাগ্য ভালো বলে বেঁচে গেছেন। নতুবা হত্যাকারীরা তো এধরনের কোন সাক্ষীকে জীবিত রাখেনা।"

৭ ই নভেম্বরের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরও জেলের গ্রম থমে ও ভীত সন্ত্রস্ত ভাব কেটে যায়নি। একদিন বিকালে ডি, আই, জি, সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন অফিসে। আমি গেলাম। দেখি সেখানে তার বাম পাশের চেয়ারে আই জি নুরুজমান সাহেবও বসে আছেন। জেল খানার দু একটা কথা বার্তা জিজ্ঞেস করে নুরুজ্জমান সাহেব আমাকে ইউনুস নবী (আঃ) মাছের পেটে যে দোয়াটি পড়েছিলেন তা জিজ্ঞেস করলেন। আমি দোয়াটি বলে দিয়ে আফিস থেকে বের হয়ে আসি। বিপদ উদ্ধারের জন্য আই, জি, সাহেব বিপদ মুক্তির কোরানের শিখানো দোয়া পড়েছেন। আল্লাহ তাকে একজন ভাল মুসলমান হবার তৌফিক দান করুন।

সাংগঠনিক তৎপরতা

দেশের যে পরিস্থিতিতে আমরা একত্রে যতলোক কারাগারে প্রবেশ করি এমন পরিস্থিতি জগতে কমই হয়। আর কোন এক দলের এক সাথে এত লোক করাগারে খুব কমই প্রবেশ করে। ১৯৭১ এর পূর্বে জনাব মাওলানা আবদুর রহিম, প্রফেসর গোলাম আযম, খুররম জাহ মুরাদ সহ কতিপয় শীর্ষস্থানীয় নেতা সহ কিছু নেতা জেল খেটেছেন। তারা সাধারণ জেলবাসীদের কাছে ইসলামের আইন কানুন ও ন্যায় বিচার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাদের মুখে শুনেছি তারা কুরআনের সকল আইন ও বিচারের যথার্ততা স্বীকার করেছেন। নেতৃবৃন্দ কোরানে পাকের তাফসির করতেন সেখানে।

আমাদের জেলে প্রবেশ করার পর জীবন রক্ষা করাই তো প্রথমতঃ ছিলো কঠিন ব্যাপার। কত লোক থানায় মৃত্যু বরন করেছে, কত লোক কাতারিয়ে কাতারিয়ে মরেছে জেল গেটে তার কোন ইয়ত্তা নেই। আমাদের লোক ছাত্র-অছাত্র মিলিয়ে ছিলো অনেক। গোটা জেলখানা জুড়ে জালের মত বিস্তার করে ছিলো তারা। হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডেও কাজ করতো। নোয়াখালীর ছোট ভাই সফিউল্লাহ, শাহাজাহান, পাবনার বেলাল হোসেন, ঢাকার সিদ্দিকুর রহমান শহিদ চট্টগ্রামের আবদুল্লাহ সহ আরো নাম ভুলে যাওয়া অনেক ভাই ছিলো তখন হাসপাতালের বিভিন্ন দায়ীত্বে। আবার হাসপাতালের বাইরের বিভিন্ন

www.pathagar.com

কাজেও নিয়োজিত ছিলো আমাদের লোক। আজকের কেন্দ্রীয় নেতা কামারুজ্জমান ছিলেন তখন কেস টেবিলের চীপ রাইটার। কতৃপক্ষ তার উপর ছিলেন খুবই সন্তুষ্ট। চাঁদপুরের ভাই রৌশন কামাল, আবদুল মতিন, নোয়াখালীর আকরম, রফিকুল ইসলাম, খোকা এরা ছিলো লোক দেখা শুনা করার দায়িত্বে। কুমিল্লার আবুল হাশেম ভূঞা, সরওয়ার, নজরুল ইসলাম, চাঁদপুরের মাওলানা আবদুল করিম সহ অনেকেই কাজ করেছেন অফিসের এডমিশন ব্রাঞ্চে।

নোয়াখালীর আবুল হোসেন মাহমুদ ও ফরিদপুরের সৈয়দ আহমদ বাদশা ছিলেন লেটার ব্যাঞ্চে। প্রথম দিকে নেত্রকোনার শ্রদ্ধেয় ভাই ফজলুর করিম, নোয়াখালীর এডভোকেট আনোয়ার হোসেন এবং কাপাসীয়ার মাওলানা জালালুদ্দীন আকবরীও ছিলেন জেলে। মাওলানা আকবরী চোখে কম দেখতেন। তার কাজই ছিলো শুধু তফসীরের করা। নোয়াখালীর আর একটি ভাই ছিলো আবদুল গনি। তিনিও কোথাও নিয়োজিত ছিলেন যা আমার মনে নাই। যশোরের ভাই ইঞ্জিনিয়ার খাজা মইনুদ্দিন ও শেষের দিকে আমাদের সাথে এসে যোগ হয়েছেন। তিনি ছিলেন আমার অনুবাদ 'আশীর' লিখক ও ঢাকা ভারসিটির তৎকালনি ভি, সি, ডক্টর সাজ্জাদ হোসেনের রাইটার। তার কাছে আমি কুরআন শুদ্ধ করে পড়া শিখি। ভাল কারী ছিলেন তিনি। প্রায় সব খাতায় ও ওয়ার্ডেই জামায়াতে নামাজ হতো। ওয়াজ নসিহত হতো। এসব কাজই করতো আমাদের লোকেরা। এসবই ছিলো দাওয়াত মূলক কাজ। কিন্তু ভাই কামরুজ্জামান (দ্বিতীয় বার) চট্টগ্রামের মোহাম্মাদ ভাই তাহের রংপুরের ভাই এ, টি. এম, আজহারুল ইসলাম, ফরিদপুরের ভাই সাইফুল আলম মিলন, ভাই জহরুল ইসলাম ডাক্তার আব্দুস সালাম ও ভাই মোঃ ইউসুফ ও হাফেজ সোলায়মারা যখন ১৯৮৩ সনের জুলাইর দিকে জেলে আসলেন তখন পরিকল্পিতভাবে আমরা কিছু সাংগঠনিক কাজ শুরু করি। এক এক জনকে এক এক এ্যারিয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। এ কাজে ছাত্র-অছাত্রদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করা হয়নি। আমাদের নিয়মিত বৈঠক বসতো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায়! জেল খানার নিয়ম অনুযায়ী কোন বৈঠক নিষিদ্ধ হলেও এমন কৌশলে বৈঠক করা হতো কতৃপক্ষ গপ্প গুজব হচ্ছে বলে ধারণা করতো। ভাই মোহাম্মান তাহেরের দারস, ইবাদত, আলাপ আলোচনা আমাদেরকে খুবই মুগ্ধ করতো। তারা সকলেই ছিলেন অনুপ্রেরনা ও উৎসাহের উৎস। তাহাজ্জুদের জামায়াত ও আল্লাহর দরবারে কান্না কাটা এক স্বর্গীয় জ্যুতি ফেলতো সকলের মনে। সে সময়কার পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল বুনয়ানুম মারসুচের অনুপম দৃষ্টান্ত। সুহৃদ্যতা আন্তরীকতা, হৃদয়নিংড়ানো ভালবাসা এক মায়ের সন্তানের মত গেঁথে রাখতো সকলকে। এ স্মৃতি, মনে কোন দিন কোন দুঃখ কষ্ট অনুভব করতে সুযোগ দিতনা।

বরিশালের সৈয়দ নুরুল হক এ সময় আমাদের সাথে একত্রে কাজ করেছেন। ২৩/৩/৭২ তারিখে চুয়াডাঙ্গা তার ভাইয়ের বাসা হতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ঢাকা নিয়ে আসা হয় ২৭/৫/৭২। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে এস, বি অফিসে নিয়ে যায়। সম্ভবতঃ ৭৪ এর শেষের দিকে সৈয়দ নূরুল হক বহু তদবীর তালাফির পর জেল হতে মুক্তি লাভ করেন। আর ভাই কামারুজ্জামান, মোহাম্মদ তাহেরের মত নিষ্ঠাবান,

www.pathagar.com

প্রজ্ঞাবান ত্যাগী ভাইদের জেলে আসাতে আমাদের মনে দুঃখ হলেও তাদের সাহচর্য আমাদের জেল জীবনের সাংগঠনিক কাজে বড়ই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলো। আল্লাহ অসিম করুনাময়। নবী রাসূল ও সম্মানিত ইমামদের সুন্নত আদায় করে জেল জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আমাদের জন্য উৎসাহ উদ্দিপনা যুগিয়েছেন প্রাণপ্রিয় এ ভাইয়েরা। ১৯৭৪ সনের মার্চের দিকে দু' একজন করে তারা মুক্তি পেতে থাকেন। আল্লার জমিনে আল্লার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় বাইরে গিয়ে তারা আত্মনিয়োগ করেন। তাদের সকল প্রচেষ্টা ও ত্যাগ আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন এবং আমৃত্যু পরকালের পুঁজী সঞ্চাহের কাজে নিমগ্ন রাখুন।

সাংগঠনিক কাজের যে ধারা সে সময় শুরু হয়েছিলো তাদের মুক্তির পর এ ধারা জেলের নিয়ম কানুন মেনে অব্যহত গতিতে চলতে থাকে। সম্ভবতঃ ১৯৭৩ সনের শেষের দিকে অথবা ৭৪ সনের প্রথম দিকে ময়মনসিং কারাগার থেকে ৪০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত ভাই খন্দকার আমিনুল হক ও ২০ বছরের সাজা প্রাপ্ত আসামী মোহাম্মদ ইউসুফ ট্রেনফার হয়ে আসেন ঢাকা জেলে। ইউসুফের কেস টেবিলে কাজ পাশ হয়। এতে আমাদের কাজ করার সুবিধা আরো বেড়ে যায়। বাইর থেকে বই এনে আমরা সব দলেরই প্রায় সব নেতাদের পড়াতে থাকি। শ্রমিক নেতা রুহুল আমীন ভূঞা, কবি আলমাহমুদ, সফিউল আলম প্রধান ও তার সঙ্গীদের তাফহিমুল কোরান সহ-সকল প্রকার বই পড়াতে থাকি। আওয়ামী লীগের জনাব কোরবান আলী, গাজী গোলাম মোস্তফা সহ অনেকেই আমাদের বই পত্র পড়তে শুরু করেন। এক কালের আওয়ামী লীগ নেতা-পরে ১৯৭১ সনে ৬ দফার বিপক্ষে সাক্ষী দেবার কারণে স্বাধীনতার পর জেলে আগত কিশোরগঞ্জের কুলিয়ার চরের জনাব এস, বি, জমান, 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব' বই পড়ার পর ধমকের সুরে বললেন, এতদিন এসব বই কোথায় ছিলো। কই বাইরে তো আমরা এসব বই পাইনি। বললাম তখন কি কেউ বই নিয়ে আপনাদের কাছে পৌছতে পেরেছে? এস, বি, জামান সাহেবের জেল জীবনের ইবাদত বন্দেগী উল্লেখযোগ্য। মোনাজাতে শুধু কাঁদতেন। অবশ্য আমাদেরকে তিনি স্নেহ করতেন। খুবই ধনী লোক ছিলেন তিনি। বাইর থেকে তার জন্য পর্যাপ্ত খাবার দাবার ফল-ফলারি আসতো। আমাদেরকেও তিনি আপ্যায়ন করাতেন। জাসদের রুহুল আমীন ভূঞাও আমাদের ছেলেদের আচার আচরণে সন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত হলে তিনি তাদের সাহায্য এগিয়ে আসতেন, সহযোগিতা করতেন।

শফিউল আলম প্রধান

সম্ভবতঃ ১৯৭৩ এর শেষের দিকে জনাব শফিউল আলম প্রধান সেন্ডেন মার্ডার কেসের আসামী হিসাবে ১ দিন পুলিস রিমান্ডে থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে আসলেন। তার আকাব আকৃতি আচার আচরণ নেতা সুলভ। চেহারা হতেই সাহসী পুরুষের মত মনে হয়। কিন্তু কাপড় চোপড় তার কাছে তেমন কিছু আছে বলে মনে হলো না। আমি সামান্য পরিচয় করে তার সাথে প্রথম দিনেই কিছু আলাপ করে নিলাম। তাকে ওড টুয়েন্টি -পুরান ২০ সেলে পাঠানো হলো। কেস টেবিলের রাইটার ভাই ইউসুফকে তাঁর খোঁজ নিতে ও অন্ততঃ একটা

www.pathagar.com

চাদর পৌঁছিয়ে দিতে বললাম। ইউসুফ তাই করলো। পরে বাইর থেকে জনাব প্রধানের পর্যন্ত কাপড় চোপড় আসলে ইউসুফকে তার চাদর ফেরৎ দেন।

প্রধানের কারাগারে আসার ৪/৫ দিন পর বোধ হয় তার অন্যান্য সঙ্গীরা জেলে আসলেন। তখন চার খাতায় রাতে আসা আমদানীর লোকদেরকে রাখা হতো। চার খাতার রাইটার ছিলো তখন গেং কেসের জব্বার নামের এক দাগী আসামী। বিনা বিচারে প্রায় ১০/১২ বছর থেকে জেলে আটক। পুলিশকে ঘুস দিয়ে কাজ নিয়েছে খাতায়। রাতের বেলায় প্রধানের সাথে জড়িত লোকেরা আমদানীতে গেলে রাইটার তাদের কাছে টাকা কড়ি ও সিগারেট দাবী করলো। তারাও সম্ভবতঃ কয়েকদিন পুলিশ কাস্টোডিতে ছিলো। কাজেই তাদের সাথে টাকা পয়সা ও সিগারেট কিছুই ছিলো না। আমাদানীতে যারা নতুন আসতো পুরান লোকরা তাদের উপর অত্যাচার চালাতো। সেভেন মার্ডার কেসের বন্দীরা রাইটারকে কিছু দিতে না পারাতে পরের দিন ভোরে জেনারেল কিচেনে মেন্টাল এরিয়া হতে বালতি ভরে পানি টেনে আনার জন্য জলভরি দফায়' কাজ করতে পাঠালো তাদেরে। তখন সাময়িকভাবে কাজ করার জন্য ৪খাতা হতে কিছু লোক প্রতিদিনই জেনারেল কিচেনের জন্য আনা হতো। প্রায় ১০/১২ জন বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সুন্দর চেহারার যুবক ছেলে। ওদের ব্যতিক্রম চেহারা নজরে পড়লেই ধরা পড়ে। ৪ জন করে ফাইলে বসে চৌকার লোকদের সাথে সকালের পনৃতি দিচ্ছে তারা। জেনারেল কিচেনের পূর্ব পাশে একটা ট্যাপের নীচে গোসল করছি আমি। হঠাৎ আমার নজরে পড়লো ওদের চেহারা। গোসল সেরে এসে আমি তাদের পরিচয় নিলাম। চৌকার ম্যাটকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম কারা তাদেরে এনেছে এবং ৪ খাতার কে এসব ইউনিভার্সিটির ছেলেদের মেন্টাল থেকে পানি টানার জন্য এখানে পাঠিয়েছে। জব্বার জোর করে এদের পাঠিয়েছে বলে ম্যাট আমাকে রিপোর্ট দিলো। আমি কারণ বুঝলাম। ত্বরা করে তৎকালীন সুবেদার আবু তাহের মিঞার নিকট কেস টেবিলে গিয়ে বসলাম, "সেভেন মার্ডার কেসের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিয়ে 'জল ভরিতে' এভাবে পানি টানানো খুবই অন্যায় হবে। তারা আজ না হয় অসুবিধায় আছে। কিন্তু কালই এদের ব্যাপারে পত্র পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হবে। এদের অপরাধ যা ই হোক তাদেরে রাজনৈতিক মর্যাদা দিতে হবে। জব্বার এদের কাছে টাকা-পয়সা পান-সিগারেট না পেয়ে জিদ করে এদেরে জেনারেল কিচেনে জল ভরিতে কাজ করতে পাঠায়েছে। আপনি তাড়াতাড়ি এদেরে এখান থেকে উঠিয়ে নিন।" সুবেদার কাল বিলম্ব না করে আমার সাথে কিচেনে এসে তাদেরে সরিয়ে নিলেন ও প্রায় সবাইকে আমি যেখানে থাকি সেখানে থাকতে দিলেন তিনি। এভাবে তাদের সাথে একটা ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠে।

গোটা বাংলাদেশে আমাদের বিচারাধীর ও সাজা প্রাপ্তদের জন্য থানায় কোর্টে-কাচারীতে হাইকোর্টে তদবীরের কাজ করেছেন নোয়াখালীর ছোট ভাই সফিউল্লাহ মিঞা। একদিন দু'দিন নয়, গোটা কয়েক বছর ছাত্র অছাত্র সকলের মামলার তদবির মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্যই তিনি নিরলস কাজ করেছেন। খোঁজ খবর নিয়েছেন। জিনিসপত্র বইপত্র পাঠিয়েছেন। মুরব্বিরা তাকে আদর করে ডাকতেন 'এটর্নি জেনারেল।' জেল থেকে সম্ভবতঃ'৭৩ এর শেষের দিকে মুক্তি পাবার পর থেকেই সে এ কাজে নিয়জিত। দাওয়াতী

www.pathagar.com

কাজের যে সেলসেলা আমরা ওখানে রেখে এসেছিলাম তার ধারা খোদার ফজলে এখনো চলছে ওখানে। যথেষ্ট লোক একামতে দ্বীনের দাওয়াত কবুল করছেন এবং যে কোন হুমকীর মোকাবেলা করে কাজ করে যাচ্ছে। ছোট ভাই সফিউল্লাহ এখনো সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাকে দ্বীন দুনিয়ার সাফল্য দান করুন।

হাইকোর্টের শুনানী ও রায়

হাইকোর্টে আমার আপীল দায়ের করা আছে ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে–নির্দোষ দাবী করে। আবার সরকার পক্ষও এ রায়ের বিরুদ্ধে রিভিশন আপীল দায়ের করেছে–জঘন্য অপরাধী হিসাবে আমার শাস্তি বাড়িয়ে–ফাঁসি অথবা জরিমানা সহ যাবজ্জীবন কারাদন্ডের জন্য। বহু অপেক্ষার পর তদবির ছাড়াই ১৯৭৬ সনের ২২, ২৩ ও ২৪ মার্চ হাইকোর্টে উভয় আপীলের শুনানী চললো। ২৯ শে এপ্রিলে রায় ঘোষণা হলো। দলিল সংরক্ষণ ও বিজ্ঞ এবং উৎসুক্য পাঠকদের জন্য হাইকোর্টের এ শুনানী ও রায় সন্নিবেশিত করা হলো।

সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশ হাইকোর্ট ডিভিশন

ক্রিমিনাল আপীলেট রিভিশনাল জুরিসডিকশন

২৯ শে এপ্রিল ১৯৭৬ ইং

(১) মিষ্টার জাষ্টিস বদরুল হায়দার চৌধুরী

এবং

(২) মিষ্টার জাষ্টিস সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী

ক্রীমিনাল আপীল নং ৬৫, ১৯৭২ রিভিশন ২২০, ১৯৭২

(১) এ, বি, এম, আবদুল খালেক ওরফে আবদুল খালেক আপীলেন্ট।

বনাম

(২) বাংলাদেশ সরকার ---------- রেসপনডেন্ট।

মিষ্টার মজিবুর রহমান

মিষ্টার আবদুল ওয়াদুদ খান এবং

মিষ্টার সা'দ আহমদ আপীলন্টের পক্ষে

মিষ্টার আবদুল আজিজ ----- সরকার পক্ষে

মামলাটি ১৯৭৬ সনের মার্চ মাসের ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখে শুনা হয়। আর ওই সনেরই ২৯ শে এপ্রিল রায় ঘোষণা হয়।

www.pathagar.com

এই মামলার মূল বাদীর বর্ণনা ছিলো যে ১৯৭১ সনের ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা অথবা সাড়ে ৬টার দিকে কারাফউর সময়ে আপীলকারী বিবাদী তার দলের সদস্য সহ স্টেনগান, রিভলবার ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শহিদুল্লাহ কায়সারকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে অপহরণ করে। শহিদুল্লাহ কায়সারকে আর পাওয়া যায়নি।আপীলকারী জামায়াতে ইসলামী পার্টির অফিস সেক্রেটারী এবং বদর বাহিনীর সদস্য ছিলো। তিনি পাকিস্তান আর্মিকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন। তাই তিনি ১৯৭২ সনের ৮নং প্রেসিডেন্ট অর্ডার অনুযায়ী কলাবোরেটর। ২০/১২/৭১ থানায় এজাহার করা হয়েছে। তদন্ত করার পর পুলিশ বিবাদীর বিরুদ্ধে ১৯৭২ সনের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৮ এর অধীন বাংলাদেশ প্যানাল কোড এর ৩৬৪ ধারায় চার্জসীট দায়ের করেছে।

বিবাদী পক্ষের বর্ণনা হলো যে বিবাদী আবদুল খালেক জামায়াতে ইসলামীর একজন মেম্বার এবং এ দলের একজন অফিস সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি না ছিলেন পাক আর্মির কলাবোরেটর আর না ছিলেন বদর বাহিনীর সদস্য। উপরন্তু তিনি শহিদুল্লাহ কায়সারকে কখনো অপহরণ করেননি। তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ এ মামলায় আসামীকে অন্যায়ভাবে জড়িত করা হয়েছে। বিবাদী পক্ষ তার আইডেন্টিফিশনকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন। কারণ গ্রেফতার করার সাথে সাথেই আসামীকে শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ সুযোগে সাক্ষীগণ তাকে দেখে ফেলেছেন। গ্রেফতারের পর সকল জাতীয় দৈনিক খবরের কাগজেও তার ছবি ছাপা হয়েছে। বাদীপক্ষের ১নং সাক্ষী নাসির আহমদ বলেন, তিনি শহীদুল্লাহ কায়সারের ভগ্নিপতি। জনাব কায়সার ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন সমর্থক। ঘটনার দিন ৭/৮ ব্যক্তি ঢাকার ২৯ নং কয়েতটুলীর বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাদের হাতে ছিল স্টেনগান, রিভলবার, রাইফেল। তারা ছাই রঙের ইউনিফরম পরা ছিল। সাক্ষী তাদেরকে আল বদর বাহিনীর সদস্য হিসাবে চিনতে পেরেছিলেন। ব্ল্যাক আউট থাকা সত্তেও সাক্ষী বাড়ীর সব লাইটগুলো এ সময় জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।চার ব্যক্তি রুমে ঢুকে শাইদুল্লাহ কায়সারকে তার বিছানা থেকে ধরে নিয়ে যায়। সাক্ষী আরো বলেন–শহিদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা বাধা দিতে এলে তারা তাদেরকে সরিয়ে দেন। তিনি আরো বলেন, সে সময় অনেক বুদ্ধি জীবিকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাই তারা ধরে নিয়েছিলো যে কায়সারকে মেরে ফেলা হবে। তারা বিভিন্ন জায়গায় তাকে খোঁজা খুঁজি করেছেন। তারা ফজলে রাব্বি, আলীম চৌধুরী প্রফেসার এক রহমানের লাশ দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু শহিদুল্লাহ কায়সারের মৃত দেহ খুঁজে পাননি। সাক্ষী আরো বলেন যে শহিদুল্লাহ কায়সারকে নিয়ে যাবার সময় জাকারিয়া নিজে, তার স্ত্রী, কায়সারের স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে তিনি চেহারা দেখে একজনকে চিনেছেন এবং জাকারিয়াও একজনকে চেহারায় চিনেছেন বলে জানায়েছেন। রাত ৮টার দিকে আত্মীয় স্বজন ও থানার সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু থানা বা অন্য কোনখান থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। কারণ তখন কারফিউ ছিলো। এবং প্রশাসন ছিলো অচল। সাক্ষী আরো বলেন, স্বাধীনতার পর ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭০, তারা আবার শহিদুল্লাহ কায়সারের তালাশে বের হন। এ সময় তারা কায়েতটুলী মসজিদের ইমামের নিকট শুনতে

www.pathagar.com

পান যে ১৪/১২/৭১ এ বিবাদী আবদুল খালেক তার নিকট শহিদুল্লাহ কায়সার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। বিবাদী আবুদল খালেক জামায়াতে ইসলামীর একজন কর্মী ও সদস্য এবং আল বদরেরও একজন সদস্য বলে ইমাম তাদেরকে জানিয়েছিলেন। সাক্ষী আরো বলেছেন যে তিনি ও জাকারিয়া এবং অন্যান্যরা সহ আবদুল খালেককে তার বাড়ীতে খুঁজতে গিয়েছিলেন কিন্তু তাকে ওখানে পাওয়া যায়নি বাড়ীর মালিক সাক্ষী হাবিবুর রহমান তাদেরে বলেছেন যে আবদুল খালেক ১৬/১২/৭১ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। তারা বাড়ীর মালিকের নিকট চাবি চেয়ে নিয়ে তার বাসায় অনেক কাগজ ও ফাইল পত্র পান যা জামায়াতে ইসলামী ও পাক আর্মির সাথে যোগাযোগ সম্বলিত ছিলো 'তারা আবদুল খালেকের একজন আত্মীয়ের সন্ধান পেয়ে মুক্তি বাহিনী সাথে নিয়ে তার খোঁজে বের হয়ে যান। সাক্ষী আরো বলেন যে, বাড়ীর মালিক হাবিবুর রহমান তাদেরে বলেছিলেন, আবদুল খালেকের একটি রিভালবার ছিলো ১৫/১২/৭১ তারিখে হাবিবুর রহমান দরজা খুলতে দেরী করায় তার উপর তিনি পিস্তল উচিয়ে ধরেছিলেন এবং সাক্ষী এর পর বর্ণনা করেন যে তারা ২২/১২/৭১ তরিখে আবদুল খালেককে তার এক ভায়রার বাড়ীতে খোঁজে পান। এখানে তাকে সাথে সাথে তারা সনাক্ত করেন যে, যারা শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করেছিলেন আবদুল খালেক তাদের একজন। সাক্ষী বলেন তিনি তাকে সনাক্ত করেন। তাকে গ্রেফতার করে একটি গাড়ীতে করে নিয়ে আসেন। আবদুল খালেকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মুক্তি বাহিনী ৪৪টি বুলেটসহ রিভলবাটি উদ্ধার করে। তিনি বলেন, তারা, ২০/১২/৭১ এজাহার দায়ের করেন। শহিদুল্লাহ কায়সারের ছোট ভাই জনাব জহির রায়হান একটি প্রাইভেট ইনকোয়ারী কমিটি করেছিলেন। আবদুল খালেকের বাড়ী তল্লাশী করে যে সব কাগজ পত্র পাওয়া গিয়েছিলো তার নিকট জমা দেয়া হয়েছে। সাক্ষী আরো বলেন যে, ৩০/১/৭২ তারিখে জহির রায়হানও মিরপুর হতে নিখোঁজ হন। জেরায় সাক্ষী এ কথা স্বীকার করেন যে একজন লোককে চেহারায় চিনতে পেরেছেন বলে তিনি কোন পুলিশকে জানাননি। তিনি বলেন যে বাড়ীটি ঘন বসতি এলাকার অবস্থিত। ১৬ তারিখ বিকাল বেলায় যখন প্রতিবেশী লোকজন তাদের বাড়ীতে আসল তখন তিনি তাদের কাছে ঘটনার বর্ণনা দেন ও একজনকে চেহারায় চিনেন বলেও জানান। ইমামই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাদেরে জামায়াতের আবদুল খালেকের এখানে থাকার কথা জানান। তিনি বলেন মেজর হায়দার বিবাদী খালেকের বাড়ী তল্লাশী করেছিলো। তিনি আরো বলেন যে ২২/১২/৭১ এ সর্ব প্রথম তিনি উপলব্ধি করলেন, যারা শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপহরন করেছেন বিবাদী আবদুল খালেক তাদের একজন।

২নং সাক্ষী জাকারিয়া ঃ

বলেন, শহীদুল্লাহ কায়সার তার বড় ভাই। তিনি বলেন ৪/৫ জন লোক দরজা ভেঙ্গে বাড়ীতে প্রবেশ করে।এই আসামীর নিকট ছিল স্টেনগান। তাদের একজন তাকে ধরে ফেলেছিলো। তাদের পোশাক মেটে রং এর বলে তিনি লক্ষ করেছিলেন। এই পোশাক আল বদরের পোশাক বলেও তিনি জানতেন। এই লোকেরা এর পর তাকে ধরে নিয়ে দোতলায় চলে যায় এবং শহিদুল্লাহ কায়সারের কামরায় প্রবেশ করে। একই ব্যক্তি যে সাক্ষীকে

www.pathagar.com

ধরেছিল সে-ই শহিদুল্লাহ্ কায়সারকেও ধরলো। সে প্রথম শহিদুল্লাহ্ কায়সারের পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। তার পর তারা তাকে ও শহিদুল্লাহ্ কায়সারকে নীচের তলায় নিয়ে যায়। সাক্ষী বলেন তার ছোট বোন শাহানাও তাবী সাইফুন্নাহার চীৎকার দিতে শুরু করলো। কারণ তারা অনুমান করেছিলো যে শহিদুল্লাহ্ কায়সারকে মেরে ফেলার জন্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ২নং সক্ষী আরো উল্লেখ করেন যে, ব্যক্তি তারে ধরেছিলো তাকে চেনা বলে মনে হচ্ছিল। তারা ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বরের বিকালের আগে কারফিউর কারণে বের হয়ে আসতে পারেনি বলেও জানান। ১৭ই ডিসেম্বর মসজিদের ইমাম হাফেজ আশ্রাফ রাত সাড়ে ৮ টায় কি ৯টায় তাদের বাড়ীতে এসে জানান যে জামায়াতে ইসলামীর একজন লোক তাকে শহিদুল্লাহ্ কায়সার কোথায় থাকেন –এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। তার পর তারা জামায়াতে ইসলামীর এ লোকটিকে খোঁজার জন্য ৪৭নং আগামাসি লেনে যান। বাড়ীর মালিক বেরিয়ে আসলেন। তার বাড়ী তালা মারা ছিলো। এরপর বাড়ীর মালিক কামরা খুললেন এবং তারা বাড়ীতে এমন সব কাগজ ও ফাইলপত্র লক্ষ্য করলেন যাতে মনে হলো আবদুল খালেক জামায়াতে ইসলামী পার্টির সেক্রেটারী।তার পর সাক্ষী বললো, তারা ২২/১২/৭১ তারিখে মালিবাগ থেকে তাকে খোঁজ বের করেন এবং প্রথম দৃষ্টিতেই চিনতে পারেন যে যারা শহীদুল্লাহ্ কায়সারকে অপহরণ করার জন্য দায়ী এ- তাদের একজন। সাক্ষী বলেন,বিবাদীকে মুক্তি বাহিনী গ্রেফতার করেছিলো।তারা শহিদুল্লাহ্ কায়সারকে রায়ের বাজারে খোজে বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শহিদুল্লাহ্ কায়সার ছাড়া অন্যান্য কিছু লাশ সেখানে দেখতে পান। এক জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে বিবাদীকে মুক্তি বাহিনী ধরে নিয়ে যায়।তাকে তাদের আগামাসি লেনের বাড়ীতে আনা হয়নি। বিবাদীকে মালিবাগ গ্রেফতারের সময় তারা সাথে ছিলো। তারা নোট বুক থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে তারা তাকে ধরেছিলেন। কাগজ পত্র সব জহির রায়হানের কাছে জমা দেয়া হয়েছিলো। পরে তিনিও নিখোঁজ হন। এসব কাগজ কোথায় তা তিনি জানেন না। সাক্ষী তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে বলেছিলেন , আসামী তাকে ও শহিদুল্লাহ্ কায়সারকে উপর তলা হতে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি মসজিদের ইমাম থেকে প্রথম জেনেছিলেন যে পাড়ায় একজন "আলবদর" বাস করে–এই ব্যক্তিই আবদুল খালেক। এ খবর পাবার পর তাদের সন্দেহ পরিলক্ষিত হতে থাকে। তিনি বলেন, তিনি টি, আই, প্যারেডে অংশ নেন নাই। নিউজ পেপার পড়তে অভ্যস্ত হলেও কটো সম্বলিততার গ্রেপতারের খবর তিনি পড়েননি।

৩নং সাক্ষী হাবিবুর রহমান ঃ

৪৭ নং আগামসি লেনের বাড়ীর মালিক বলেন, বিবাদী আবদুল খালেক তার বাড়ীতে ভাড়াটিয়া হিসাবে বাস করতেন। সারেন্ডারের ১৫/২০ দিন আগে তার পরিবার এখান থেকে চলে গিয়েছিল। বিবাদী নিজে এখান থেকে চলে গিয়েছিল ১৫ তারিখ রাতে। সারেন্ডারের আগের রাত সাড়ে নয়টায় আসামী বাড়ীতে এসে দরজা খুলতে বলে। দরজা খুলতে দেরী হওয়ায় আসামী তার বুকে পিস্তল ধরে। আসামী কারফিউ অবস্থায় বাইরে চলাফেরা করতেন।

৪নং সাক্ষীঃ

www.pathagar.com

কায়েতটুলী মসজিদের ইমাম বলেন, ১৪/১২/৭১ এ আসরের নামাজের পর বিবাদী তার নিকট শহিদুল্লাহ্ কায়সার এ বাড়ীতে থাকেন কিনা জানতে চেয়েছেন। উত্তরে তিনি জানেন না বলে জানিয়েছেন। ১৭ তারিখে তিনি শহিদুল্লাহ্ কায়সারের ১৪ তরিখে নিখোঁজ হবার খবর শুনে তাদের বাড়ীতে আসেন। তিনি ১নং ও ২নং সাক্ষীকে জানান যে বিবাদী শহিদুল্লাহ্ কোথায় থাকেন এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করেছে। এক জেরার জবাবে ইমাম জানান, তিনি শহিদুল্লাহ্ কায়সারকে নিয়ে যাবার কথা শুনেছেন। যেহেতু এলাকায় কারফিউ ছিলো তাই এ বাড়ীতে আসতে পারিননি। এমন কি তিনি অন্যত্র ব্যস্ত থাকার কারণে ১৬ তারিখেও বাড়ীতে আসতে পারেননি। ইমাম সর্বশেষ বিবাদীকে ১৬ তারিখ আসরের নামাজের সময়ও দেখেছেন। তিনি আরো বলেন বিবাদী খোঁজ নেয়ায় তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়নি তিনি বলেন ১নং ও ২নং সাক্ষী তাকে বলেছেন যে আল-বদর রাজাকাররা শহিদুল্লাহ্ কায়সারকে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন বিবাদী জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী ছিলেন এবং এ মসজিদে নামাজ পড়তেন।

৫ নং সাক্ষী গিয়াসুদ্দীনঃ

অত্র এলাকার একজন বাসিন্দা। তিনি বলেন যে বিবাদী আবদুল খালেক এই বাড়ীতে ৪/৫ মাস থেকে বাস করতেন। তিনি তাকে ১৬ ই ডিসেম্বর সকালে সাড়ে ৭টার দিকে সর্বশেষ দেখেছেন। তিনি বলেন আবদুল খালেক জামায়াতে ইসলামীর একজন মেম্বার। তার অফিস ছিলো সিদ্দিক বাজার। এক জেরার জবাবে তিনি বলেন মুক্তি বাহিনী রুম থেকে রিবলবার উদ্ধার করেছে।

৬নং সাক্ষী ফজলুর রহমান ভূঁঞা ঃ

প্রমাণ করেছেন যে বিবাদী আবদুল খালেককে ১৩/৭/৭১ তারিখে একটি রিভলবারের লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছিল। এই লাইসেন্সের জন্য একজন মেজর ষ্টাফ অফিসার রিকমন্ড করেছিলেন। লাইসেন্স দেবার ক্ষমতা সে সময় আর্মি কর্তৃক ডি, সি, থেকে রহিত করা হয়েছিল। লাইসেন্স রেজিষ্টার ২ থেকে প্রমাণ করেছেন যে আব্দুল খালেক একটি ৫০৮১ এর রিভলভার, বুসেল, করাচী, থেকে খরিদ করেছিল ২৯/১০/৭১ তারিখে।

৭নং সাক্ষী সাইফুরন্নাহারঃ

শহীদুল্লাহ্ কায়সারের স্ত্রী বর্ণ না করেন যে ১৯৭১ এর ১৪ ডিসেম্বর অনুমান সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কিছু আলবদরের সদস্য জোর করে তাদের বাড়ী ঢুকে পড়ে। তাদের সাথে টেনগান ও রিভলবার ছিল। ব্ল্যাক আউট থাকা সত্বেও তিনি সব গুলো লাইট জ্বালিয়ে দেন। তিনি ভীত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি শুনেছেন, যে সব বুদ্ধিজীবি স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দিয়েছেন তাদেরে আলবদরের লোকেরা ধরে নিয়ে হত্যা করছে। তার স্বামী স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। তিনি বলেন আলবদরের লোকেরা তার দেবর জাকিরিয়াকে নিয়ে উপরের তলায় আসে এবং তার স্বামীর রুমে প্রবেশ করে। তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করে। তিনি শহিদুল্লাহ্ কায়সার বলে যখন তারা নিশ্চিত হলেন তখনই তারা তাকে ধরে ফেললেন এবং ধরে নিয়ে গেলেন। তিনি বলেন, তারা চীৎকার দিতে শুরু

www.pathagar.com

করলেন এবং বাধা দিতে চেষ্টা করলে তারা তাদেরকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন। শহিদুল্লাহ ও জাকারিয়া উভয়কে তারা নিয়ে গেলো। তার স্বামী ও দেবরকে হত্যা না করার জন্য তারা তাদেরে অনুরোধ জানালো। তিনি নিচের তলায় যাননি। সেখানে কি হয়েছে তিনি জানেনা তিনি বলেন যে ১নংও ২নং সাক্ষী তাকে বলেছেন এদের একজনকে চেহারায় তারা চিনেন। তিনি বলেন যে, তার ধারনা ছিলো অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের সাথে তার স্বামীকেও মেরে ফেলা হবে। টি, আই প্যারেডে তিনি অংশ নিয়েছেন। বিবাদীকে, যে ১৪ তারিখে তাদের বাড়ীতে ঢুকেছে, সনাক্ত করতে পেরেছেন। এক জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সে রাত্রেই ১নং ও ২নং সাক্ষী তাকে বলেছেন, তাদের একজনকে তারা চেহারার চিনতে পেরেছেন। তিনি সে সময় খবরে কাগজ পড়েননি। তার মনের অবস্থা ভাল ছিলনা। বিবাদী নিজে এ সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করছে যে এটা কি সত্য নয় যে আসামীকে ২২/১১/৭১ গ্রেফতারের পর তাদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ৩ঘন্টার মত আটক করে রাখা হয়েছে। এবং সাক্ষী বিবাদীকে জিজ্ঞেস করেছেন তার স্বামী কোথায় আছেন বলতে। কিন্তু সাক্ষী এ সাজেশন অস্বিকার করেছেন এবং বলেছেন তিনি আসামীকে টি, আই প্যারেডের আগে কখনো দেখেননি।

৮নং সাক্ষী লীলা জাকারিয়াঃ

২নং সাক্ষীর স্ত্রী বর্ণনা করছেন যে তারা বাড়ীর প্রথম তলায় বাস করেন আর শহিদুল্লাহ কায়সার বাস করতেন দোতলায়। সাক্ষী আরো বলেন যে তার স্বামী জাকারিয়া এবং নাসের তাদের বলেছিলেন তারা তাদের একজনকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন। সাক্ষী টি, আই প্যারেডে অংশ নিয়েছেন এবং আসামীকে সনাক্ত করতে পেরেছেন। এই সাক্ষীও সে সময় খবরে কাগজ পড়েনি বলে জানিয়েছেন এবং ফটো সহ বিবাদীর গ্রেফতারের সংবাদ খবরে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে বলেও তিনি জানেনা না। টি, আই প্যারেডে আসামীর কাঁদ পর্যন্ত চাদর ঝুলে ছিলো বলে তার স্বামী তাকে বলে দিয়েছে এ সাজেশন ও তিনি অস্বীকার করেন।

৯নং সাক্ষী শাহানা বেগমঃ

বর্ণনা করেন শহীদুল্লাহ কায়সার তার ভাই। তিনি টি, আই প্যারেডে আসামীকে সনাক্ত করেছেন বলেও বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, যে তার ভাইকে অপহরণ করেছে তার চেহারা তিনি কখনো ভুলবেন না। এক জেরার জবাবে তিনি জবাব দেন যে তিনি পুলিশের কাছে কি বলেছেন তার স্মরন নেই। কিন্তু আসামীর গালে যে তিলক আছে তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেন জাকারিয়া এবং নাসির তাকে বলেছিলেন যে তাদের একজনকে আব্দুল খালেক বলে তারা চিনতে পেরেছেন।

১০নং সাক্ষী মিষ্টার সলিমউদ্দিনঃ

টি, আই প্যারেড পরিচালনা করেন ৯/৩/৭২ তারিখে। তিনি বলেন ৩ জন সাক্ষীর সকলে (সাক্ষী নং ৭, ৮, ৯,) বিবাদী আবদুল খালেককে সনাক্ত করেছেন।

১১নং সাক্ষী শাহাব উদ্দিঃ

www.pathagar.com

বলেন ২০/১১/৭১ তারিখে তিনি একটি লিখিত এজহার পান। সে সময় স্বাভাবিক অবস্থা ছিলনা, নিয়ন্ত্রন ছিল মুক্তি বাহিনীর হাতে। ১২ নং সাক্ষী ইনসপেক্টর শামসুদ্দীন তদন্ত করেন। তিনি তদন্ত হাতে নেন ৩/২/৭২ তারিখে। প্রত্যেক সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি শুনেছেন যে জহির রায়হানের নিকট কিছু কাগজ পত্র ছিলো কিন্তু কেউ তাকে সে সবের সন্ধান দিতে পারেনি। ৮/২/৭২ তারিখে তিনি আসামীকে গ্রেফতার করেন এবং ২০/৪/৭২ তারিখে চার্জসীট দাখিল করেন জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন তাকে মুক্তি বাহিনীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি যারা আসামীর বাড়ী তল্লাশী করেছেন। বাদীর কাছে তিনি শুনেছেন যে আসামী মুক্তি বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছে। আসামী নিজেও তাকে বলেছেন যে তাকে গ্রেফতার করে মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্পে আনা হয়েছে। কিন্তু কোন ক্যাম্পে তা বলেনি। সাক্ষী বলেন, সাক্ষী শাহানা বেগম তাকে এ কথা বলেননি যে তিনি একজন লোককে সনাক্ত করেছেন যার গালে একটি তিলক ছিলো।

১৩ নং সাক্ষী আবদুল বারেক ঃ

বর্ণনা করেন যে তিনি মামলাটি প্রথম দিকে তদন্ত করেন। তারপর মামলাটি সি, আই, ডি, কাছে হস্তান্তর করা হয়। এক জেরার জবাবে তিনি বলেন ১৯৭১ সনের ৩১ডিসেম্বর বাদী (নাসীর ১নং সাক্ষী) তাকে টেলিফোনে খবর জানান যে আসামী মুক্তি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছে এবং জেল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এই মামলার সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে দর্শায়ে এস. ডি. ও. র কাছে কোন রিপোর্ট পেশ করা হয়নি আর আসামীর সাথেও তিনি জেলে সাক্ষাৎ করেননি। ১৯৭২ এর ১০ ই জানুয়ারী তিনি বাদীর কাছ থেকে জেনেছেন যে শহিদুল্লাহ কায়সারের মৃতদেহ পাওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন ৪নং সাক্ষী হাফেজ আশ্রাফুদ্দীন সম্পর্কে তিনি কিছু জানেনা। তিনি বলেন, তিনি ১৯৭১এর ২০, ২১, ও ২২ ই ডিসেম্বর ঢাকায় এটেন্ড করেছেন।

এ মামলার পক্ষে এ হলো উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ যা বাদী পক্ষ এখানে পেশ করেছেন।

আপীল দায়ের কারী এ শাস্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এড্‌ভোকেট মিষ্টার মুজিবুর রহমান এ্যাপেলেন্টের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে (১) ট্রায়াল কোর্ট এ্যাপেলেন্টের আলবদর বাহিনীর সদস্য এ ধারনার বশবর্তী হয়ে রায় ঘোষণা করেছেন। যদিও তার আলবদর হবার এমন কোন প্রমাণ নেই। যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে, এই মতামতের ভিত্তির জন্য ট্রায়াল কোর্ট যে তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন তা হলো বিবাদী কারফিউর সময় বাইরে যেতেন কাজেই তার ধারণা বিবাদী একজন কলাবোরেটর ছিলেন। (২) অতঃপর বিজ্ঞ এডভোটেক যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, এই ধারণাই যে বিবাদী একজন আলবদর এবং কলাবোরেটর। এ কারণেই রিভলবারের একটি লাইসেন্স পেয়েছেন আর প্রকৃতই বিবাদী ২০/১০/৭১ তারিখে একটি রিভলবার খরিদ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণ করলো যে, এ্যাপেলেন্ট পাক আর্মির একজন কলাবোরেটর ছিলেন। যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে ট্রায়াল কোর্ট ৭নং ৮নং ও ৯নং সাক্ষীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। যারা বিবাদীকে টি, আই

www.pathagar.com

প্যারেডে সনাক্ত করেছেন, অতঃপর ট্রায়াল কোর্ট ৪নং সাক্ষী হাফেজ আশ্রাফের সাক্ষী বিবেচনা করেছেন। এ সব বিবেচনা করে ট্রায়াল কোর্ট সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বিবাদী শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণকারীদের একজন। বিজ্ঞ এডভোকেট মুজিবুর রহমান সরকার পক্ষীয় প্রত্যেকটি প্রমাণের বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। বাদী পক্ষের উত্থাপিত প্রতিটি প্রমাণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে ট্রাইবুনাল কোর্টের সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ। বিজ্ঞ এডভোকেট যুক্তি দেখিয়েছেন যে ৪ নং সাক্ষী হাফেজ আশ্রাফুদ্দীন একথা কোথায়ও বলেন নাই যে বিবাদী আল বদরের সদস্য ছিলেন। অথচ তার সাক্ষীকে বিবেচনা করে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ২০/১২/৭১ এ থানায় পেশকৃত এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিবাদী আলবদরের সদস্য ছিলেন। এ এজহার দায়ের করা হয়েছে আসামীকে গ্রেফতার করার পূর্বে। বাদী পক্ষের সাক্ষীদের আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে সাক্ষীরা কেউ বলেনি যে আসামী বদর বাহিনীর সদস্য ছিলেন। এটা অবশ্যই সত্য যে আসামী জামায়াতে ইসলামীর একজন সদস্য ছিলেন। এ কথা অস্বীকার করা হয় নাই। এ কথাও সত্য যে বিবাদী রিভলবার খরিদও করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি অর্ডার নং ৮, আর্টিকেল ।। পারর্ট ।V অনুযায়ী ট্রায়াল কোর্ট দেখলেন যে বাদীপক্ষ কলাবোরেশনের কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি তাই বিবাদীর বিভল বার সংগ্রহের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব শিথিল হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন থাকলো যে এ্যাপেলেন্ট আবদুল খালেক মজুমদার কি শহীদুল্লাহ কায়সারকে ১৪/১২/৭১ এ অপহরণকারী দুস্কৃতিকারীদের একজন? এ ব্যাপারে ১নং ২নং ৭নং ৮নং ও ১নং সাক্ষীদের সাক্ষ্যই প্রমাণ। ১নং সাক্ষী নাসির থানার এজহার দায়ের করেন ২০/১২/৭১ তারিখে। এ কথা জানিয়ে যে কিছু বদর বাহিনীর সদস্য শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করেছে। তার পর উল্লেখ করেন যে এলাকার লোকজন থেকে জনৈক আবদুল খালেকের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি ৪৭ নং আগামসি লেনে বাস করতেন। এজাহারে বলা হয়েছে "তিনি শহিদুল্লাহ কায়সারকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি জামায়াতে ইসলামী ও আলবদর বাহিনীর একজন নেতা ও সার্বক্ষণিক কর্মী। মিটার মুজিবুর রহমান এ এজহারকে দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এলাকায় একজন সাক্ষীও এ কথা বলেননি যে আবদুল খালেক শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করেছেন। শুধু ৪নং সাক্ষী মসজিদের ইমাম বলেছেন যে আবদুল খালেক ১৪ তারিখে শহিদুল্লাহ কায়সার এ বাড়ীতে থাকেন কিনা তাকে জিজ্ঞেস করেছেন। বিজ্ঞ এডভোকেট যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে যদি শহিদুল্লাহ কায়সারের গতি বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখাই অপরাধীর অভিপ্রায় হয় তাহলে এটা বেশী বলা হয়ে যায়। কারণ এ সাক্ষীই বলেছেন যে এ ধরণের প্রশ্ন তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করেনি। কারণ এ এ্যাপেলেন্ট এ এলাকায় ২/৩ বছর থেকে বাস করছেন। এর পর এ এলাকার ৪৭ আগামসি লেনে ৪/৫ মাস থেকে বসবাস করছেন। এটা একটা ঘণ বসতিপূর্ণ এলাকা। শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ী মসজিদ থেকে পশ্চিমে ২/৩ বাড়ী দূরে। আবার বিবাদীর বাড়ী মসজিদ থেকে দক্ষিণে ৪/৫ বাড়ী দূরে। সাক্ষীর সাক্ষ্য হতে প্রামাণ হয় বিবাদী এ মসজিদেই নামাজ আদায় করতেন। দেশের বিরাজিত অস্বাভাবিক অবস্থার প্রেক্ষিতে একজন প্রতিবেশী

www.pathagar.com

হিসাবেও বিবাদী ইমামের নিকট শহিদুল্লাহ্ কায়সার কোথায় থাকেন, জিজ্ঞেস করতে পারেন। এ দৃষ্টিতে ব্যাপারটা বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ শহিদুল্লাহ্ কায়সার একজন পরিচিত বুদ্ধিজীবি।

এরপর বিজ্ঞ এডভোকেট বলেন ১৭ তরিখে ইমাম থেকে খবর পেয়ে ১নং ও ২নং সাক্ষী বিবাদী এ্যাপেলেন্টের বাড়ীতে দৌড়িয়ে যায় এবং তাকে বাসায় পায়নি। এদিকে ৩নং সাক্ষী বাড়ীর মালিক হাবিবুর রহমান তাদেরে বলেছেন যে সারেন্ডারের পূর্ব রাতেই বিবাদী বাসা ছেড়ে চলে গেছে। এ কথাও ৪নং সাক্ষীর সাক্ষ্যের সাথে আমিল। কারণ ৪নং সাক্ষী বিবাদীকে সারেন্ডারের দিন বিকালেও অর্থাৎ ১৬/১২/৭১ রাস্তায় দেখেছেন। আর ঠিক এ কথাটাই ৫নং সাক্ষী গিয়াসুদ্দীনও বলেছেন যে তিনি বিবাদীকে ১৬/১২/৭১ তারিখের সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বড় রাস্তার মোড়ে দেখেছেন। এখানে প্রমাণ হলো যে বিবাদী সারেন্ডারের ১৫/২০ দিন আগে তার ফ্যামিলি এখান থেকে শিফট করেছেন। এ অবস্থার কারণে বিবাদীকে বাসায় না পাওয়ার কারণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর পর সাক্ষীগণ তাকে বাসায় পাননি। পেয়েছেন কিছু কাগজ পত্র। এ কাগজ পত্র গুলো হতে প্রতীয়মান হয়েছে যে বিবাদী জামায়াতে ইসলামীর মেম্বার এবং পার্ক আর্মির সাথে যোগসাজজকারী। এ কাগজপত্র গুলো কি তা বুঝা যায়নি, প্রমাণ হিসাবে তার কিছুই পেশ করা হয়নি। ইনভেস্টিগেশন অফিসার বলেছেন তিনি এগুলো উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করেছেন। তাকে বলা হয়েছে, ও সব দলীলপত্র জহির রায়হানের নিকট আছে। পরে তিনিও নিখোঁজ হন। অতএব পাক আর্মির সাথে যোগাযোগের অভিযোগ কোন ভাবেই প্রামাণিত হতে পারেনি।

বিবাদী জামায়াতে ইসলামীর অফিসসেক্রেটারী এ কথা অস্বীকার করা হয়নি। মিষ্টার মুজিবুর রহমান যুক্তি দেখান যে এর দ্বারা বিবাদীকে দায়ী বলে সাব্যস্ত করতে পারা যায় না। বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ যখন বন্দীকে বাসায় খুজে পেলেন না, তারা তার আত্মীয়ের থেকে ঠিকানা নিয়ে মুক্তি বাহিনীর সহযোগিতায় তার সন্ধান পেলেন। ১নং সাক্ষী বলেন তাকে তার ভায়রা ভাই এর বাসায় মালিবাগে পাওয়া যায়। এবং দেখার সাথে সাথেই তাকে সনাক্ত করা হয় যে তিনি শহীদুল্লাহ্ কায়সারকে তার বাড়ী হতে অপহরণ কারীদের একজন। সাক্ষী বলেন যে তিনি তাকে সনাক্ত করেছেন এবং তাকে গ্রেফতার করে একটি গাড়ীতে করে নিয়ে আসা হয়। এটা দুর্ভাগ্য জনক যে সাক্ষী কার সামনে বিবাদী আবদুস খালেককে সনাক্ত করেছেন তার কোন প্রমাণ পেশ করেননি। মুক্তি বাহিনীর যারা তাদের সাথে ছিলেন তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। অতএব তাকে দেখা মাত্র চিনে ফেলেছেন প্রমাণ যে কোন নিরপেক্ষ বিবেকের নিকট অগ্রাহ্য হবে। একথা সত্য যে ২নং সাক্ষী জাকারিয়া হাবিব বলেছেন যে তিনি প্রথম দেখা মাত্রই আসামীকে চিনে ফেলেছেন যে, যারা তাকে ও তার ভাইকে ধরে নিয়েছিলেন এ তাদের একজন। এখন প্রশ্ন হলো ১নং সাক্ষী ২নং সাক্ষীকে সমর্থন করেছেন। একটি প্রমাণ হিসাবে উভয় সাক্ষীই বর্ণনা করছেন যে তারা বলেছেন ১৪ তারিখে চেহারায় একজনকে চিনতে পেরেছেন বলে বলেছেন। কিন্তু সাক্ষীর জেরায় ১নং সাক্ষী বলেছেন যে তিনি কোন একজনকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন

www.pathagar.com

বলে পুলিশের কাছে বলেননি। ২নং সাক্ষী জাকারিয়াও বলেছেন যে তিনি একজনকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন কিন্তু এ ঘটনা আর অন্য কোন সাক্ষীই বলেন নি যে, ১নং ও ২নং সাক্ষী অন্যান্য সাক্ষীদেরকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। যা সব চেয়ে আশ্চার্য্যজনক তা এ যে ২০/১২/৭১ যখন এজাহার করা হয় এপ্যালেন্টের নাম নিদিষ্ট ভাবে অপহরনকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তাদের কেউ বিবাদীর চেহারা দেখেনি। যদি চেহারায় তারা বিবাদীকে চিনতো তাহলে তারা এজহারে কেন তা মোটেই উল্লেখ করলেন না। এ কথা বাদ পড়ায় সরকারের বিপক্ষে বলার অনেক কিছু আছে। ৭নং সাক্ষী বর্ণনা দিয়েছেন যে, সে রাতেই নাসির আহমদ ও জাকারিয়া একজনকে চেহাররায় চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। অবিকল বর্ণনা ৮নং সাক্ষী নীলা জাকারিয়াও দিয়েছেন। এবং ৯নং সাক্ষী শাহানা বেগমও জেরার জবাবে বলেছেন যে, সে রাতেই নাসির ও জাকারিয়া আবদুল খালেক নামে এক ব্যক্তিকে চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। কম করে হলেও একথা বলতে হবে যে এ সাক্ষী আরো এক ধাপ সামনে অগ্রসর হয়ে এ্যাপেলেন্টের নাম পর্যন্ত বলতে উৎসাহিত হয়েছেন। অথচ ১নং ও ২নং সাক্ষী প্রমাণ দিয়েছেন যে তারা চেহারায় একজনকে চিনতে পেরেছেন। নাম বলেননি। ১নং সাক্ষী বর্ণনা দিয়েছেন যে ১৬/১২/৭১ এ তাদের পাড়া প্রতিবেশীগণ যখন তাদের বাড়ীতে আসেন ও তারা তাদের কাছে ঘটনা বলেছেন তখনও তাদের কাউকে কাউকে বলেছেন যে চেহারায় তিনি একজনকে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু কার কার কাছে বলেছেন–এ কথা তার খেয়াল নেই। যদি ১৬ তরিখ বিকালে ১নং সাক্ষী কোন কোন প্রতিবেশীর নিকট একজন দুস্কৃতিকারীকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়ে থাকেন তাহলে আবার প্রশ্ন উঠে যে এ ব্যাপারটি এজহারে উল্লেখ হলোনা।

দ্বিতীয়তঃ এলাকার একজন সাক্ষীও কেন এ কথা বললেন না যে, ১নং সাক্ষী একজন লোককে চেহারায় চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। ৩নং সাক্ষী হলেন বাড়ীর মালিক যে বাড়ীতে আবদুল খা ক বাস করতেন। ৪নং সাক্ষী হলেন মসজিদের ইমাম। তিনি বলেছেন যে তিনি প্রায়ই শহিদুল্লাহ কায়সাদের বাসায় অবাধে যাতায়াত করতেন। ৫নং সাক্ষী গিয়াসুদ্দীন ঘনিষ্ট প্রতিবেশী ৫৮/১নং আগামসিতে থাকেন। এসব সাক্ষীদের কেউ এ কথা বলেননি যে ১নং ও ২নং সাক্ষী চেহারায় কোন দুস্কৃতিকারীকে চিনতে পেরেছেন বলে তাদের কাছে বলেছেন। আর অন্যান্য সাক্ষীরও কোন জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়নি যা ১নং ও ২নং সাক্ষীর সাথে সামঞ্জস্যশীল। ৭,৮,ও৯ নং সাক্ষীর সাক্ষ্যে সমর্থন করছে বলে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা বিভিন্ন কারণে গ্রহনযোগ্য নয়। সংযুক্ত কাগজ 'এ' হলো খবরের কাগজ। ১৯৭১ সনের ২৩ ই ডিসেম্বরের দৈনিক পূর্বদেশ। যদিও তা সুক্ষ দৃষ্টিতে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবু একটু আলোচনা করলে দেখা যাবে যে ট্রায়াল রেপোর্ট এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়েছে–যে ––"জামায়াতের খালেক ধরা পড়েছে।" একই পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় অন্যান্য রিপোর্ট বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে আবদুল খালেকের বাড়ীর মালিক তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করলে খালেক রিভলভার উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যান। এরপর রির্পোটে বলা হয় যে গ্রেফতারের পর খালেককে

www.pathagar.com

মসজিদের ইমাম সনাক্ত করেছেন। এবং এ ইমামই জানান যে খালেক শহিদুল্লাহ কায়সার সম্পর্কে তার কাছে জিজ্ঞেস করেছেন। তার পর রিপোর্টার মন্তব্য করেন যে যেসব কাগজপত্র আবদুল খালেকের বাসায় পাওয়া যায় তাতে প্রতিয়মাণ হয় যে, পাকিস্তান আর্মির সাথে তার বেশ যোগাযোগ ছিলো। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, শহিদুল্লাহ কায়সারের আত্মীয়রা আবদুল খালেককে সনাক্ত করেছেন এবং শহিদুল্লাহকে নিয়ে যাবার সময় খালেক তাদের সাথে ছিলো ও তার মুখে সাদা কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিলো বলে জানান। এর পর রিপোর্টার আরো বলেন যে, আবদুল খালেক জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলেছেন যে তিনি শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ী বদর বাহিনীর সদস্যদেরে দেখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তিনি তাদের সাথে ছিলেন না। অতঃপর রিপোর্টার খালেকের পেশা, মাসিক আয়, এবং তার স্বীকৃতি এভাবে বিধৃত করেন যে "তার লিখিত জবানবন্দীতে ৮জন লোকের নাম প্রকাশ করেছেন। এই ৮ ব্যক্তিকে আটক করতে পারলে হত্যাকান্ডের সব ঘটনা জানা যাবে।" এর পর রির্পোটার বলছেন এদের একজন ওপারেশন ইনসার্জ ছিলেন। সে জামায়াতে ইসলামীর লিডারের সাথে জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এসে ১৪/১২/৭১ তারিখে টাকা পয়সা নিয়ে যান। সে দিনও কারফিউ ছিলো। নিউজ পেপারের এই কপি ১নং সাক্ষী শাহানা বেগমকে দেখালে তিনি বলেন, তিনি নিউজ পেপার পড়েন কিন্তু এ সংখ্যা পড়েননি। তারপর তিনি বলেন যে আসামীর গালে একটি তিলক ছিলো। এটা সত্য যে, ফটোগ্রাফে আবদুল খালেকের দাঁড়ি ছিলো। আর এ দাড়ি একদিনে গজায় নাই এটাও স্পষ্ট। আবদুল খালেক অনেক আগ থেকেই দাঁড়ি রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন বলে অনুমিত। দাঁড়িওয়ালা আবদুল খালেক যদি শহিদুল্লাহ কায়সারকে কিডনেপ করতেন তার বাড়ীতে আসতেন তাহলে এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে ১,২,৩,৭,৮,৯, নং সাক্ষী কারো কাছে বলতো না যে অপরাধী দাঁড়িওয়ালা ছিলো। একই তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায়ও আবদুল খালেকের আর একটি ফটো ছাপা হয়েছিলো। আমরা এ পত্রিকাটি ও পড়েছি। এসব কারণে আমাদের বদ্ধ ধারণা যে এসব বিরাজিত পারিপার্শিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা কঠিন নয় যে একটা বিশেষ আবেগ অনুভূতি দ্বারা বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ তাড়িত হয়েছেন। আর বুদ্ধিজীবি হত্যার পরিকল্পনাটি জামায়াতে ইসলামীর পরিকল্পিত ছিলো বলে যে গুজব ছড়ায়ে-ছিল ২০/১২/৭১ সে মনস্তত্বই থানায় এজহার করতে অনুপ্রানিত করেছিলো যে আবদুল খালেক হলো অপরাধী আর এই মনস্তাত্বিক পরিস্থিতি বাদী পক্ষের সাক্ষীদের মনকে পরিচালিত করেছে যে আব্দুল খালেক হলেন শহিদুল্লাহ কায়সারের অপহরনের জন্য দায়ী। এ জাতীয় ব্যাপার কোন পিগাল এভিডেন্স হতে পারেনা। এই ট্রায়াল রিউমার্স গসপিংস এবং সেন্টিমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ২টি পত্রিকায় এ্যাপেলেন্টের ফটো ছাপা সংক্রান্ত ব্যাপার বক্তব্য হলো এ কাজ ১৯২০ সনের প্রিজনার্স ত্র্যাক্টের পরিপন্থী। আইন অনুযায়ী এ ধরনের ছবি পাবলিশ করা যায় না। আইডিন্টিফিকেশন অব প্রিজনার্স এ্যাক্টস কোন নিদিষ্ট উদ্দেশ্যে কোন ক্রিমিনাল বা কনভিকটের ছবি ছাপানোর অনুমতি দেয়। কিন্তু কোন অপরাধের নিউজ আইটেম প্রচার করার উদ্দেশ্যে ছবি চাপানোর বিধান নেই। ১৯২০ সনের এ্যাক্টের ২৩ নং ধারায় ৫ নং উপধারা বলে যে শুধু প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটের হুকুমেই কোন ব্যক্তির ছবি ছাপানো যেতে পারে। এ উপধারাটি আরো বলে যে এ ধরনের ছবি বিবাদীর মুক্তি বা

www.pathagar.com

ডিসচার্জের বা খালাস হবার পর অবশ্যই নষ্ট করে ফেলতে হবে। যদি কোর্ট তা রেখে দেবার হুকুম না দেয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৪৩ সনে পুলিশ রেগুলেশন বেঙ্গল এ্যাক্টের ৬৩৫ নং রেগুলেমন অনুযায়ী কোন অবস্থায় কোন ক্রিমিনালের ছবি উঠানো যায় এবং তাও আবার পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্টের অথবা কোন উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারের সুনির্দিষ্ট আদেশক্রমে তা নির্দ্ধারিত রয়েছে। ৬৩৯ রেগুলেশন অনুযায়ী সনাক্ত করনের উদ্দেশ্যে ছবি উঠানো যাবে কিন্তু তা অত্যান্ত গোপনে রাখতে হবে। এবং কোন অবস্থাতেই তা সনাক্ত করণের জন্য সাধারন্যে প্রকাশ করা যাবে না। আবার সেই সেনাখতকরণও হতে হবে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে অথবা দু'জন বা দুয়ের অধিক সম্মানিত লোকের সামনে। 'ক' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ ছবি উঠানো যাবে তবে তাও তুলতে হবে রায় ঘোষণার পর যেমন টাকা ফর্জারী সিদেল চুরি, ইত্যাদি। অথবা আসামী যদি দাগি ক্রিমিনাল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তার ফটো তোলা যাবে। এ রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী।আমাদের মতামত এই যে এ্যাপেলেন্টের ছবি একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে দৈনিক খবরে কাগজে প্রকাশিত হওয়াটা ছিল বে আইনী।

আইনের শাসনকে যদি নিশ্চিত করতে হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগ কারী কর্তৃপক্ষকে কোন টি, আই, প্যারোঃ অনুষ্ঠানের আগে অভিযুক্ত ব ক্তির ছবি প্রকাশের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এখন আমরা ১,৭,৮,ও৯ নং সাক্ষীর প্রমানের প্রমাণপত মূল্যায়ন করবো। ৭নং সাক্ষী সাইফুন্নাহার হলেন শহিদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী। ৯নং সাক্ষী নাসির হলেন শহিদুল্লাহ কায়সারের ছোট বোনের স্বামী। ৮নং সাক্ষী হলেন শহিদুল্লাহ কায়সারের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। ৯নং সাক্ষী শাহানা বেগম হলেন শহিদুল্লাহ কায়সারের সহোদরা ছোট বোন। তাদের আবেগ অনুভূতি সহজেই অনুমেয় এবং প্রকাশযোগ্য। শহদিুল্লাহ কায়সার ছিলেন একজন সুপরিচিত বুদ্ধিজীবি। তার আত্মীয় স্বজনরা তাই স্বভাততঃই দুঃখে ক্ষোভে ছিলেন মুহ্যমান। গোটা জাতিই সে সময় দুঃখে শোকাভিভূত ছিলো। এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়। যে সময় এ সব সাক্ষীগণ সাক্ষী প্রদান করছিলেন সে সময় শুধু শহিদুল্লাহ কায়সার নয় দেশের অনেক বরন্য সন্তান, এমন কি তার ছোট ভাই জহির রায়হান ও নিখোঁজ ছিলেন। এ ক্ষতি জাতি ও তাদের পরিবার পরিজনের জন্য ছিলো অপরীসীম বেদনাদায়ক কিন্তু এখানে রাষ্ট্র ও আবদুল খালেকের মধ্যে যে বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে বিচার্য তা হলো এ্যাপেলেন্ট আবদুল খালেক শহিদুল্লাঃ কায়সারের অপহরণের জন্য দায়ী কিনা? এ বিষয়টির ফয়সালা হতে হবে আইন এবং একমাত্র আইনের মাধ্যমেই। অতএব এসক সাক্ষী-প্রমাণ গুলোকে যাচাই বাচাই করে দেখতে হবে। এ যাচাই বাচাইয়ের পর আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত যে বাদী পক্ষ এ্যাপেলেন্টের বিপক্ষে এ মামলা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন অনেক কারনেঃ (ক) ২০/১২/৭১ তারিখে এজহারে আবদুল খালেকের নাম উল্লেখ করা ছিলো উদ্দেশ্য প্রনোদিত। কারণ তখন পর্যন্ত কেউই আবদুল খালেককে দেখেননি এবং তার নাম উল্লেখ 'করেননি। ৪ নং সাক্ষী বলেছেন যে খালেক জিজ্ঞেস করেছেন।

(খ) ১নং সাক্ষী ও ২নং সাক্ষী যাদের কাছে বলেছেন যে তারা একজন দুষ্কৃতিকারীকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন তাদের একজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। (গ) ৪,৫, ও ৬নং

www.pathagar.com

সাক্ষীদের মত নিরপেক্ষ (আত্মীয় নয়) সাক্ষীগণ একথা বলেন যে ১নং ২নং অথবা ৭নং, ৮নং সাক্ষী তাদের নিকট একজনকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন।

(ঘ) ১৯৭১ সনের ২৩ ডিসেম্বর আবদুল খালেকের যে ছবি প্রকাশিত হয়েছে তা সাক্ষীদের বিচার বিবেচনাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই এর অনেকদিন পর ৭২ সনের জুলাই মাসে যখন তারা কোর্টে সাক্ষী দিচ্ছিল তখন তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে এ ব্যক্তিই হত্যা করেছে। (ঙ) আবদুল খালেকের দাঁড়ি ছিলো। অথবা তার গালে তিলক ছিলো কেউ তা উল্লেখ করেন নি। শুধু ৯নং সাক্ষী শাহানা বলেছেন তার গালে তিলক ছিলো। আমরা কোন মতামতকে দৈব বলে মেনে নিতে পারি না। বাহ্যতঃ ছবি থেকে মনে হয় আবদুল খালেকের গালে একটি তিলক ছিলো। আবার দাঁড়িও ছিলো তার বেশ ঘন। যদি আবদুল খালেকই শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করার জন্য এসে থাকতেন তাহলে এটা বিশ্বাস যোগ্য নয় যে বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ তা এজহারে উল্লেখ করতেন না যে একজন দাঁড়িওয়ালা ছিলো অপহরণকারী। (চ) আবদুল খালেক জামায়াতে ইসলামীর মেম্বর ছিলেন একথা স্বীকৃত। এ ধারণাই বাদীপক্ষের সাক্ষীগণের বিচার বিবেচনাকে প্রভাবিত করেছে। কারণ জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে–এমন একটা ধারনা ইতিপূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিলো। এ ধারনাই সাক্ষীগণের, আরোহ পদ্ধতি জনিত অনুমানকে, প্রভাবিত করছে। (ছ) নিউজ পেপারে খবর ছাপানো সে কিভাবে গ্রেফতার হয়েছে, কোথায় গ্রেফতার হয়েছে, কি ষ্টেটম্যন দিয়েছে, কি দেয় নাই এ সবের একটি বেশ প্রতিক্রিয়া পড়েছে। আর এ প্রতিক্রিয়া বাদী পক্ষের সাক্ষী প্রমাণের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে। (জ) আবদুল খালেকের রিভলবার লাইসেন্স থাকা এবং হাবিবুর রহমানের বুকে পিস্তল ধরা এসব তো তার বেপারোওয়া স্বাভাবের প্রমাণ। আল বদর নয় যদি ধরেও নেয়া হয় যে আবদুল খালেক এ প্রকৃতির লোক ছিলো তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায় অপহরণের সময় কি এমন চরিত্র প্রদর্শন করেছিলেন। একটি সাক্ষীও এ কথা বলেন নাই যে একজন দাঁড়িওয়ালা মানুষ রিভলবারে সজ্জিত ছিল। ট্রায়াল কোর্ট নিজেই দেখেছেন যে এখানে আবদুল খালেক কর্তৃক এমন কোন কাজ সাধিত হয়নি যা রাষ্ট্রপতি আদেশের আওতায় আসতে পারে। (ঝ) একজন সাক্ষীও তিনি আলবদর বলে প্রমান করতে পারেনি। (ঞ) মুক্তি বাহিনীর যে সব সদস্য অভিযুক্তকে মালিবাগে গ্রেফতার করেছে তাদের একজনকেও সাক্ষী হিসাবে পেশ করা হয়নি। এতএব ১নং ও ২নং সাক্ষীর মালিবাগে সনাক্ত করার সমর্থন সূচক প্রমাণের অভাব থেকে যায়।

রায়

এ অবস্থায় আমার সিদ্ধান্ত হলো বাদীপক্ষের মামলা যুক্তি সঙ্গত সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। আইন মোতাবেক এ সন্দেহের ফল আসামীর পক্ষেই যায়। সুতারাং আমরা আসামীকে নির্দোষ সাব্যস্তে খালাস দিলাম। অন্য কোন মামলায় জড়িত না থাকলে তাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া গেলো। আপীল মঞ্জুর করা হলো এবং এর সাথে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত ১৯৭২সনের সাজা বাড়াবার ক্রিমিনাল রিভিশন নং২২০ সঙ্গত করনেই খারিজ হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

-আক্কর বদরুল হায়দার চৌধুরী

আমি একমত

সিদ্দিক আহম্মদ চৌধুরী

১৯৭১ ইংরেজীতে শহিদুল্লাহ্ কায়সারকে অপহরণ ও হত্যার ব্যাপারে এক মিথ্যা অভিযোগ এনে প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৮ বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৬৪ ধারার অভিযোগে ঢাকার স্পেশাল ট্রাইবুনাল জাজ ৩৬৪ ধারার অভিযোগে ঢাকার স্পেশাল ট্রাইবুনাল কোর্ট ৫ এর জনাব ফয়জুর রহমানের কোর্টে বিচারের জন্য সপর্দ করা হয়। উক্ত মকদ্দমায় আমাকে ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড সহ দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। ২৯/৪/৭৬ তরিখের হাইকোর্টের এ রায়ের দ্বারা আল্লাহ্ সত্য প্রকাশের মাধ্যমে আমাকে এ মিথ্যা ও ষড়যন্ত মামলা হতে বেকসুর খালাস দেন। ৩/৫/৭৬ তারিখে আল্লাহর মেহেরবাণীতে জেল হতে বেরিয়ে আসি। তৎকালীন ঢাকা মহানগরীর আমীর জনাব মাওলানা নূরুল ইসলাম ঢাকা কারাগারের গেট থেকে আরো কিছু সঙ্গী সাথীসহ আমাকে রিসিভ করেন। সে সময় সকলকে দেখে খুশীতে আমার চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠে আমার ছোট শালা ১০ ম শ্রেণীর ছাত্র বর্তমানে ম্যাজিষ্ট্রেট সেও জেল গেটে ছিলো। কচি মুখটি দেখে খুব খুশী লাগলো আমার। আমার ছোট ভাই আবদুস সালাম জেল গেটে উপস্থিত হলো

আগের নিয়ত আনুয়ায়ী চক বাজার শাহী মসজীদে শুকরনা নামাজ আদায় করলাম। আন্দোলনের কিছু সৈনিকও আমার নিজ গ্রামের কিছু লোকজন সহ বেগম বাজার মসজিদে গিয়ে কিছু আলাপ আলোচনার পর সিটি জামায়াত অফিস বাংলার দুয়ারে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মুক্ত রজনী কাটাই।

www.pathagar.com

www.pathagar.com